মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত

যোগদর্শন

প্রত্যক্ষানুভূত ব্যাখ্যা

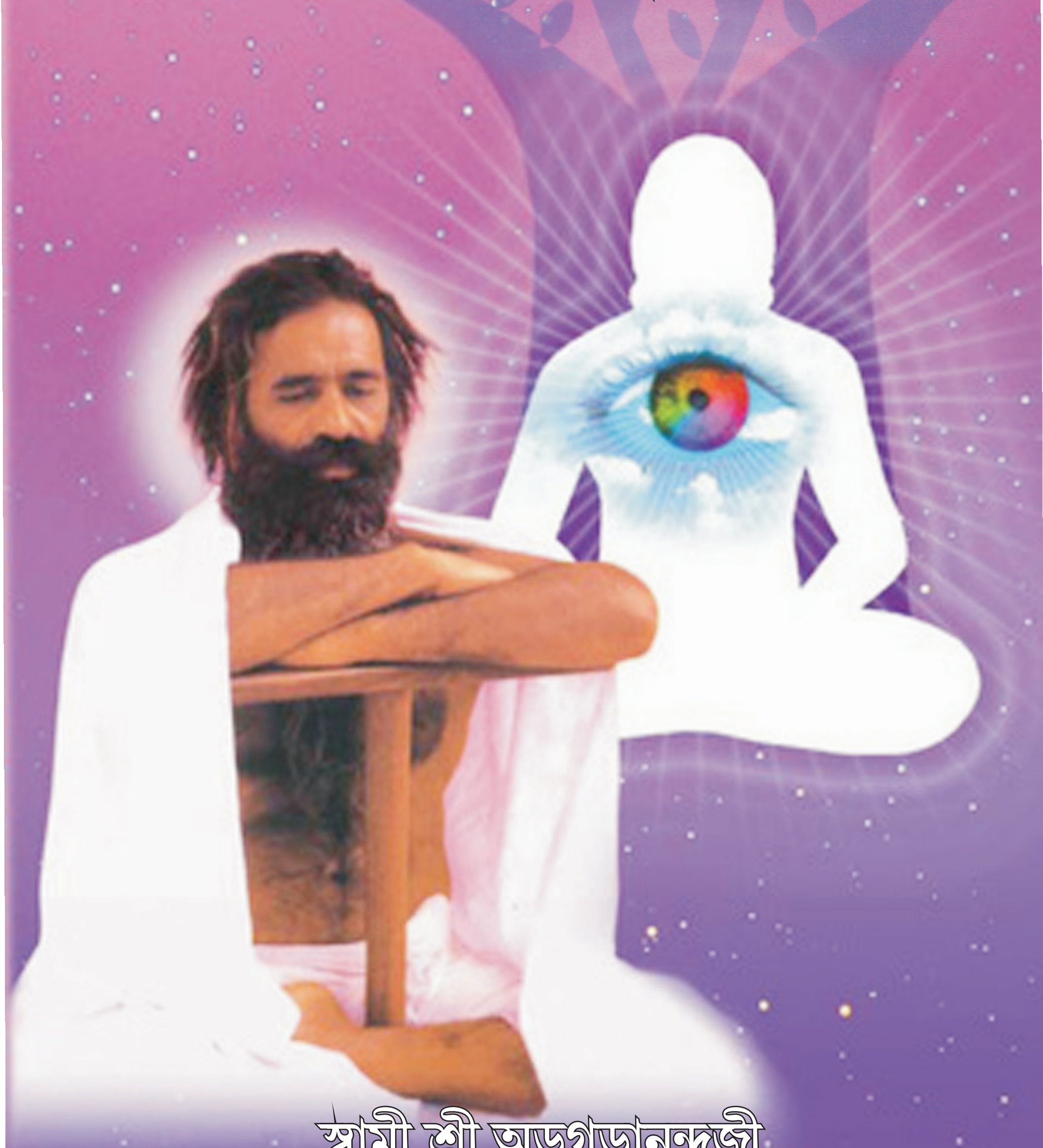

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী

.....লেখকের প্রতি

পূজ্য স্বামীজী দ্বারা শ্রীমদ্ ভগবদগীতা-এর ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'-এর বিশ্ব জনমানসে সমাদরের ভাব প্রত্যক্ষ করে ভক্ত এবং সাধকগণ নিবেদন করেছিলেন পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধেও পূজ্যশ্রী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন কারণ যোগ অনুভূতির বিষয়, যা লৌকিক স্তরে বোধগম্য হবে না। পূজ্য-চরণ এক মহাপুরুষ, যোগের স্তরগুলি ক্রমশঃ অতিক্রম করেছেন। ভক্তদের আগ্রহে মহারাজজী কৃপা করে যা কিছু প্রবচন দিয়েছেন, প্রস্তুত কৃতি তারই সঙ্কলন।

- প্রকাশক

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত

যোগদর্শন

(প্রত্যক্ষানুভূত ব্যাখ্যা)

ব্যাখ্যাকার ঃ

পরমহংস স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজ

শ্রী পরমহংস আশ্রম শক্তেষগড়

গ্রাম. পোঃ- শক্তেষগড়, চুনার, মির্জাপুর, উ.প্র.

ফোন ঃ (০৫৪৪৩) ২৩৮০৪০

প্রকাশক ঃ

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

ন্যু অপোলো ইস্টেট, গালা নং - ৫, মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)

অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৬৯, ভারত

প্রকাশক ঃ
শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট
ন্যু অপোলো স্টেট, গালা নং-৫,
মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)
অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৯, ভারত
দূরভাষ ঃ ০২২-২৮২৫ ৫৩০০
ই-মেল ঃ contact@yatharthgeeta.com
ওয়েবসাইট ঃ www.yatharthgeeta.com

© লেখক

সংস্করণ - নভেম্বর ২০০৪ থেকে জানুয়ারী ২০১৩-৩৬,০০০ সংখ্যা
পুনঃপ্রকাশিত - জানুয়ারী ২০১৪ - ৩,০০০ সংখ্যক
পুনঃপ্রকাশিত - ফেব্রুয়ারী ২০১৫ - ২,০০০ সংখ্যক
পুনঃপ্রকাশিত - ফেব্রুয়ারী ২০১৬ - ৩,০০০ সংখ্যক
পুনঃপ্রকাশিত - ফেব্রুয়ারী ২০১৭ - ৩,০০০ সংখ্যক

মুদ্রক ঃ
প্রিয়া গ্রাফিক্স
জে-১২০, অন্সা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইস্টেট
সাকী বিহার রোড, সাকী নাকা, মুম্বাই - ৪০০ ০৭২
ফোন নং ঃ ৬৬৯৫ ৯৯৩৫, ৪০০৫ ৯৯৩৬

মূল্য ঃ ৭০ টাকা মাত্র

ISBN : 81-89308-16-5

অনন্তশ্রী বিভূষিত
যোগিরাজ, যুগ পিতামহ

পরমপূজ্য শ্রী স্বামী পরমানন্দজী
শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়া-চিত্রকূট
এঁর পরম পবিত্র চরণ যুগলে
সাদরে সমর্পিত
অন্তঃ প্রেরণা

গুরু বন্দনা

।। ওঁ শ্রী সদ্‌গুরুদেব ভগবানের জয় ।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

সূরত নিজ সোহং, কলিমল খোহং, জনমন মোহন ছবিভারী।।
অমরাপুর বাসী, সব সুখ রাশী, সদা একরস নির্বিকারী।।

অনুভব গম্ভীরা, মতি কে ধীরা, অলখ ফকীরা অবতারী।।
যোগী অদ্বৈষ্টা, ত্রিকাল দ্রষ্টা, কেবল পদ আনন্দকারী।।

চিত্রকূটহিঁ আয়ো, অদ্বৈত লখায়ো, অনুসুইয়া আসনমারী।।
শ্রীপরমহংস স্বামী, অন্তর্যামী, হ্যাঁয় বড়নামী সংসারী।।

হংসন হিতকারী, জগ পগুধারী গর্ব প্রহারী উপকারী।।
সৎ-পন্থ চলায়ো, ভরম মিটায়ো, রূপ লখায়ো করতারী।।

ইয়হ্ শিষ্য হে তেরো, করত নিহোরো, মোপর হেরো প্রণধারী।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

“আত্মনে মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ”

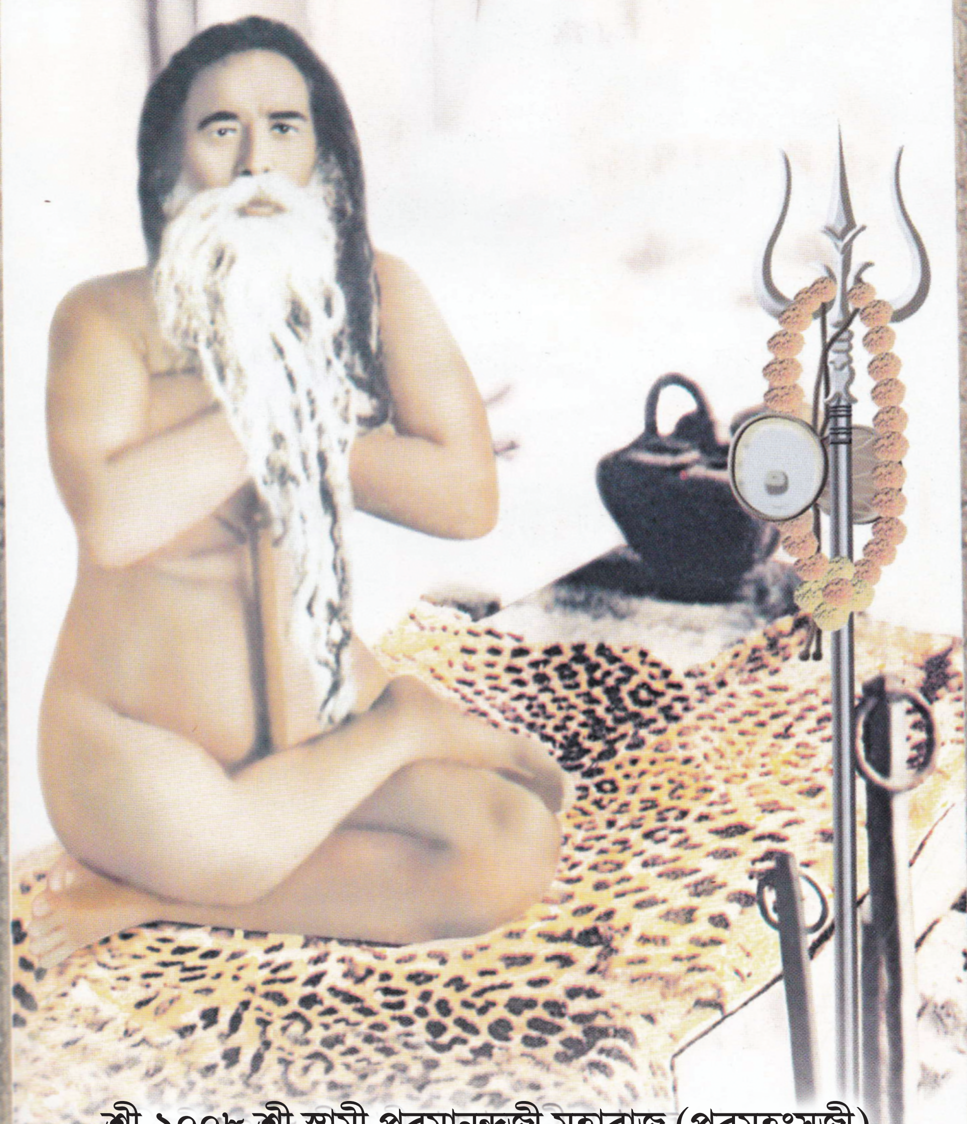

শ্রী ১০০৮ শ্রী স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ (পরমহংসজী)

জন্ম ঃ শুভ সংবৎ বিক্রম ১৯৬৮ (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ)

মহাপ্রয়াণ ঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা সপ্তমী, সংবৎ বিক্রম ২০২৬, তারিখ ২৩/০৫/১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ

পরমহংস আশ্রম, অনুসুইয়া (চিত্রকূট)

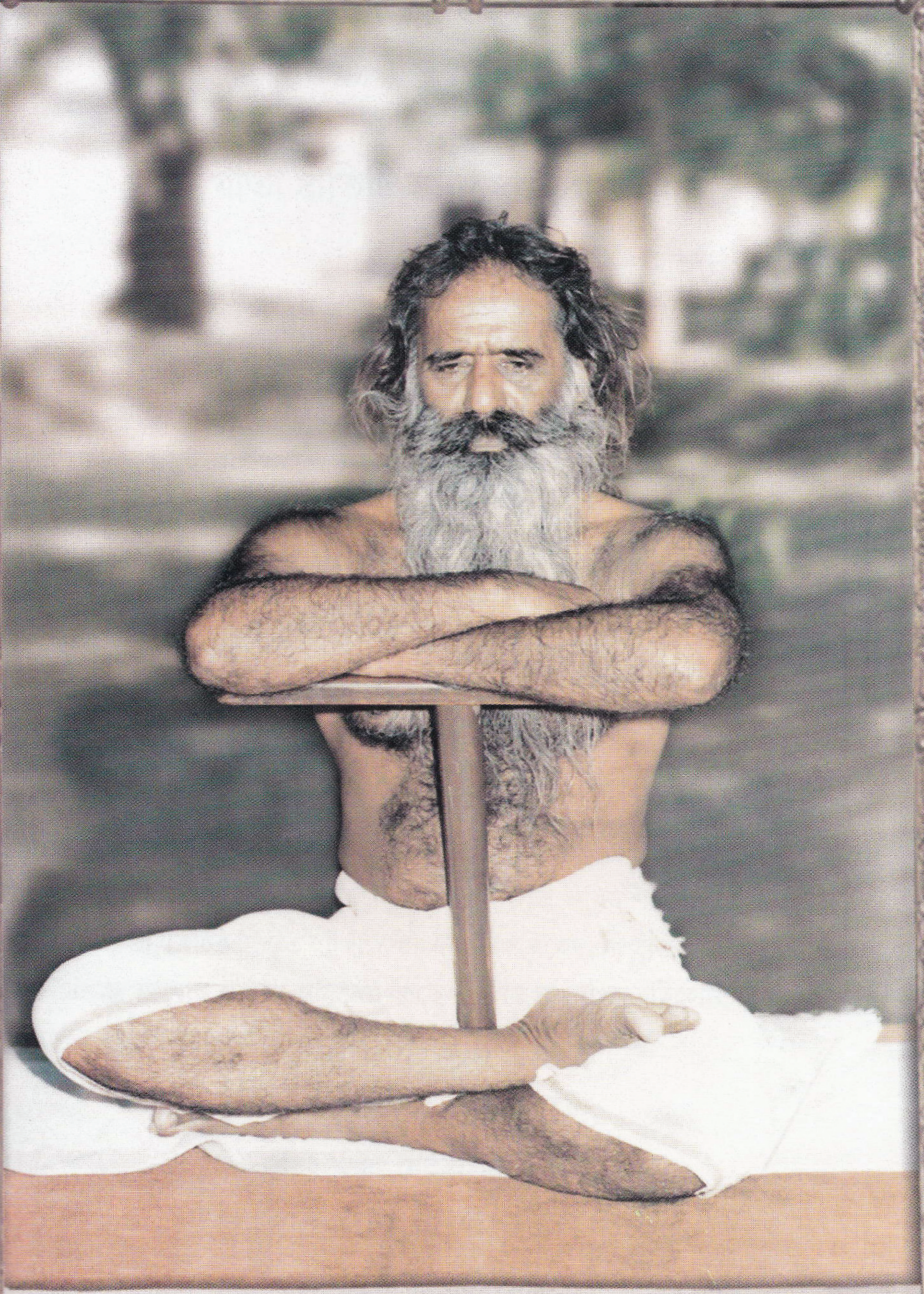

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজ

(পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের কৃপা প্রসাদ)

আমাদের প্রকাশনা

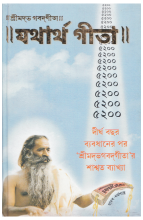

যথার্থ গীতা -
'যথার্থ গীতা'তে
শ্রীকৃষ্ণের বাণীর আশয়
উত্তমরূপে যথাবৎ বুঝিয়েছেন
এই কৃতি কালজয়ী।

২৮টি ভাষাতে

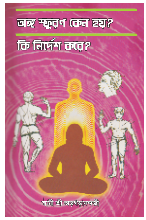

অঙ্গ স্ফুরণ কেন হয় এবং কি নির্দেশ করে? -
মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যে স্ফুরণ হয় এর কারণ
এবং এর সঙ্কেতগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
যা সাধনাতে সহায়কের কাজ করে।

৪টি ভাষাতে

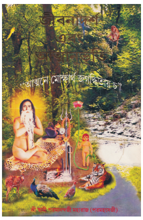

জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি -
পূজ্য গুরু পরমহংস
স্বামী শ্রী পরমানন্দজী মহারাজ-এঁর
জীবনের বৃত্তান্ত, তাঁর অনুভূতি
এবং উপদেশ সঙ্কলিত করা হয়েছে।
সাধকদের জন্য এই গ্রন্থ খুবই প্রয়োজনীয়।

৪টি ভাষাতে

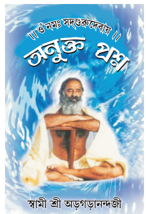

অনুক্ত প্রশ্ন -
বর্ণ, মূর্তিপূজা, ধ্যান, হঠ, চক্র-ভেদন এবং
যোগ-এর মত বিষয়গুলি স্পষ্ট করে ভ্রমিত
সমাজের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

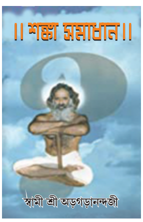

শঙ্কা সমাধান -
সমাজে প্রচলিত কুরীতি,
আড়ম্বর এবং অন্ধবিশ্বাসের
নিবারণ এবং সমাধান
করা হয়েছে।

৫টি ভাষাতে

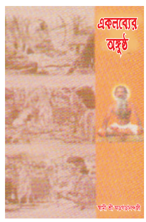

একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ -
শিক্ষা-গুরু এবং সদ্গুরুর মধ্যে পার্থক্য বলা হয়েছে।
শিক্ষকেরা জীবন নির্বাহ করার কৌশল-এর শিক্ষা দেন।
পরন্তু সদ্গুরু জীবনে পরমশ্বের-এর জাগৃতি এবং
পরমপদ লাভ করতে সাহায্য করেন যার ফলে পুরুষ
গমনাগমন থেকে মুক্ত হন।

৩টি ভাষাতে

কার ভজনা করব? -
জনসাধারণ ধর্মের নামে গরু,
অশ্বত্থ, দেব-দেবী, ভূত-
ভবানীর পূজা করে। প্রস্তুত পুস্তিকাতে
এই সকল ভ্রান্তির নিবারণ করে
স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সনাতন
ধর্ম কাকে বলে? ইষ্ট কে?

৬টি ভাষাতে

ষোড়শোপচার পূজন পদ্ধতি -
একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির করা এবং
একমাত্র পরমাত্মাকে চিন্তন করার
পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্মকাণ্ড অবগত করায়,
এই পুস্তিকাতে এই সম্বন্ধেই বলা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

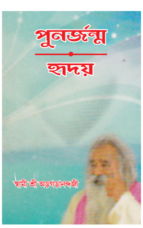

হিন্দী ভাষাতে

পুনর্জন্ম -
বৌদ্ধিক স্তরে এই বিষয়টি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়।
মানুষ জন্মগ্রহণ করে, জীবনযাপন করে; দেহত্যাগ করে,
চলেও যায়; কিছু বুঝতেই পারে না যে, পুনরায় জন্ম হয় অথবা
হয় না। কিন্তু যোগাভ্যাসের এক নির্দিষ্ট স্তর যখন মানুষ অতিক্রম
করে তখন সে স্পষ্ট দেখে যে পুনর্জন্ম হয়? আমি পূর্বজন্মে
কি ছিলাম? এরপর কোন দেহ, কোথায় জন্মগ্রহণ করব?
হৃদয়
হৃদয় দেহের কোন অংশে স্থিত যেখানে পরমাত্মার নিবাস?
হৃদয়ের পরিচয় এবং পরমাত্মাকে জানার সম্পূর্ণ বিধির উপর
আলোকপাত করা হয়েছে। ক্রমোন্নত দেহ তিনটি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং
কারণ। ক্রমশঃ কারণ শরীরের অন্তিম স্তরে যখন সাধনা পৌঁছায়,
তখন ঈশ্বরের নিবাসস্থান সম্বন্ধে জানা যায়। এই পুস্তিকা এইসমস্ত
প্রশ্নেরই পূর্ণ পরিচয় দেয়।

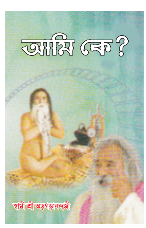

হিন্দী ভাষাতে

আমি কে? -
জন্ম থেকেই নানা প্রকারের সম্বন্ধের মাঝে থেকে এই
ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, আমি কে? এই জিজ্ঞাসা যৌগিক।
'বাসাংসি জীর্ণানি...' দেহ বস্ত্র মাত্র। দেহ ত্যাগ হলে সেই
ব্যক্তি পশু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ
করে। মৃত্যুকালে রাজসিকগুণ কার্যরত থাকলে সেই ব্যক্তি
মনুষ্যদেহ লাভ করে। সাত্ত্বিক গুণের কার্যকালে দেহত্যাগ
করলে দেব দেহ ইত্যাদি উন্নত যোনিতে জন্ম হয়। প্রত্যেক
অবস্থাতে স্থিত ব্যক্তিকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অতএব
এই প্রশ্ন যেমনের তেমনি রইল যে, আমি কে? বাস্তবে
যখন দ্রষ্টা এই আত্মা স্বীয় স্বরূপে স্থির হয়, যা আপনার
বাস্তবিক স্বরূপ।

আমাদের প্রকাশনা

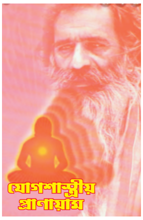

যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়াম -

যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়ামে মহারাজ বলেছেন যে, যম, নিয়ম এবং আসন দৃঢ় হলেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত প্রবাহিত হয়। একেই প্রাণায়াম বলে। পৃথক করে প্রাণায়াম নামের কোন ক্রিয়া নেই। এই যোগ চিন্তনের অবস্থা বিশেষ। এরই সমাধান এই পুস্তিকাতে করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

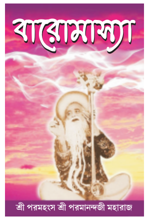

বারোমাস্যা -

মহারাজ নিজের পূজ্য গুরু শ্রীপরমানন্দজী মহারাজজীর আকাশবাণী দ্বারা প্রাপ্ত ভজন (ঈশ্বরীয় গায়ন) বারো মাস্যার সঙ্কলন এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন। এতে প্রবেশিকা থেকে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথপ্রদর্শন করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

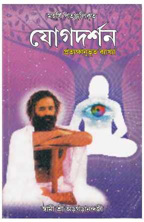

যোগদর্শন -

প্রত্যক্ষানুভূত ব্যাখ্যা -

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত এই পুস্তককে বলা হয়েছে যে, 'যোগ' প্রত্যক্ষ দর্শন এ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা অথবা বাচন সম্ভব নয়। সাধক সাধনাপথে চলেই উপলব্ধি করেন যে, মহর্ষি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন এর বাস্তবিক আশয় কি? এই পুস্তিকা সাধনোপযোগী।

৪টি ভাষাতে

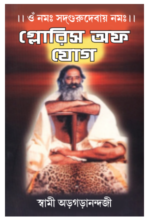

গ্লোরিস অফ যোগ -

হঠ, চক্র, ভেদন এবং যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যানের বিষয়ে পূর্ণ পরিচয়।

ইংরাজী ভাষাতে

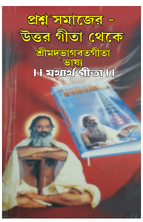

প্রশ্ন সমাজের -

উত্তর গীতা থেকে -

এই পুস্তিকাতে সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক যেমনই প্রশ্ন হোক, সেসব গীতার আলোকে সমাধান করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

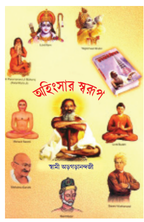

অহিংসার স্বরূপ -

অহিংসা বিচার্য বিষয়। মূলতঃ এটি যৌগিক, আন্তরিক সাধনার শব্দ। এই পুস্তিকাতে আমরা অধ্যয়ন করব যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ অহিংসা বিষয়টিকে কোন সন্দর্ভে নিয়েছেন।

৪টি ভাষাতে

বাল গীতা -

এই পুস্তিকা বালকের নির্মল মনে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ উৎপন্ন করে সমাজ এবং সাধনার পথে সহজ প্রবেশের জন্য কার্যকর। এই পুস্তিকাতে সমর্পণের পাঠ্যক্রম অঙ্কিত আছে এর ফলে শিশুদের মধ্যে ধর্ম-সন্দেশ-এর বীজারোপণ, সংস্কার সৃষ্টি হবে। তারা এই পথে চলবে এবং নিজের ভগবৎস্বরূপ লাভ করবে।

৩টি ভাষাতে

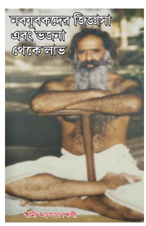

ভজনা থেকে লাভ (নবযুবকদের জিজ্ঞাসা) -

এই পুস্তিকাতে নবযুবকদের বহু প্রশ্নের সংক্ষেপে সমাধান করে ভজনার অনিবার্যতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যদি একমাত্র পরমাত্মাতে মনকে স্থির করতে সক্ষম হন তবে সেই প্রভুর সংরক্ষণে সাধনা চলতে থাকবে, জাগতিক কাজেও সহযোগিতা লাভ হবে এবং গমনাগমন থেকে মুক্তিলাভ তো হবেই কারণ ঈশ্বর পথে আরম্ভের নাশ হয় না।

হিন্দী ভাষাতে

MP3 অডিও সিডিজ্

১১টি ভাষাতে

শ্রী স্বামীজীর মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত

অমৃতবাণীর সঙ্কলন ভল্যুম ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত

হিন্দী ভাষাতে

অনুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠ সংখ্যা
প্রাক্কথন	ক - ঘ
প্রথম অধ্যায় - সমাধিপাদ	১ - ২৬
দ্বিতীয় অধ্যায় - সাধনপাদ	২৭ - ৫২
তৃতীয় অধ্যায় - বিভূতিপাদ	৫৩ - ৮২
চতুর্থ অধ্যায় - কৈবল্যপাদ	৮৩ - ১০০
উপসংহার	১০১ - ১২২
এক ভক্তের প্রশ্ন	১২৩ - ১২৮

।। ওঁ।।

প্রাক্কথন

যোগ শব্দ 'যুজ' ধাতুতে 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগ করলে নিষ্পন্ন হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুসারে যুজ ধাতু তিনটি সমষ্টিতে পাওয়া যায়—১. যুজ্ সমাধৌ দিবাদি : আত্মনে পদী, ২. যুজির যোগে রুধাদি : উভয়পদী এবং ৩. যুজ্ সংযমনে চুরাদি : পরস্মৈপদী। এই প্রকার যোগের অর্থ ক্রমশঃ সমাধি, যোগ এবং সংযমন।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কোশ 'অমরকোশ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে—'**যোগ: সন্নহনোপায়: ধ্যান সংগতি যুক্তিষু**'—যোগ হল ধ্যানের সংগতি, ধ্যানের কৌশল। 'সন্নহন' ধ্যানে সংঘর্ষশীল হওয়া যোগ। বৈদকে যুক্তি (উপায়)কেও যোগ বলে। ধ্যান দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করা যোগ। দুটি বস্তুর সংগতি অর্থাৎ মিলকে যোগ বলে।

সাধারণ ব্যক্তির অনুসারে যোগাভ্যাস দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধি লাভ হয়, যার ফলে এমন কাজ করা সম্ভব, যা সাধারণের নাগালের বাইরে।

ঋগ্বেদ, পঞ্চম মণ্ডল, সূক্ত একাশী-এর প্রথম ঋচাতে উল্লেখ করা হয়েছে—

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ।।

বিপ্র অর্থাৎ জ্ঞানীজন বুদ্ধি এবং জ্ঞানের স্রোত পরমাত্মাতে '**মনঃ যুঞ্জতে**'—নিজ মনকে নিযুক্ত করেন এবং '**ধিয়ঃ যুঞ্জতে**'—তাতেই বুদ্ধি নিযুক্ত করেন। '**এক: ইত দেব**'— একমাত্র দেব, সবকিছুর জ্ঞাতা, যশ ধারণকর্তা, তাঁর স্তুতি মহৎ কাজ।

এইপ্রকার বৈদিক সংহিতাগুলিতে যোগের আশয় হল মনকে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করা।

যোগ হল অনাদি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে বলেছেন—'**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহম্ব্যয়ম্।**' এই অবিনাশী যোগ আমি বিবস্বান্ (সূর্য)—কে বলেছিলাম। '**স এবায়ং ময়া তেহদ্যযোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।**' **(৪।৩)**— এই পুরাতন যোগ এখন আমি তোমাকে বললাম।

গীতা যোগশাস্ত্র এতে ভগবান যোগ-এর জন্য রাজযোগ, হঠযোগ, সুরতিযোগ, লয়যোগ-এর ন্যায় বিশেষণের প্রয়োগ না করে মাত্র যোগ শব্দটিকেই বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন।

'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ'। (১৮।৭৮) গীতাশাস্ত্র অনুসারে তিনি মহাযোগেশ্বর।

গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অর্জুন **'যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।' (৬।৪৭)** যোগীগণের মধ্যেও যিনি অন্তর থেকে নিরন্তর আমার ভজনা করেন সেই যোগী আমার অত্যন্ত প্রিয়, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে একমাত্র পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত হওয়াকেই যোগ বলে।

গীতাশাস্ত্রে ভগবান বলেছেন—**'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভি যুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।' (৯।২২)**—অনন্য অর্থাৎ অন্য নয়। আমাকে ছাড়া অন্য কারও ভজনা করে না আমারই নিরন্তর চিন্তন করে, সেই নিত্য একীভাবে সংযুক্ত পুরুষগণের যোগক্ষেম স্বয়ং আমি বহন করি অর্থাৎ অনন্যভাব-এ ভগবানের চিন্তনে নিযুক্ত হওয়াকে যোগ বলে।

গীতা শাস্ত্রের অনুসারে যোগে নিযুক্ত হওয়ার বিধি কি?

'সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।' (৮।১২)

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে অর্থাৎ বাসনা থেকে পৃথক অবস্থান করে মন হৃদয়ে স্থিত করে, সুরত অর্থাৎ মনের দৃষ্টি মস্তিষ্কে স্থির করে **'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মামনুস্মরণ। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।' (৮।১৩)**—ওঁ কেবল, যা অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, এর জপ এবং **'মামনুস্মরণ'**—আমার রূপ ধ্যান করতে-করতে দেহ অধ্যাস ত্যাগ করেন তিনি পরমগতি লাভ করেন। অর্থাৎ একমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করাকে যোগ বলে। আপনাকে কখন লাভ করা সম্ভব?

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।। (৮।১৪)

আমা ব্যতীত কাউকে চিত্তে ঠাঁই দেন না—অর্থাৎ অনন্য চিত্ত হয়ে যিনি নিরন্তর আমার স্মরণ্ করেন, সেই নিত্য আমাতে যুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য। অর্থাৎ যোগের পরিণাম ভগবদ্দর্শন, সিদ্ধাই-এর প্রদর্শন নয়। যোগ কাকে বলে—

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিন্নচেতসা।। (৬।২৩)

যা সংসারের সংযোগ ও বিয়োগ থেকে রহিত, তার নাম যোগ, যে সুখ আত্যন্তিক, যাঁকে পরমতত্ত্ব পরমাত্মা বলা হয়, তাঁর মিলনকে যোগ বলে।

বর্তমানে অনেক বিশেষণের মাঝে যোগ নিজের মূল আশয় হারিয়ে ফেলেছে। লোকে ঐন্দ্রজালিক কৌশলকে যোগ বলে। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদিগুলির দিকেই এর প্রচারকদের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। অস্বাভাবিক কিছু ক্রিয়া দ্বারা এবং যন্ত্র, মন্ত্র, মাদুলি, কবচ ইত্যাদি দ্বারা ভবিতব্য—এ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব এ

দাবী কতিপয় যোগীগণ করছেন। বাস্তবে যাঁরা যোগী তাঁরা ঈশ্বর চিন্তনে এত বেশী তন্ময় হয়ে যেতেন যে, শরীরের দিকে নজর দিতেই পারতেন না। মাথায় জটা দেখা দিত, দেহে ধুলো-মাটির আস্তরণ চাপত; বর্তমানে লোকেরা কৃত্রিম জটা মাথায়, ধূলো-মাটি মেখে নেন। ঈশ্বর প্রেম, চিন্তন এবং বিরহের পথ, কিন্তু দেশে বিদেশে 'যোগ'-এর নামে শুধু আসনের প্রচার, কুণ্ডলিনী জাগরণ, ধ্যান-শিবির প্রাণায়াম-প্রশিক্ষণ-এর প্রচলন দেখে মনে হচ্ছে যে বর্তমান সমাজ যোগদর্শন-এর প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শন-এর আশয় থেকে বঞ্চিত হবে একদিন। এইরূপ বিষম পরিস্থিতিতে যোগসূত্র সম্বন্ধে ভক্তদের জিজ্ঞাসা এবং সাধকদের দ্বারা যোগদর্শন প্রসঙ্গে বারংবার প্রশ্ন করার ফলস্বরূপ সকলকে মহর্ষি পতঞ্জলির সূত্রগুলির প্রসঙ্গে যে ক্রমবদ্ধ উপদেশ দান করা হয়েছে, তা প্রস্তুত কৃতিরূপে আপনাদের সকলের সমক্ষে প্রস্তুত করা হয়েছে।

মোর্যবংশ-এর অন্তিম সম্রাট বৃহদ্রথ-এর নিধনের পরে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ-এর শাসন কালে তিনি ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে জন্মজাত জাতি ব্যবস্থার সমর্থন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পূজনীয় এই আধারে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থার স্থাপনা করেছিলেন। এই নতুন ব্যবস্থার পোষক স্মৃতিগুলি ধর্মশাস্ত্রের নামে সেইকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পুষ্যমিত্র-এর সমকালীন ছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। সেই সময় ধর্মের নতুন-নতুন ব্যবস্থা দেখে আশঙ্কিত হয়ে তিনি যোগ-এর কল্যাণকর জ্ঞান সংক্ষিপ্ত সূত্রে প্রস্তুত করেছেন। ভারতের প্রাচীন বিদ্যা যাতে লোপ না হয়। যোগ-এর সিদ্ধান্তগুলি তিনি সূত্ররূপে কিন্তু স্পষ্ট শব্দে প্রস্তুত করেছেন, এতে প্রতীত হয় যে, শব্দানুশাসন ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। জনপ্রবাদ আছে যে, ভগবান পতঞ্জলি মনোবাক্কায় দোষ নিবারণার্থ যোগসূত্র মহাভাষ্য এবং চরকসংহিতা রচনা করেছিলেন।।

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোহপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোহস্মি।।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের নাম করে নতুন কিছু লিখছেন না, পরন্তু গীতাতে যা বর্ণিত, তাই সূত্রবদ্ধ করেছেন। গীতাশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

'যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।।' (৬।২০); যোগ সাধনার জন্য নির্দিষ্ট দশবিধ নীতির মধ্যে পরিগণিত অপরিগ্রহ গীতা-এর **'একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।' (৬।১০)** থেকে গৃহীত। **'স্থির সুখমাসনম্' (যোগ, ২।৪৬)**

গীতা-এর ‘**স্থিরমাসনমাত্মনঃ**’ **(৬।১০)** এর পুনরুক্তি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনের নিরোধ (গীতা, ৬।৩৫) মহর্ষি পতঞ্জলিরও এটাই অভিমত। ওঁ-এর জপ, অনাসক্ত সদ্‌গুরু-এর ধ্যান, তাঁর দ্বারা সাধনার জাগৃতি, স্বরূপের উপলব্ধি মহর্ষির সমস্ত কিছু গীতাশাস্ত্রেরই রূপান্তর।

বর্তমানে যোগের দুটি প্রমুখ প্রণালী প্রচলিত—প্রথমটি মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রগুলির উপর আধারিত। এবং অন্যটি হঠযোগ নামে প্রসিদ্ধ। পাতঞ্জল যোগ ‘**চিত্তানুশাসনম্**’—চিত্তবৃত্তিগুলিকে অনুশাসিত করার উপর আধারিত। কিন্তু হঠযোগ দেহ-সঞ্চালন, স্বাস্থ্য এবং রোগমুক্তির সঙ্গে সম্বন্ধিত। পতঞ্জলি মনের স্থিরতা এবং সুখে উপবেশন করাকেই আসন বলেছেন, কিন্তু হঠযোগের গ্রন্থ চুরাশী থেকে চুরাশী লক্ষ আসনের সম্বন্ধে বলেছে। হঠযোগে নেতি, ধৌতি, বস্তি, নৌলী, ত্রাটক, কপাল-ভাতি, মহামুদ্রা, খেচরী, জালন্ধর, উড্ডীয়ান, মূলবন্ধ, বজ্রোলী, অমরোলী এবং সহজোলী-এর ন্যায় ক্রিয়াগুলি প্রচলিত। কিন্তু এ বিষয়ে যোগ-দর্শন মৌন। হঠযোগ প্রণালীতে ষট্‌চক্র ভেদ করে কুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। সেখানে যোগের আটটি অঙ্গের পরিবর্তে ছ’টি অঙ্গেরই চর্চা করা হয়েছে, যম-নিয়ম বাদ দেওয়া হয়েছে। হঠযোগ প্রাণায়ামে শ্বাসের পূরক, কুম্ভক এবং রেচক-এর উপর লক্ষ্য রাখা হয় যার কয়েকটা রূপ হল উজ্জাই, ভস্ত্রিকা, সূর্যভেদী, ভ্রামরী, শীতলী ইত্যাদি। সিদ্ধাইকে মহর্ষি পতঞ্জলি ধ্যেয় প্রাপ্তিতে ব্যবধান বলে মনে করেন। পরন্তু হঠযোগী সিদ্ধাইকে যোগ-এর মহত্ত্বপূর্ণ উপলব্ধি মনে করে এর প্রদর্শন করতে থাকেন। এই দুটি প্রণালীর মিশ্রণের ফলে যোগ-এর নামে বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এটা বলা বেশী সমীচীন হবে যে, শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে যোগ-এর নাম দেওয়ার ফলে ভ্রান্তিগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কল্যাণকর যোগবিধি সেটাই, যার পরম্পরা বেদ থেকে শুরু করে গীতা পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ, শুঙ্গকালে মহর্ষি পতঞ্জলি যা পুনরায় সূত্রবদ্ধ করেছেন।

মানবমাত্রের জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শন প্রস্তুত করেছেন। এই গ্রন্থে মানবমাত্রের অন্তঃকরণে নিহিত দুঃখের কারণগুলির উন্মুলন করে শাশ্বত কৈবল্য প্রাপ্তির মার্গদর্শন করা হয়েছে।

যোগসূত্র কঠিন এবং যোগাভ্যাসের কতিপয় অবস্থাগুলির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রস্তুত করে না। সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী রূপে রয়েছে। যেন নির্দেশ দিচ্ছে যে, কোন তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর শরণে যাও। এই বার্তার সঙ্গে মহর্ষির সূত্রগুলির ব্যাখ্যা আপনার সমক্ষে প্রস্তুত করা হয়েছে।

শ্রীগুরু পূর্ণিমা
২ জুলাই, ২০০৪ খৃষ্টাব্দ

সদ্‌গুরু কৃপাশ্রয়ী জগদ্‌বন্ধু
স্বামী অড়গড়ানন্দ

।। ওঁ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন

প্রত্যক্ষানুভূত ব্যাখ্যা

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন-এ চারটি পাদ অর্থাৎ চারটি অধ্যায়—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতি পাদ এবং কৈবল্যপাদ। সর্বপ্রথম সমাধিপাদ-এর বর্ণনা করে তিনি যোগের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করেছেন, যাতে আগ্রহ জাগে, সেখান পর্যন্ত পৌঁছানোর সাধনা বিধি সম্বন্ধে বলেছেন, সাধনা দ্বারা ঈশ্বরীয় বিভূতিগুলি প্রকট হবে এবং অবশেষে অবিনাশী পরমপদ কৈবল্যপদের প্রাপ্তির বিধান প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়—সমাধিপাদ

শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পূর্বেই মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যোগ বাস্তবে কাকে বলে?

অথ যোগানুশাসনম্।। ১।।

এখন যোগশাস্ত্রের বিষয়ে বলি। যোগ কাকে বলে? যোগ বলে অনুশাসনকে। কাকে অনুশাসন করা হবে—পাড়া প্রতিবেশীকে? একে অপরকে? একটা দেশ আর একটা দেশকে? যিনি নির্জনে চিন্তনে নিযুক্ত, তিনি কাকে অনুশাসন করবেন? কাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।। ২।।

চিত্তের বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হওয়াই (সম্পূর্ণভাবে শান্ত হওয়াই) যোগ। বৃত্তি হল তরঙ্গ—মনে যে সঙ্কল্পগুলির ঢেউ ওঠে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে শান্ত, অচল, স্থির হওয়াকে যোগ বলে। মনে করুন, অমানুষিক পরিশ্রম করে কেউ চিত্ত বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ করেই নিল তাতে লাভ?

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।। ৩।।

সেই সময় দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হন। দ্রষ্টা আত্মা যিনি চৈতন্য স্বরূপ, সম্পূর্ণ নির্মল, স্বীয় পরমাত্মস্বরূপে স্থিত হন। বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হলে এটাই লাভ, এটাই প্রাপ্তি—নৈষ্ঠিকীম্ সিদ্ধি অথবা পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার। প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, চিত্তবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে কি দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত থাকেন না? সেই অবস্থাতে দ্রষ্টার স্বরূপ কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

বৃত্তিসারুপ্যমিতরত্র।।৪।।

অন্য সময় দ্রষ্টার বৃত্তি যা, স্বরূপ তা'ই। যেরূপ বৃত্তি সেইরূপ পুরুষ, আপনি তাই! লোকে বলে— আমি শুদ্ধ আত্মা; কিন্তু মহাপুরুষগণ বলেন যেরূপ বৃত্তির প্রবাহ, পুরুষের স্বরূপ তাই।

অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে—''ভগবন্! এই শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক যিনি ভজনা করেন, তাঁর গতি কী হয়?'' (গীতা ১৭।১) ভগবান বললেন—''অর্জুন! পুরুষ শ্রদ্ধাময়। সৃষ্টিতে এমন কেউ নেই যার ভিতর শ্রদ্ধা নেই। যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন।'' (গীতা ১৭।৩) এটাই মহর্ষি পতঞ্জলিও বলেছেন যেরূপ বৃত্তি যাঁর, তিনি সেইরূপই হন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ এবং স্বরূপ লাভ করার পূর্বে যেরূপ হবে বৃত্তির প্রবাহ সেইরূপই দ্রষ্টাও হবেন। বৃত্তির মাঝ থেকে পরমাত্মার ততটাই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হবে।

এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই বৃত্তি কি? বৃত্তিগুলির স্বরূপ কি?—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ।। ৫।।

পাঁচটি রূপে বিভক্ত এই বৃত্তিগুলি দুই প্রকারের— ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। প্রথমটি ক্লেশ ধারণ করে, দ্বিতীয়টি ক্লেশ থেকে মুক্তি প্রদান করে। পাঁচ প্রকারের বৃত্তিগুলির নাম নিম্নলিখিত—

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ।। ৬।।

প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। এগুলির মধ্যে প্রমাণ বৃত্তিগুলি সঞ্চালিত করে। 'স্মৃতি' সংস্কার ধারণ করে। বৃত্তির সংখ্যা দুটি-বিপর্যয় এবং বিকল্প। বিপর্যয় বৃত্তি মিথ্যাজ্ঞানের সংবাহিকা, বিকল্প বৃত্তি অপৌরুষেয়, শব্দ, দ্রষ্টা—দৃশ্যের সংযোগ দ্বারা যে শব্দ (নির্দেশ) লাভ হয় সেই অনুসারে আচরণ করে। একটি বৃত্তি 'নিদ্রা'। এটি সব বৃত্তির সুপ্তাবস্থা। এতে অজ্ঞানের জড়তা নেই আবার ব্যর্থজ্ঞানের অবরোধ নেই। এবং শব্দজ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন বস্তু (দ্রষ্টা)-এর বিকল্পও নেই। এই জড় দেহ পর্যন্তই সীমিত। যা নেই, ভূতাদিকের দেহ, যা নশ্বর, যার অস্তিত্ব নেই, অভাব, সেখান পর্যন্তই সীমিত। এটা বৃত্তির নিদ্রা অবস্থা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন, '**প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।' (১৬।৭)** ''অর্জুন! অসুর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কার্যম্ কর্মে প্রবৃত্ত এবং অকর্তব্য কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না অর্থাৎ করণীয় কি, তা জানে না প্রবৃত্তও হয় না এবং অকর্তব্য কি, তাও জানে না সেইজন্য নিবৃত্ত হতে পারে না।'' বৃত্তির এই সুপ্তাবস্থাকেই নিদ্রা বলে একে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসুরী সম্পদের অন্তর্গতই প্রস্তুত করেছেন।

এখন দেখুন প্রমাণ-বৃত্তির স্বরূপ—

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।। ৭।।

প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম। প্রত্যক্ষ (প্রতি অক্ষ) এর অর্থ—চোখের সমক্ষে হওয়া। কিন্তু প্রত্যক্ষ বলতে ঐটুকুকেই বোঝাচ্ছে না। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ দ্বারা যে অনুভূতি লাভ হয় তা হল প্রত্যক্ষানুভূতি, প্রত্যক্ষ করা। একবার অনুসুইয়া আশ্রমে রাত্রিতে আমি বিস্তীর্ণ শিলাভূমির উপর শুয়েছিলাম। মধ্যরাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঠান্ডা-ঠান্ডা রজ্জুর ন্যায় কিছু পেটের উপর দিয়ে পার হচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম, এত ঠান্ডা। বরফের ন্যায়! তাও আবার সেটা পেটের উপর দিয়ে পার হচ্ছে! সাপ হতে পারে। ধীরে-ধীরে ঠান্ডা—লাগা বন্ধ হয়েছিল। তখন আমি টর্চ জ্বালিয়ে দেখেছিলাম, সত্যি একটা সাপকে যেতে দেখেছিলাম। টর্চ জ্বালানোর পূর্বে চোখে দেখিনি কিন্তু স্পর্শানুভূতি দ্বারা সেটা যে সাপ, আগেই টের পেয়েছিলাম।

বন্য পশুরা এক কিলোমিটার দূর থেকেই বাঘের গন্ধ টের পায়। চিক-পিক করে দলের সকলকে সাবধান করে দেয়। কোল-ভীল প্রভৃতি জাতির লোকেরাও আধ কিলোমিটার দূর থেকে সিংহের গন্ধ পেয়ে যায়। নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নেয়। নাকে গন্ধ প্রত্যক্ষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে 'অনুমান' ক্রিয়াশীল হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রমাণ 'আগম'। পরমাত্মস্বরূপ কৈবল্যপদ লাভ করার জন্য মহাপুরুষগণের দর্শন, তাঁদের বাণী শ্রবণ, তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করাকে আগম বলে। যখনই প্রমাণ লাভ হয় বৃত্তিগুলি সঞ্চালিত হয়, যদি সেগুলি ঈশ্বরোন্মুখী বিবেক, বৈরাগ্য, কল্যাণ-এর ভাব, শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে তবে অক্লিষ্ট এবং যদি প্রবৃত্তির দিকে অগ্রসর তবে ক্লিষ্ট। প্রমাণ দ্বারা বৃত্তি সঞ্চালিত হয়। প্রথম বৃত্তি 'বিপর্যয়'—

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।। ৮।।

যা সেই বস্তুর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়—এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান বিপর্যয়। অস্তিত্বহীন বস্তুতে আসক্তিকে বিপর্যয় বলে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"অর্জুন! আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত পুরুষ চিন্তা করেন এখন আমার কাছে এত ধন আছে পরে আরও হবে। আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন। আমি এই শত্রুকে পরাজিত করেছি, তাকে পরাজিত করব, যজ্ঞ করব, দান করব, নাম যশ হবে। এইরূপ অতৃপ্ত অনন্ত ইচ্ছা, বাসনাকে আশ্রয় করে থাকে। এইরূপ পুরুষ শনৈঃ-শনৈঃ ঘোর নরকে পতিত হন। এইরূপ মনোবৃত্তি যাদের তারা অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে।"

এই বৃত্তি সমস্তটাই ক্লিষ্ট; কিন্তু যদি কোথাও প্রমাণ-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়, যেমন—মহাপুরুষের দর্শন; তৎক্ষণাৎ এই ক্লিষ্ট বৃত্তি অক্লিষ্টের দিকে উন্মুখ হবে।

বাল্মীকি, অঙ্গুলিমাল প্রভৃতির বৃত্তিতে সৎপুরুষের দর্শনের পরই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। পূজ্য পরমহংস মহারাজজীর সান্নিধ্য লাভ করে সতী অনুসুইয়ার স্থানে দস্যুদলের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছিল। দলের সর্দার সাধু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বৃত্তি হল 'বিকল্প'—

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ।। ৯।।

যে জ্ঞান শব্দজন্য জ্ঞানের ফলে হয়, বাস্তবে যার বিষয় বস্তু নেই, তা বিকল্প।

এই পাদ-এরই বিয়াল্লিশতম সূত্রে কথিত হয়েছে '**তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।**' অর্থাৎ শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান এই তিনটির বিকল্প দ্বারা যে সমাধি লাভ হয় তা সবিতর্ক। কিন্তু কোন শব্দ শুনে অথবা শব্দের আশয় বুঝে নিলে সমাধি তো হয় না। বিভীষণ শ্রীরামের শরণে এসে নিবেদন করেছিল, কিন্তু মন্ত্রীগণ সন্দেহই করেছিলেন—'**কামরূপ কেহি কারন আয়া।' (মানস, ৫।৪২।৬)** শব্দ, শব্দের আশয় জানা হয়ে গিয়েছিল, সেই অনুসারে বিভীষণকে আবদ্ধ করার জোগাড়ও হয়ে গিয়েছিল। সমাধিস্থ তো কেউ হয়নি।

বাস্তবে এই শব্দ 'অনুভব', যা সমর্থ সদ্গুরুর দ্বারা অধিকারী সাধকের মধ্যে ভজনার জাগৃতিরূপে প্রস্ফুটিত হয়। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগের ফলে যে প্রেরণা লাভ হয় তা শব্দ। দৃশ্যের প্রয়োজন হল—পুরুষের জন্য ভোগ এবং মুক্তি প্রদান করা। এই প্রয়োজন মিটিয়ে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগও শান্ত হয়ে যায়। (দেখুন সাধনাপাদ সূত্র ১৭, ১৮ এবং ১৯)। সেই চেতনদ্রষ্টা যেরূপ মুক্তির অনুকূল দৃশ্য সঞ্চালন করেন, বোঝান, তাকে শব্দ বলে। এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করে যে চিত্তবৃত্তি পরিচালিত হয়, তাকেই বিকল্প বলে। এখানে বস্তুরূপে পরমাত্মা তো নেই, কিন্তু তার বিকল্প দৃঢ় হয়। '**সত্য বস্তু হ্যায় আত্মা, মিথ্যা জগৎ পসার।**' তিনকালে সত্যের অভাব হয় না। আত্মাই সত্য এবং সনাতন। এইপ্রকার বস্তুরূপে পরমাত্মা তো সম্মুখে নেই কিন্তু তার বিকল্প উত্তমরূপে পুষ্ট হয়। এর নাম বিকল্পবৃত্তি। সমস্ত বৃত্তিই অক্লিষ্ট; কিন্তু সঙ্গদোষ থেকে প্রমাণ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্লেশের দিকে উন্মুখ হয়ে যায়। '**শৃঙ্গী কী ভৃঙ্গী করি ডারী, পারাশর কে উদর বিদার।**'

পূজ্য পরমহংস মহারাজজী অনুভবে দেখেছিলেন যে, গত কয়েকটা জন্ম ধরে তিনি সাধু। গত জন্মে নিবৃত্তি হয়ে যেত কিন্তু মনে দুটো কৌতূহল জেগেছিল যে, বিবাহ কি? কয়েকজন সাধু গঞ্জিকা সেবন করে দুলছেন কেন? মনের এটুকু তরঙ্গের জন্য আর একটা জন্ম নিতে হয়েছিল। মহারাজজী সম্পূর্ণ অক্লিষ্ট বৃত্তি ধারণ করে চলছিলেন, মনে কৌতূহল জাগার সঙ্গে-সঙ্গে ক্লিষ্ট বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়লেন। মহাপুরুষগণ শব্দের উপর খুব জোর দিয়েছেন—

শব্দ বিনা শ্রুতি আঁধরী, কহো কহাঁ লৌ জায়।
দ্বার ন পাবে শব্দ কা, ফির ফির ভটকা খায়।। (কবীর)

শব্দ ব্যতীত চিন্তনে যে সুরতি (মনের দৃষ্টি)কে নিযুক্ত করা হয়, তা অন্ধ। শব্দ ব্যতীত শ্রুতির অধ্যয়ন করার চেষ্টা বুদ্ধির স্তর অনুসারে কল্পনামাত্র। যদি শব্দ লাভ হয়নি, ভজনা জাগ্রত হয়নি; শব্দ, অর্থ এবং এর জ্ঞান বুঝে সেই অনুসারে আচরণ করতে সমর্থ না হলে বার-বার পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে হয়। অনুভবও উপলব্ধি করতে হয়। এটা বোঝার জিনিষ। ভগবান লিঙ্গ-অলিঙ্গ প্রতীক অথবা প্রতীক ব্যতীতই সমস্ত খবর দেন। এই বিদ্যা অধ্যয়ন করতে হয়। এটাই হল **'শব্দ জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।'** শব্দের মানে বুঝুন যে, ইষ্ট কি বলছেন? আশয় কি? সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানের সঙ্গে মনে যে বৃত্তির উদয় হয়, যার বিষয়বস্তু ইষ্ট কিন্তু এর বিকল্প অবশ্যই। এটাই বিকল্প-বৃত্তি।

ভগবান শ্রীরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষণকে বলেছিলেন—মায়ার দুটি রূপ বিদ্যা এবং অবিদ্যা। **'এক দুষ্ট অতিসয় দুখরূপা। জা বস জীব পড়া ভব কূপা।।' (মানস, ৩।১৪।৫)** অবিদ্যা দুষ্ট, অত্যন্ত দুঃখরূপ। অবিদ্যার বশীভূত হয়ে জীব ভব-কূপে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। **'এক রচই জগ গুন বস জাকে। প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকে।।' (মানস, ৩।১৪।৬)** মায়ার আরেকটি রূপ বিদ্যা, বিদ্যামায়া জগতের তিনটি গুণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। **'গুন বসে জাকে'**—

সত্ত্ব, রজ এবং তম—তিনটি গুণকেই নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। কিন্তু বিদ্যা-মায়া প্রভু দ্বারা প্রেরিত। যদি ভগবান প্রেরণা না করেন তবে তার কাছে কোন সামর্থ্য নেই, সেটা বিদ্যাই নয় এই প্রকার দ্রষ্টার সহযোগে যে বৃত্তি ক্রিয়াশীল তাকে বিকল্প বৃত্তি বলে।

এই বিকল্পবৃত্তি যা সর্বপ্রকারে অক্লিষ্ট, বিজাতীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই বিকল্পবৃত্তি ক্লিষ্টের দিকে পরাবর্ত হতে পারে। যেমন—এই সাধন-পথ দুর্গম, কিছুকালের জন্য ভোগ ত্যাজ্য নয়। একটা কুটীর নির্মাণ করে নেওয়া খুব বেশী পরিগ্রহ কি!

এখন নিদ্রা বৃত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন—

অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।। ১০।।

অভাবের জ্ঞান-এর অবলম্বন করে যে বৃত্তি তা নিদ্রা। এই বৃত্তি সংসারের মিথ্যা জ্ঞান দ্বারাও আবদ্ধ নয় এবং শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানও নয়। এটা বৃত্তির সুপ্তাবস্থা—এই অবস্থাতে ব্যক্তি প্রকৃতিতেও ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। আবার স্বরূপের দিকেও অগ্রসর হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি এই অবস্থাকে বৃত্তির সুপ্তাবস্থা বলেছেন। এই বৃত্তি নিদ্রা।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। (গীতা, ২।৬৯)

জগতরূপ রাত্রিতে সকলেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। এটা নিদ্রা-বৃত্তি। জগতরূপ রাত্রিতে মানুষ প্রায়ই প্রকৃতিতে আসক্ত থাকে; কিন্তু যার নিদ্রা বৃত্তি সে জড় প্রকৃতিতেও আবদ্ধ নয়। মনে করুন, পথ দুটি। একটা প্রকাশে পূর্ণ এবং অন্যটা অন্ধকারে পরিপূর্ণ। দুটো পথের মাঝে একটা পায়ে চলা পথে কোন ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছে—একটা পা এই পথে, অন্যটা ঐ পথে। কখনও এদিকে দেখছে, কখনও ওদিকে। এটা নিদ্রা বৃত্তি—না সংসারের দিকে না স্বরূপের দিকে।

পূজ্য মহারাজজীর শরণে যখন আমিও গিয়েছিলাম, তখন মহারাজজী বলেছিলেন, ''কিছু জানে না।'' বাস্তবে আমি কিছুই জানতাম না। একদম নিদ্রা-বৃত্তি! সংসারের জড়তাও ছিল না আবার ভগবৎ পথের জ্ঞানও ছিল না।

এই নিদ্রা বৃত্তিও সদা থাকবে না। যেমনই একটু একটু প্রত্যক্ষ হয়, অনুমান করতে সমর্থ হলেই বৃত্তি গতিশীল হয়ে যাবে। শুভ প্রত্যক্ষ হলে অক্লিষ্টবৃত্তি, অশুভ হলে বৃত্তি ক্লিষ্ট হয়ে যাবে। কোন বিত্তশালী ব্যক্তিকে দেখে সাংসারিক জীবনে, সফল হওয়ার কামনা করতে শুরু করলাম যার অস্তিত্বই নেই, 'মিথ্যাজ্ঞানম্'-এর দিকে আকৃষ্ট হয়ে ক্লিষ্ট বৃত্তির সৃজন করে বসা। যদি আগম প্রমাণ-এর সঙ্গলাভ হয়, যেমন—মহাপুরুষের দর্শন, তবে তা পরমাত্মার দিকে উন্মুখ হয়ে যাবে, অক্লিষ্ট বৃত্তি প্রবাহিত হবে।

সকল বৃত্তিই যেখানে জাগে সেই ধরাতল হল স্মৃতি—

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।। ১১।।

অতীতে যে কার্যগুলি অনুসরণ করা হয়েছে তা পুনরায় প্রকট হওয়া, ঢাকা না পড়া স্মৃতি-বৃত্তি।

মহর্ষি পতঞ্জলি কৈবল্যপদ-এর সপ্তম সূত্রে বলেছেন যে, যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়। তাঁরা কর্ম করলে শুভ, অশুভ কোন সংস্কার-এর সৃষ্টি হয় না; কারণ তাঁরা স্বরূপস্থ। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্ম তিন প্রকারের—ভাল, মন্দ এবং মিশ্রিত। প্রাণী এবং তাদের সংস্কারের মাঝে জাতি অর্থাৎ জন্ম, দেশ এবং কাল-এর ব্যবধান পড়ে থাকে। চিত্তবৃত্তি একপ্রকার থেকে দ্বিতীয় প্রকারে পরিবর্তিত হওয়া জাতি অর্থাৎ একটা জন্ম। দেহ পরিবর্তন, এটাও জন্ম। এই জন্ম-পরিবর্তনগুলি, দেশ এবং কাল-এর ব্যবধান হলেও, সংস্কার প্রকট হওয়াতে কোন বাধা উৎপন্ন হয় না। সঠিক সময়ে সেই রূপ প্রকট হয়ে যায়; কারণ স্মৃতি এবং সংস্কার দুটোর একই রূপ। স্মৃতি সেই ধরাতল, যেখানে সংস্কার প্রকট হয়। সংস্কার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়। কিন্তু এমন এক অবস্থা আসে যখন চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থাতে **'স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থ মাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।' (১।৪৩)** স্মৃতি উত্তমরূপে শুদ্ধ হয়। চিত্তের

স্বরূপ শূন্য হয়, লক্ষ্যমাত্রের আভাস থাকে—এটাই নির্বিতর্ক সমাধি। সেই সময় স্মৃতি উত্তমরূপে শুদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে ভাল, মন্দ কিছু অঙ্কুরিত হয় না। কারণ চিত্তের স্বরূপ শূন্য হয়ে যায়। অন্তিম সংস্কারও প্রকট হয়, ফল প্রদান করে এবং শান্ত হয়ে যায়। সেই সময় স্মৃতি পূর্ণতঃ শুদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু তখনও জীবিত থাকে।

স্মৃতি কোন বৃত্তি নয়। মহর্ষি বৃত্তিগুলিকে পাঁচ প্রকারে বিভাজন করেছেন। স্মৃতি এমনই এক ধরাতল যার উপর বাকী বৃত্তিগুলি উদ্ভূত হয়। অন্তিম সংস্কার উদিত হওয়ার পরই চিত্তের স্বরূপ শূন্য হয়ে যায়, স্মৃতি শুদ্ধ হয়ে যায়। শুধু লক্ষ্যের আভাস থাকে, সেই সময় নির্বিকল্প সমাধি হয়।

অতএব স্মৃতি সেই ধরাতল যার উপর পূর্বের অনন্তকালের সংস্কার অঙ্কুরিত হয়। এগুলি ক্লিষ্ট, অক্লিষ্ট দুইই হতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—আমি এই অবিনাশী যোগ কল্পের আরম্ভে বিবস্বান্‌কে বলেছিলাম। সূর্য নিজ পুত্র মনুকে বলেছিলেন। তিনি কিছু দেননি, শুধু বলেছিলেন। মনু তা নিজ স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন। শুরু থেকেই এই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া চলছে। মানুষের উৎপত্তি হওয়ার পর থেকেই কোন সময় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত বৃত্তির রূপ দুটি—দৈবী সম্পদ্ এবং আসুরী সম্পদ্। দৈবী সম্পদ্ পরমশ্রেয় প্রদান করে, অক্লিষ্ট এবং আসুরী সম্পদ্ অধোগতিতে নিয়ে যায়, ক্লিষ্ট। এটাই—শুভ-অশুভ, প্রবৃত্তি মার্গ-নিবৃত্তি মার্গ, সজাতীয়-বিজাতীয়, বিদ্যা-অবিদ্যা। (বিদ্যা পরমগতি প্রদান করে, অবিদ্যা ভবকূপে নিমজ্জিত করে।) এই-ই হল পুণ্যময়ী প্রবৃত্তি-পাপময়ী প্রবৃত্তি, ধর্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র। কালের নিয়মে ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, সম্বোধন অন্যভাবে করা হচ্ছে; কিন্তু বৃত্তিগুলি দুটিই ছিল এবং আছেও—একটি ঈশ্বরোন্মুখী বৃত্তি এবং অন্যটি অনন্ত যোনিতে বারংবার জন্ম লাভের। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি এই বৃত্তিগুলির গতি যাতে বোধগম্য হয় সেইজন্য এই দুটিকে পাঁচপ্রকারে ব্যাখ্যা করেছেন। বৃত্তি সঞ্চালন কিভাবে হয়? প্রমাণ দ্বারা! বৃত্তি কোথায় অঙ্কুরিত হয়? স্মৃতি-পট-এ। কখনও-কখনও সুষুপ্ত থাকে তখন নিদ্রার অবস্থাতে থাকে। কার প্রেরণাতে কাজ করে? দিশা নির্দেশ কিভাবে লাভ হয়? বিপরীত জ্ঞানের জড়তার বন্ধন থাকলে 'বিপর্যয়' এবং দ্রষ্টা দৃশ্যের সংযোগ দ্বারা যে শব্দ লাভ হয় তার অর্থ বোঝা এবং প্রবৃত্ত হওয়া—এটা 'বিকল্প'। এই প্রকার বৃত্তি দুটিকে কয়েকটা দৃষ্টিকোণে বিচার বিবেচনা করা হয়েছে যাতে সাধক সরলতাপূর্বক বৃত্তিগুলির গতি বুঝে সেই অনুসারে সাধন পথ-এ চলতে পারে।

বৃত্তিগুলি কিরূপে শান্ত হবে? নিরুদ্ধ কি করে হবে? এর আরম্ভিক উপায় বলছেন—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।। ১২।।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়। এখান থেকেই সাধন আরম্ভ হয়। পূর্তিপর্যন্ত সঙ্গে থাকে এই দুটির মধ্যে প্রথমে অভ্যাসের স্বরূপ দেখুন—

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।। ১৩।।

চিত্তের স্থিরতার জন্য যে প্রযত্ন করা হয় তাকে অভ্যাস বলে। বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এই অভ্যাস করে যেতে হয়, সেইজন্য নিরন্তর এর পালন করা উচিৎ। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাঽসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।। ১৪।।

কিন্তু সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিরন্তর এবং শ্রদ্ধাপূর্বক করে গেলেই দৃঢ় হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন **'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্ন চেতসা।' (৬।২৩)**

সেই যোগের অভ্যাস স্থির হয়ে নিশ্চয়পূর্বক করা কর্তব্য। যিনি ধৈর্য ধারণ করে রত থাকেন, তিনিই যোগে সফল হন।

এখন বৈরাগ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।। ১৫।।

লোক এবং পরলোকের দেখা-শোনা বিষয়গুলির প্রতি, তৃষ্ণারহিত চিত্তের বশীকার নামক অবস্থা বৈরাগ্য। অর্থাৎ সংসারে দৃশ্য-শ্রব্য সমস্ত কিছু, ইহলোক থেকে শুরু করে স্বর্গের ভোগগুলির প্রতি আসক্তির ত্যাগকে বৈরাগ্য বলে। এই বৈরাগ্য-অভ্যাস সম্পন্ন হলে পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়, যার ফলে 'পর-বৈরাগ্য'-এর অবস্থা লাভ হয়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।। ১৬।।

পুরুষ অর্থাৎ পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে জানতে পারলে দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হন। সেই সময় প্রকৃতির গুণগুলিতে তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে অভাবকে পর-বৈরাগ্য বলে, এটা বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—**'রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।' (২।৫৯)** — ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করেন যাঁরা তাঁদের আসক্তি পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে নিবৃত্ত হয়। পরমাত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ যখন আর কিছু নেই তখন সাধক কাকে লাভ করার তৃষ্ণা রাখবেন? যে পুরুষের জ্ঞান হলে 'পর-বৈরাগ্য'-এর উপলব্ধি হয়। তার স্বরূপ কি? পূর্ণজ্ঞান-এর পূর্বের অবস্থার চিত্রণ করে বলছেন—

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎসম্প্রজ্ঞাতঃ।। ১৭।।

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং (অস্মিতা) অহংকার-এর সঙ্গে যে সমাধি হয়, তাকে সম্প্রজ্ঞাত বলে। যোগ-এ সুরত (মনের দৃষ্টি) সমে স্থিত, যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান উত্তম, তা সত্ত্বেও এই যোগে বিতর্ক চলতে থাকে। সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা ৩৩-এ বলছেন '**বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্**।' যোগ-সাধন-এ বিরোধী ভাব উৎপন্ন হলে তাতে নিজের দুর্বলতা দেখা, সেগুলি থেকে অনিষ্ঠ হতে পারে ভেবে সেগুলি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাকে প্রতিপক্ষ ভাবনা বলে। এইরূপ বিতর্কও ওঠে, সেগুলি নিবারণ করার জন্য বিচারও চলে। নিবারণ হলেই আনন্দও হয়। এবং অহংকার-প্রকৃতি-পুরুষ-এর মিশ্রণ, এদের দ্বারা প্রভাবিত চিত্তের যে সমাধান, তাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ-এর অবস্থা বলে। এখন দেখুন প্রাপ্তি—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ।। ১৮।।

যখন বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অহংকারও শেষ হয়ে যায়, অভ্যাস করতে-করতে এই পূর্ব অভ্যাসের উপর যখন পূর্ণ বিরাম ঘটে, যখন চিত্তের, স্বরূপ সংস্কার মাত্রই শেষ থাকে, সেই যোগ-এর প্রকারই অন্য, একে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে অর্থাৎ সেটা কৈবল্যের অবস্থাযুক্ত সূক্ষ্ম, অনির্বচনীয়। অনেক জন্মের পথিকই এই স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। যেমন—অনেক জন্মের পর বুদ্ধ যখন রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেটা তাঁর প্রাপ্তির জন্ম, শেষজন্ম ছিল, এক হাজার জন্মের পর কাকভুশণ্ডির শেষজন্ম, প্রাপ্তির জন্ম ছিল। গুরু মহারাজজীরও শেষজন্ম, প্রাপ্তির জন্ম ছিল। জড়ভরত, শুকদেব, ধ্রুব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি এইরূপ মহাপুরুষ ছিলেন যাঁরা জন্মজাত পূর্ণত্ব প্রাপ্ত ছিলেন এইরূপ মহাপুরুষদের যোগ শীঘ্র সিদ্ধ হয়। কারণ—

'ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্'।। ১৯।।

ভজন করতে-করতে যখন বিদেহাবস্থা চলে আসে, প্রকৃতির লয় হয় এইরূপ যোগীদের এই যোগ-এর প্রাপ্তিতে 'ভবপ্রত্যয়' অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাটাই মাধ্যম, ভজনার বিশেষ সহযোগ থাকে না; যেমন—শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ধ্রুব ইত্যাদি ছিলেন। এঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধাইগুলি কাজ করছিল। এঁরা ভজনা সম্পূর্ণ করেছেন। এখন পূর্ণত্ব প্রাপ্তিতে এদের জন্মগ্রহণ করাটাই মাধ্যম।

ধ্রুব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ভগবন্! শুনেছি, সাধক কোটি-কোটি জন্ম ধরে তপস্যা করেন, তবে আপনি দেখা দেন আমি খুব অল্প সাধনা করেই আপনাকে লাভ করেছি। এত অনুকম্পা কেন?" ভগবান বলেছিলেন, "বৎস! তুমি গত কয়েকটা জন্ম ধরেই ভজনা করছ। এই যে অস্থি পঞ্জরের পাহাড়টা দেখছ এসবই তোমার। এই শিলাখণ্ডের উপর বসেই তুমি ভজনা করেছিলে এখানেই দেহপাত হয়েছিল। এটা তোমার প্রাপ্তির জন্ম। প্রাপ্তিতে ছ'মাস বাকী ছিল, যা তুমি সম্পূর্ণ করেছ। এখন তুমি অচলপদ প্রাপ্ত করেছ।"

মহাভারতে এরূপ উল্লিখিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গত দশ জন্ম ধরে চিন্তন-পরায়ণ ছিলেন। তাঁকে সেই জন্মগুলিতে বিষ্ণু, বামন, নারায়ণ ইত্যাদির অবতার বলেও সম্বোধন করা হয়েছিল; কিন্তু অপূর্ণ ছিলেন। ''রাজন্! এই জন্মে পরব্রহ্ম পরমাত্মা রূপে আপনার সঙ্গে রয়েছেন, আপনি বিজয়ী হবেন—দেবর্ষি নারদ আমাকে একথা বলেছেন।" যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে অর্জুন একথা বলেছিলেন। বস্তুতঃ ভগবানের জন্মের সাথে-সাথে তাঁর অলৌকিক বিভূতিগুলি প্রদর্শিত হতে শুরু করেছিল। ভজনা সম্পূর্ণ হওয়া অল্পই বাকী ছিল। তিনি তিনদিন বদ্রীকাশ্রমে ধ্যানস্থ ছিলেন। ব্রহ্ম মুহূর্তে রাত দুটো থেকেই উঠে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে ভজনাতে বসে যেতেন। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ ভবপ্রত্যয় যোগী ছিলেন। ভব মানে শরীর। এঁর পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্মগ্রহণ করাই মাধ্যম ছিল সাধন নয়।

'**বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ।' (৩।৪৩)** দৃশ্য-শ্রব্য বস্তুতে কল্পনারহিত বৃত্তিতে নিরন্তর প্রবাহ যখন হয়—এটাই মহাবিদেহাবস্থা। এই অবস্থা জাগ্রত হলেই জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা আত্মা এবং তোমার মাঝে যে আবরণ তা-শান্ত হয়ে যায়। এই স্থিতিযুক্ত সাধকের দেহ ত্যাগ হলে তবে জন্মগ্রহণ করাই তার পূর্ণতার মাধ্যম হয়ে যায়। তার প্রাপ্তিতে 'ভবপ্রত্যয়'—পুনরায় জন্মগ্রহণ করাটাই মাধ্যম, সাধনা নয়। সাধনা তার সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সেইজন্য মহাপুরুষদের যোগ তৎকাল সফল হয়। কিন্তু অন্যান্যদের যোগ কিরূপে সফল হয় ? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্।। ২০ ।।

অন্যান্য সাধকদের চিত্তবৃত্তি-নিরোধ এবং লক্ষ্য প্রাপ্তিরূপ যোগ শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাপূর্বক ক্রমশঃ সফল হয়। পূর্বে ঈশ্বর-পথ-এ শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞ, দান কর্ম সব ব্যর্থ হয়ে যায়, সেইজন্য—

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধবা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। (গীতা, ৪।৩৯)

অর্জুন ! শ্রদ্ধাবান্ তৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় পুরুষই জ্ঞানলাভ করতে পারেন, যা লাভ করার পর আর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না। ঈশ্বর—পথ-এ শ্রদ্ধা-ভাব অনিবার্য। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কিছু লাভ করতে পারে না সব ব্যর্থ হয়ে যায়। ভগবৎ-পথ-এ শ্রদ্ধা অনিবার্য। শুধু ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা। ঈশ্বরের রূপের চর্চা মহর্ষি এই পাদ-এর চতুর্বিংশতিতম সূত্রে করবেন। এই পথের দ্বিতীয় আবশ্যকতা মনের দৃঢ়তা। সাধককে শৌর্যপূর্বক কোমর বেঁধে সাধনাতে নিযুক্ত হওয়া উচিত। অল্প ক্লেশে যাতে পশ্চাদপদ না হয়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ অথবা মীরার ন্যায় দৃঢ়তাপূর্বক নিযুক্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। সাধক যাতে নিজের লক্ষ্য ভুলে না যান। সদৈব সচেতন থাকা অনিবার্য। খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা প্রত্যেক কাজে সুরত অর্থাৎ মনের দৃষ্টি যেন লক্ষ্যে স্থির থাকে। সুরত জিহ্বার

স্বাদ অথবা ইন্দ্রিয় সুখে যাতে লিপ্ত না হয়। ঈশ্বরের বার্তা, নির্দেশ যে বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে, তাকে প্রজ্ঞা বলে। প্রজ্ঞা পূর্বক ক্রমশঃ এই যোগ সফল হয়। শ্রদ্ধা, পরাক্রম এবং স্মৃতি যুক্ত সাধকদের স্তর কয়েকটাই রয়েছে।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ।।২১।।

যাঁরা কঠোরভাবে সাধনাতে নিযুক্ত তাঁরা যোগে শীঘ্র সফল হন। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাধনাতে উপস্থিত বিঘ্নগুলিকে দূর করে লক্ষ্যে স্থির সাধক চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ শীঘ্র করে নেন। সাধনাতে সাধক কতটা তৎপর, কারণ সেই অনুসারে প্রাপ্তিকাল এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে যায়।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ।। ২২।।

সাধনাতে কে কতটা সময় দেন, প্রাপ্তি সেই অনুসারে হয়। শিথিল প্রযত্নশীল বিলম্বে লাভ করেন। যিনি তৎপর তিনি শীঘ্র লাভ করেন। কারণ কারও মধ্যে সংস্কারের বেগ বেশী, সেইজন্য স্বাভাবিক যে তিনি শিথিল প্রযত্নশীল হবেন এবং যাঁর সংস্কার অল্প তিনি সাধনাতে তৎপর হবেন। কম বেশী তৎপরতার জন্যই লক্ষ্য প্রাপ্তি বিলম্বে অথবা শীঘ্র হয়।

ভগবান বুদ্ধ বোধ গয়াতে ভজনা করছিলেন। পাঁচজন ভিক্ষুও তাঁর সমীপে সাধনা করছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে অন্নগ্রহণ করতে দেখেছিলেন। তাঁরা বুদ্ধকে দেহাসক্ত ভেবে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে অন্যত্র তপস্যা করবেন এই ভেবে সারনাথ চলে গিয়েছিলেন। এদিকে বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি ঈশ্বরাদেশ পেয়েছিলেন যে, যাঁদের ভিতর কম আবিলতা তাঁদের কল্যাণ করুন। পাঁচজন ভিক্ষু যেখানে ছিলেন, তথাগত সোজা সেখানে পৌঁছেছিলেন।

ভিক্ষুগণ গৌতমবুদ্ধকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় করেছিলেন যে, এঁকে আমরা অভিবাদন করব না, স্বাগত জানিয়ে চরণযুগল ধুয়ে দেব না। কিন্তু তথাগত সমীপে পৌঁছান মাত্র সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তোয়ালে নিয়ে, কেউ জল নিয়ে, সেবাতে উপস্থিত হয়েছিল। অন্য আরেকজন বসার আসন দিয়েছিল, আর একজন চরণ প্রক্ষালন করেছিল। তথাগত আসনে বসেছিলেন ভিক্ষুগণ প্রশ্ন করছিলেন। বুদ্ধ উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন। উপদেশ চলাকালীন একজন স্থিতি লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় জন চোদ্দো দিন পর কৈবল্যপদ, লাভ করেছিলেন। তৃতীয়জন সেই উপদেশ অনুসারে চলে দু'মাস পর পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যদ্যপি তাঁরা সকলে সাধনাতে একই রকম পরিশ্রম করেছিলেন। তীব্র সংবেগযুক্ত সাধকদেরও প্রাপ্তিতে কালের ভেদ দেখা যায়। এখন অভ্যাস বিষয়ে শ্রবণ কর যে, কোন্টার অভ্যাস করবে?

মহর্ষি আরও বলছেন যে, বিরক্ত না হয়ে বৈরাগ্য এবং অভ্যাস, সাঙ্গোপাঙ্গ নিরন্তর করলে দৃঢ় স্থিতিযুক্ত হন। এর ফলে চিত্তের বৃত্তিগুলি শান্ত এবং নিরুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনি এটা বলছেন না যে, অভ্যাসকালে কোথায় চিত্তকে স্থির করতে হবে? আরম্ভ কোথা থেকে করবেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।। ২৩।।

অথবা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ-এর ভাব থাকলে সমাধি শীঘ্র সিদ্ধ অর্থাৎ সফল হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে সাধক দেখেননি? ঈশ্বরের স্বরূপ কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।। ২৪।।

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়—এই চারটির থেকে '**অপরাসৃষ্টঃ**'— যাঁর কোন সম্বন্ধ নেই সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত, পর অর্থাৎ অতীত, যিনি সকল পুরুষদের মধ্যে উত্তম, সেই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর, ঈশ্বরের পরিভাষা এটাই।

সংসার ক্লেশ, কর্ম, কর্মের সংগ্রহ এবং এর আশয় আবদ্ধ। এই সমস্তের অতীত (যেন কখনও কোন সম্বন্ধ ছিলই না, এতটা তফাতে) যিনি, তিনি ঈশ্বর। ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ—এগুলি জীবের দুঃখের কারণ; শুভ, অশুভ, মিশ্রিত এবং শুভাশুভরহিত কর্ম, এদের পরিণাম এবং সেই কর্ম-সংস্কারগুলির বাসনা থেকে যিনি বিরত, তিনি ঈশ্বর।

ঈশ্বরের বিশেষত্ব লক্ষ্য করুন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।। ২৫।।

সেই ঈশ্বর সর্বজ্ঞতার কারণ, তিনি অনন্ত সর্বজ্ঞতার সহজ স্রোত। এইপ্রকার অন্যান্য গুণেরও স্রোত। কারও সাহায্য ব্যতীত সকলের সম্বন্ধে জানেন, সবকিছু, দেখেন এবং বোঝেন। তাঁর কিছু জানতে বাকী নেই। সেই ঈশ্বর—

পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।। ২৬।।

সেই ঈশ্বর '**পূর্বেষাম্**'—পূর্বে যাঁরা প্রত্যাশী ছিলেন,সেই গুরুজনদেরও তিনি গুরু কারণ '**কালেনানবচ্ছেদাৎ**'-কাল এর সঙ্গে তার সম্বন্ধে অবচ্ছেদ নেই, তিনি অকালপুরুষ। এই সৃষ্টিতে অনন্তজন গুরু হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রবাহিত গুরুত্ব এটাই। কালাতীত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গীতাতে '**গুরুর্গরীয়ান্**'—গুরুরও পরমগুরু বলা হয়েছে।

সেই ঈশ্বরকে কিভাবে স্মরণ করবেন? তাঁর নাম কি?

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।। ২৭।।

সেই ঈশ্বরের বাচক নামক প্রণব, ওঁকার ওঁ।

গীতা শাস্ত্রের সপ্তদশ অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশতিতম শ্লোকে—'**ওঁ**', তৎ এবং

সৎ—এই তিনটি সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে নির্দেশ করে, স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ওম্ দ্বারা যজ্ঞ, বেদ এবং ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়েছে। '**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম**'—'**ওম্**' শুধু এটুকু অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক। সেই ঈশ্বরের নাম প্রণব; কারণ এর সঞ্চার প্রাণ দ্বারা হয়। প্রণব এবং ওম্ সমার্থক।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।। ২৮।।

ওম্ জপ এবং তার অর্থস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যান ঈশ্বর প্রণিধান।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, অভ্যাস দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিরক্ত না হয়ে নিরন্তর শ্রদ্ধাপূর্বক করা উচিৎ; কিন্তু এটা বলছেন না যে, কি অভ্যাস করা হবে? এখানে মহর্ষি স্পষ্ট করছেন যে, ওম্ জপ করুন এবং এর অর্থস্বরূপ সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করুন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা স্থির করুন। কিন্তু ঈশ্বরকে যে দেখেনি, সে কিরূপে চিন্তন করবে, শুরুতে ধ্যান শ্রদ্ধাপূর্বকই করতে হয় পরে ঈশ্বরই বোধ করিয়ে দেন যে সদ্গুরু কে। ধ্যান সদ্গুরুর করা হয়। সদ্গুরু অব্যক্ত ঈশ্বর স্বরূপ, মানব দেহধারী। (গীতা ৯।১১)—এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমি পরম-এর স্পর্শ করে পরমভাব-এ স্থিত; কিন্তু আমি মানব দেহধারী। এই স্বরূপই সদ্গুরু-এর। কে সদ্গুরু যখন তাঁকে দর্শন করবেন, তখন ধ্যান আরও স্পষ্ট হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে ঈশ্বরের নিবাস স্থান এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় :

'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।' (গীতা ১৮।৬১) অর্জুন! সেই ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। যদি এতই নিকটে তবে লোকে কেন দেখতে অসমর্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ''মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকলেই ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করছে, সেইজন্য দেখতে অসমর্থ। তাহলে কার স্মরণে যাওয়া উচিৎ? পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। (গীতা, ১৮।৬২)

অর্জুন! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের শরণাগত হও, সর্বতোভাবে যাও। একটুভাব কোন অন্য দেবতার প্রতি; একটু ভূত, ভবানী, যক্ষ, রাক্ষসাদির প্রতি, তবে তো আপনি শ্রদ্ধা ভাগ করে দিলেন। অতএব সর্বতোভাবে হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হও। সমাজে পরম্পরাগত রীতি নীতি প্রচলিত আছে। এগুলির বিরুদ্ধে যাওয়া কঠিন। ধরুন আমরা প্রথাগুলির বিরুদ্ধে গিয়ে একমাত্র ঈশ্বরের শরণাগত হলাম, তাতে লাভ? '**তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং**'—তাঁর কৃপাতে পরমশান্তি লাভ করবে এবং শাশ্বত, সনাতন স্থান লাভ করবে। সদৈব তুমি থাকবে, তোমার অস্তিত্ব থাকবে এবং নিবাস স্থানও শাশ্বত লাভ করবে। একেই অক্ষয়ধাম, কৈবল্য পদ বলে।

কিন্তু হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে দর্শন না করে, কিরূপে তাঁর শরণাগত হব? এর বিধি কি? পরবর্তী শ্লোকে বলছেন—অর্জুন! গুহ্য থেকেও গুহ্যতর আমার রহস্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।। (গীতা, ১৮।৬৫)

অর্জুন! আমাতে চিত্ত স্থির কর, আমাকে নমস্কার কর, আমার অনন্য ভক্ত হও। আমি সত্য বলছি, তুমি আমাতে নিবাস করবে।

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (গীতা, ১৮।৬৬)

অর্জুন! সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি সকল পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব, শোক করো না।

ভগবান পূর্বে দুটি শ্লোকে বলেছেন যে, ঈশ্বরের নিবাস স্থান হৃদয়। হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হও।

তার পরবর্তী দুটি শ্লোকে বলছেন, "না! সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও।" মন তো একটা। সর্বতোভাবে হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরে নিযুক্ত করা হবে অথবা সম্মুখে যিনি দণ্ডায়মান তাঁর শরণাগত হতে হবে?

হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে বর্তমানে ঈশ্বরভাব—এ ওতপ্রোত দেহধারী সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর এবং সদ্‌গুরু ছিলেন। অতএব সর্বতোভাবে সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, **'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌' (গীতা, ৯।১১)**। আমি পরম-এর স্পর্শ করে পরমভাব-এ স্থিত; কিন্তু মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করে রয়েছি। দেহ তো একটা আধার মাত্র। এইরূপ সদ্‌গুরু-এর স্বরূপ-এর ধ্যানের বিধি জানিয়ে ভগবান বলছেন—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।। (গীতা, ৮।১১)

প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষ যাঁকে অবিনাশী বলছেন, বীতরাগ মহাত্মা, পরম বৈরাগী যাতে প্রবেশের জন্য যত্নশীল, পরমপদ লাভ করবার জন্য ব্রহ্মচর্যের পালন করেন, সেই পরমপদ সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বলব—

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মুর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারনাম্।। (গীতা, ৮। ১২)

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে, বাসনা থেকে পৃথক অবস্থান করে মন হৃদয়ে স্থিত করে, অন্তঃকরণে যোগ ধারণ করে—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্ মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।। (গীতা, ৮।১৩)

'ওঁ' যা অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক এর জপ **'মামনুস্মরন্'**—আমার রূপ নিরন্তর স্মরণ করতে-করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, সেই পুরুষ পরমগতি লাভ করেন এখানে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়স্থ সেই জ্যোতির্ময় ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য ঈশ্বরেরই শরণাগত হওয়ার জন্য জোর দিয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন হয়নি তবে কিরূপে শরণাগত হব? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন আমার শরণে এস। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে তিনি সদ্গুরু অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ভাব-এ স্থিত সদ্গুরুর শরণে যাও। সদ্গুরু স্থিতি বিশেষ। এইরূপ স্থিতিপ্রাপ্ত সদ্গুরুর আশ্রয়, তাঁর চরণযুগলের ধ্যানই একমাত্র উপায়।

ভগবান বলেছেন—''অর্জুন!'' **'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্'**— চার বর্ণের রচনা আমি করেছি। তবে কি মানুষকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, ভগবান বলছেন—''না, **'গুণকর্মবিভাগশঃ।' (গীতা ৪।১৩)** গুণের আধারে কর্মকে চার ভাগে ভাগ করেছি। গুণ এখানে মানদণ্ড।'' গুণ তিনটি—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। তামসিক গুণ সক্রিয় হলে আলস্য, বিমূঢ়তা থাকবে, রাজসিক গুণ সক্রিয় হলে কামনার আধিক্য থাকবে, সাত্ত্বিক গুণ সক্রিয় হলে ধারণা ধ্যান সহজে হয়। এই গুণগুলির আধারে কর্মকে চার ভাগে ভগবান বিভক্ত করেছেন। যোগ-বিধিই হল যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান কর্ম। গীতা-এর অনুসারে কর্ম কেবল আরাধনা, চিন্তন, যোগ-এর নির্দিষ্ট বিধি বিশেষ। সেইজন্য একে নির্ধারিত কর্ম বলা হয়েছে। এই নির্ধারিত কর্মকে ভগবান চারভাগে বিভক্ত করেছেন—অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট। এই নির্ধারিত কর্মের কর্তা আমাকে তুমি অকর্তা বলেই জানবে! আপনি বলেছেন, আপনি দেহধারী, বিভাজন করেন, তবে আপনি কিরূপে অকর্তা? এই প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন—

ন মাং কর্মাণিলিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।। (গীতা, ৪।১৪)

অর্জুন! কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না; কারণ কর্ম ফলে আমার স্পৃহা নেই। এই কর্মের ফল ঈশ্বর লাভ। পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দর্শন, স্পর্শ এবং স্থিতি আমা হতে ভিন্ন নয়। আমি সেই অব্যক্ত স্বরূপ। কর্মফল আমার থেকে পৃথক নয়। **'ইতি মাং যোহভিজানাতি'**—এই স্তরের যিনি, তিনি আমাকে জানেন, তিনিও কর্মে আবদ্ধ হন না। শ্রীকৃষ্ণ যা-ই ছিলেন পুরুষোত্তম, পরব্রহ্ম, সেই স্থিতি সকলেই লাভ করতে পারেন।

এই আশয় মহর্ষি পতঞ্জলিও স্পষ্ট করেছেন যে ঈশ্বর-এর বাচক প্রণব, এর জপ এবং এর অর্থ-স্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তন করুন—যিনি সর্বজ্ঞ, গুরুর গুরু, সদ্‌গুরু। কিন্তু দেহের অন্তরালে কিছু-কিছু এমন বিঘ্ন রয়েছে যেগুলি জপ এবং ধ্যানে মনকে স্থির হতেই দেয় না। এই প্রসঙ্গে বলছেন -

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।। ২৯।।

উক্ত সাধন নাম (ওম্)-এর জপ এবং ঈশ্বর সদ্‌গুরুর ধ্যান করার অভ্যাস দ্বারা **'অন্তরায়াভাবঃ'**—অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নগুলি দূর হয় এবং অন্তরাত্মার স্বরূপের জ্ঞান হয়।

যে বিঘ্নগুলির অভাব হয় সেগুলি কি ? এই প্রসঙ্গে বলছেন

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ—
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহন্তরায়াঃ।। ৩০।।

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব এই ন'টা চিত্তের অন্তরায়, আন্তরিক বিঘ্ন। সঙ্গদোষ না থাকলেও সাধককে ভিতরে-ভিতরে অস্থির করে তোলে। যার ফলে সাধনাতে মন বসে না। এই বিঘ্নগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হল ব্যাধি অর্থাৎ রোগ দেহ অথবা কোন একটা ইন্দ্রিয়ে রোগ উৎপন্ন হওয়া, রোগের ফলে চিত্তে বিক্ষেপ উৎপন্ন হলে এবং চিন্তনে ছেদ পড়া ব্যাধি। দ্বিতীয় বিঘ্ন 'স্ত্যান' অর্থাৎ চিত্তের অকর্মণ্যতা। ইচ্ছা থাকলেও সাধনাতে প্রবৃত্ত না হওয়ার মনোভাবকে স্ত্যান বলে। যোগ-সাধনার ফল অথবা নিজেরই শক্তিতে সন্দেহ হওয়া 'সংশয়'। সাধনার অনুষ্ঠানকে অবহেলা, সাধনা ছেড়ে অন্য নিরর্থক বিষয়ে সময় নষ্ট করা 'প্রমাদ'। চিত্ত অথবা দেহ ভারী হওয়ার জন্য নাম-জপ অথবা ধ্যানে মন না বসা 'আলস্য'। অধিক পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ করলে অথবা পেট পরিষ্কার না হলেও আলস্যে বৃদ্ধি হয়। **'আলস্য নিদ্রা জমুহাঈ, তিনো কাল কে ভাই।'** আলস্য যাতে না ঘিরে ধরে সেইজন্য সাধুরা, পরিমিত আহার করেন, পরিমিত নিদ্রা যান। এবং সর্বদা সচেতন থাকেন। ভজনা করতে-করতে এইরূপ অবস্থাও হয় যে বাসনা প্রিয় বলে বোধ হয়। বৈরাগ্যে ছেদ পড়ে, এটাকেই 'অবিরতি' বলে। সাধনাতে প্রবৃত্ত থাকলেও যোগ-এর ভূমিকা (স্তর) গুলিতে স্থিতি লাভ না হওয়া 'অলব্ধভূমিকত্ব'। এর ফলে সাধকের উৎসাহ কমে যায়। যোগ-সাধনা দ্বারা কোন স্তরে চিত্তের স্থিতি হলেও সেখানে চিত্তের অস্থির হওয়াকে 'অনবস্থিতত্ব অন্তরায় বলে। ঈশ্বর প্রণিধান, ওঁ-এর জপ এবং ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান-চিন্তন দ্বারা এই অন্তরায় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। এই বিঘ্নগুলিকে আরও পাঁচটি বিঘ্ন খোরাক জোগায়।'

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ।। ৩১।।

দুঃখ, মনের ক্ষোভ, অঙ্গ কম্পন, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস এই পাঁচটি বিঘ্ন '**বিক্ষেপসহভুবঃ**'—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদাদি উপর্যুক্ত ন'টি বিক্ষেপের সঙ্গে উৎপন্ন হয়। দুঃখ তিন প্রকারের—দৈহিক, দৈবিক এবং ভৌতিক। দেহ-জন্য বিকারের জন্য চিন্তনে মন স্থির হয় না, এটা দৈহিক দুঃখ; যেমন—বায়ুর প্রকোপ, স্নায়ু রোগ ইত্যাদি। জল এবং বায়ু দ্বারা ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অত্যধিক গ্রীষ্ম, শীত ইত্যাদিকে দৈবিক দুঃখ বলে। জড়, চেতন, স্থাবর প্রাণীদের দ্বারা প্রাপ্ত আঘাতকে ভৌতিক দুঃখ বলে; যেমন—ভগবান মহাবীর ভজনাতে রত ছিলেন, সেই সময় এক রাখাল বালক কুশের শলাকা দ্বারা তাঁর কান বিদ্ধ করেছিল।

অনেক সাধক বলেন যে, 'অমুক ব্যক্তি অসৎ, আমাকে ঈর্ষা করেন।' আপনি ভজনা করতে এসেছেন না লোকের মনোভাব পরখ করতে এসেছেন। অমনোযোগীভাব, ক্ষুণ্ণভাব, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটলে ক্ষোভ ইত্যাদিকে 'দৌর্মনস্য' বলে। অঙ্গগুলিতে হঠাৎ কম্পনকে 'অঙ্গমেজয়ত্ত্ব' বলে। চিন্তনে মন নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মন অন্যান্য চিন্তা থেকে মুক্ত হয়, দেহে একটা চাপ অনুভব হয়। সাধক লাফিয়ে ওঠে। সম্মুখে, পশ্চাদ্‌ভাগে, ডাইনে-বায়ে পড়েও যেতে পারে। সেইজন্য পূজ্য মহারাজজী সতর্ক করে নির্দেশ দিতেন যে, সাধকের আসন বেশী উঁচু বা নীচু হওয়া ঠিক নয়। এই প্রকার শারীরিক কম্পনকে অঙ্গমেজয়ত্ব বলে। এবং কখনও-কখনও ব্যাধি ইত্যাদি অন্তরায়গুলির প্রভাবে যোগ-এর সাঙ্গোপাঙ্গ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না। যোগ-এর কোন অঙ্গের নিয়মে ত্রুটি দেখা দিলে মন ক্ষুণ্ণ হয়। হঠাৎ নিঃশ্বাস ত্যাগও যোগ-এর সহ বিক্ষেপ। সাধক যা কিছু অল্প-বিস্তর শিখেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা ব্যক্ত হওয়াকে প্রশ্বাস-সম্বন্ধীয় বিক্ষেপ বলে। অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা উপদেশ দান এই প্রকারই এক চেষ্টা। সেইপ্রকার শ্বাস-সম্বন্ধীয় বিক্ষেপ ক্লিষ্ট সংকল্প, বহির্জগতের সঙ্কল্পগুলি সাধকের অন্তরে প্রবেশ করে যার ফলে সাধক নিরর্থক চিন্তা করতে শুরু করে।

এই বিঘ্নগুলি বার-বার মনকে উদ্বেলিত করে। এগুলি দূর করার উপায়গুলির উপর মহর্ষি আলোকপাত করেছেন—

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।। ৩২।।

বিক্ষেপগুলি এবং উপ-বিক্ষেপগুলি দূর করার জন্য একতত্ত্বের অভ্যাস করা উচিত। নাম অথবা রূপের মধ্যে যে কোন একটা স্থানে বার-বার চিত্তকে স্থির করার চেষ্টা করা উচিত। ক্ষণিকের জন্য নাম, ক্ষণিকের জন্য রূপে এইপ্রকার না করে যাতে মন বেশী আনন্দ পায় তারই অভ্যাস বেশীক্ষণ করা উচিত। এইপ্রকার করলে বিঘ্নগুলি

দূর হয় এবং চিত্তবৃত্তি ভজনাতে প্রবৃত্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়। সাধক সংসারে থেকেই ভজনা করে। ভাল-মন্দ লোকের সঙ্কল্পে মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাদের সঙ্কল্পের যাতে কোন প্রভাব না পড়ে, সাধকের মন নির্লিপ্ত থাকে, তার উপায় বলছেন—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং
ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।।৩৩।।

সুখী, দুঃখী, পুণ্যাত্মা এবং পাপীদের বিষয়ে যথাক্রমে মিত্রতা, দয়া, প্রসন্নতা এবং উপেক্ষার ভাব দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়।

রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, মদ, মোহ, অসুয়া, অপকার, দ্বেষ ইত্যাদি চিত্তের আবিলতা। **'রাগু, রোগু ইরিষা মদু মোহূ। জনি সপনেহুঁ ইন্হকে বস হোহূ।। (রামচরিতমানস, ২।৭৪।৩)** বস্তুর প্রতি আসক্তি হল রাগ। অন্যের গুণের মধ্যেও দোষ দেখা অসূয়া। এই আবিলতাগুলি থেকে নিবৃত্তির জন্য প্রস্তুত সূত্রে মহর্ষি বলছেন যে, সুখী ব্যক্তিদের প্রতি মৈত্রীভাব রাখা উচিত। গীতা (৫,২১)তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংসারের বিষয়-ভোগ-এ অনাসক্ত পুরুষ অন্তরে যে সুখ বিদ্যমান সেই আন্তরিক সুখ লাভ করেন। সেই ব্যক্তি পরমব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত আত্মা, সেইজন্য তিনি অক্ষয়, সুখ অনুভব করেন—এই সুখ কখনও ক্ষয় হয় না। এই সুখ কে উপভোগ করতে পারে? যিনি সাংসারিক বিষয়-ভোগ-এ অনাসক্ত। এইরূপ সুখী ব্যক্তিদের প্রতি প্রীতিভাব রাখলে সাধনাতে সাহায্য পাওয়া যায়।

সকল আপ্ত পুরুষগণের অভিমত হল সুখের প্রকার একটাই। একমাত্র হরির প্রতি ভক্তি। রামচরিত মানসে উল্লিখিত আছে—

শ্রুতি পুরান সব গ্রন্থ কহাহীঁ। রঘুপতি ভগতি বিনা সুখ নাহীঁ।।
(মানস, ৭।১২১খ।৭)
হিম তে অনল প্রগট বরু হোঈ। বিমুখ রাম সুখ পাব না কোঈ।।
(মানস, ৭।১২১খ।১০)

অতএব এই সকল ঈশ্বর-পরায়ণ পুরুষদের প্রতি মৈত্রীভাব থাকলে চিত্ত-নিরোধ করার প্রচেষ্টাকালে সাহায্য পাওয়া যাবে। কারণ তাঁদের সান্নিধ্যে যা কিছু লাভ হবে তা সাধনা পরায়ণই হবে। এইপ্রকার সংসারে আবদ্ধ, আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুঃখী ব্যক্তিদের প্রতি দয়াভাব থাকা উচিত, ঘৃণার ভাব নয়। **'দয়া বিনু সন্ত কসাঈ। দয়া করী তো আফত আঈ।'** সীতা রাবণকে ভিক্ষা দিয়ে দয়া করেছিলেন, যার পরিণামস্বরূপ তাঁকে লঙ্কা যেতে হয়েছিল। একটা স্তরে উপনীত হওয়ার পূর্বে, সাধকের জন্য দয়ার বিধান নেই। তার জন্য সতত চিন্তনেই অনুরক্ত থাকার বিধান রয়েছে। দয়া সাধুর সহজ স্বভাব। দুঃখী ব্যক্তিদের প্রতি করুণাভাব সাধককেও রাখা উচিৎ; কিন্তু করুণাভাব

রাখা আর দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠাতে ফারাক আছে। এর জন্য ইষ্টের আদেশ অনুসারেই সংলগ্ন হওয়া উচিত। পুণ্যাত্মাদের প্রতি মনে প্রসন্নতার ভাব রাখা উচিত। গীতাশাস্ত্রে কর্মের নির্ধারিত বিধিকেই পুণ্যকর্ম বলা হয়েছে। এই নির্ধারিত কর্মের আচরণ করেন যাঁরা তাঁদের প্রতি প্রসন্নতার মনোভাব থাকা উচিত যে, এঁদের প্রতি ঈশ্বরের কত কৃপা, বিধি এটাই, এই সোপানগুলি আমাকে অতিক্রম করতে হবে; এই নয় যে, তাঁদের নকল করতে শুরু করে দিলাম অথবা তাঁদের দোষ ত্রুটি খুঁজতে শুরু করে দিলাম। পাপাত্মা অর্থাৎ যে পতনের পথে অগ্রসর এই প্রকার ব্যক্তিদের সংসর্গে থাকলেও তাদের গুণ-দোষ-এর প্রতি নির্লিপ্ত থাকা উচিত। **'উদাসীন নিত রহিঅ গোসাঈঁ। খল পরিহরিঅ স্বান কী নাঈঁ।।' (রামচরিতমানস, ৭।১০৫খ।৮)** তাকে ত্যাগ নয়, উদাসীন থাকা উচিত।

কোন মানুষ খারাপ নয়, তার পরিস্থিতির প্রভাবেই যা কিছু গণ্ডগোল হয়। আপনি তার কোন গুণ গ্রহণ করবেন না। এইরূপ ভাব থাকলে চিত্ত নির্মল হতে শুরু করে। চিত্ত বৃত্তিকে স্বচ্ছ করার অন্য উপায় সম্বন্ধে বলছেন—

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ।। ৩৪।।

অথবা প্রাণবায়ুকে বারবার ত্যাগ করা এবং রুদ্ধ করার অভ্যাস দ্বারাও চিত্ত স্থির হয়।

শ্বাস ত্যাগ করুন। যতক্ষণ সম্ভব গ্রহণ করবেন না। বারবার শ্বাস ত্যাগ করুন এবং রোধ করুন চার-ছ'বার এইরূপ করলে দূষিত বায়ু বেরিয়ে যাবে। এইরূপ অবস্থাতে চিন্তনে বসলে মন শীঘ্র একাগ্র হয়। চিন্তন, ভজন, নাম, রূপে মন বেশীক্ষণ স্থির হয়।

চিত্তকে স্থির করার একটা অন্য উপায় সম্বন্ধে মহর্ষি বলছেন—

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।। ৩৫।।

আমাদের যা বিষয়-বস্তু— যোগ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ, বাধাগুলি থেকে মুক্তি, ঈশ্বর প্রণিধান, নাম-রূপ-এর সতত চিন্তন-এই বিষয়গুলির উপর অনুরাগ, আচরণ করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠা। বিষয়ের অনুরূপ প্রবৃত্তি মনের স্থিতিকে সংযত করে।

চিন্তনের স্তর উন্নত হলে ঈশ্বরীয় সহযোগ পাওয়া যায়। তাও মনকে স্থির হতে সাহায্য করে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।। ৩৬।।

প্রকাশময়, জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা একমাত্র পরমাত্মা, সেই জ্যোতিস্বরূপ দ্রষ্টার দর্শন হলেও মনের তরঙ্গগুলি শান্ত হয়। ভগবান অনুকূল এইরূপ অনুভব করে সাধকের উৎসাহ বর্ধন হয়। এই দর্শন বিঘ্নগুলি দূর করে মনকে স্থির করতে সাহায্য করে—

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।।৩৭।।

বীতরাগ অর্থাৎ রাগমুক্ত মহাপুরুষদের আচরণ অন্তঃকরণে ধারণ করলে চিত্ত স্থির হয়। এইরূপ আপ্ত পুরুষগণের স্থিতি, তাঁদের আচরণ, তাঁদের প্রাপ্তির স্মরণ, চিন্তন-মনন দ্বারা, সেই অনুসারে আচরণ করলেও চিত্ত স্থির হয়, বিঘ্ন দূর হয়। একটা উপায় হল স্বপ্ন—

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা।। ৩৮।।

নিদ্রাকালে স্বপ্নের জ্ঞান যে চিত্ত অবলম্বন করে, তাও স্থির হয়। পূজ্য মহারাজজী বলতেন—যোগী স্বপ্ন দেখে না। সে যা কিছু দেখে তা অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্যত দেখে। সে স্বপ্নেও সাধনার অবস্থা, ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তির বিকাশ কিরূপ—তা দেখে। নিদ্রাকালে যে দৃশ্য দেখে তা ভগবান দ্বারা প্রসারিত। সদ্‌গুরুর পাঠানো নির্দেশ। সেই অনুসারে যে আচরণ করে তার চিত্ত স্থিরতার দিকে অগ্রসর হয়।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা।। ৩৯।।

অভিমত এটাই ঈশ্বরের শরণাগতি। ওঁ-জপ দ্বারা অন্তরায়গুলি দূর হয়। চিত্তবৃত্তির শান্ত প্রবাহিত হওয়া, সমাধির জাগৃতি, চিত্ত একাগ্র হওয়া—এগুলির মধ্যে একটাও যদি কারও কৃপাতে পুষ্ট হয়, তা ধ্যানকালে স্মরণ করা মাত্র চিত্তবৃত্তি স্বচ্ছ হয়ে যায়। পরিবেশ সাধনার অনুরূপ করে নিলে, আশয় পরিবর্তন করে সাধনার অনুকূল করে নেওয়াকে যথাভিমত ধ্যান বলে।

একবার অর্জুন চিন্তনে বসেছিলেন। হঠাৎ কর্ণ কুহরে সঙ্গীত-লহরী ঝঙ্কৃত হয়েছিল। তিনি মস্তক তুলে দেখেছিলেন দেবলোকের অপ্সরা, নৃত্যাঙ্গনা উর্বশী সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সকলেই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অর্জুন তাকে শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানে মাতৃবৎ দেখেছিলেন। শব্দ-রূপ দ্বারা যে বিকার উৎপন্ন তার স্থানে আশয় পরিবর্তন করে সাধনানুকূল মাতৃবৎ ধ্যান করেছিলেন।

পূজ্য মহারাজজীর সংরক্ষণে সাধনারত একজন মহাত্মা নিরাধার বিচরণ করার অনুমতি চাইছিলেন। তাঁকে বার-বার আগ্রহ করতে দেখে মহারাজজী অন্যমনস্কভাবে অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই মহাত্মা আশ্রম থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়েছিলেন, তিনি দেখেছিলেন যে ছোট-ছোট বালকেরা পায়ের মাঝে পাতলা লাঠি ফেলে সেটার ডাইনে বাঁয়ে লাফাচ্ছে। এই খেলাকে স্থানীয় ভাষাতে ঘোড়ার খেলা বলে। হঠাৎ একটা বালক এক পা তুলে লাফাতে-লাফাতে বলতে শুরু করেছিল—‘**লঙ্গড়া চীঁটা চলা রিসায়। নৌ দিন মে বীতা ভর জায়।। অস্সী কোস জমুনা কা তীর। কৈ দিন মে পহুঁচা ওয়হ্ বীর।।**’ এটুকু শোনা মাত্র সেই মহাত্মা খারাপ সঙ্কেত পেতে শুরু করেছিলেন। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ছোটরা খেলাচ্ছলে তো কিছু না কিছু বলেই থাকে। তবে কেন খারাপ সঙ্কেত পাচ্ছি। তবে কি সে আমাকে

বলছে? ভগবান তার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন—হ্যাঁ, তোমার অবস্থাও এখন সেইরকমই, তোমার বৈরাগ্য এখন খোঁড়া। যোগরূপী যমুনা এখনও দূরে। তোমার গতি এক ইঞ্চির মত প্রতিদিন। এখন তোমার ক্ষমতা হবে না। একথা শুনে তিনি ফিরে এসেছিলেন।

মহারাজজী বলতেন ''হো! ভগবান যখন কৃপা করেন তখন যে কোন মাধ্যম দ্বারা প্রেরণা প্রদান করেন, গাছপালা, পশু-পাখি, মানুষ। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, সেইজন্য যে-কোন স্থান থেকে নির্দেশ দিতে পারেন।" এই প্রকার সাধনাতে যা সহায়ক তা ধ্যানে উপযোগী আশয়ে পরিবর্তিত করে ধ্যান করতে থাকো। এইরূপ করলে চিত্ত স্বচ্ছ, নির্মল এবং স্থির হতে থাকে।

ভগবান দত্তাত্রেয় চব্বিশটি উদাহরণ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। অজগরের ভিতরও তিনি সাধনার উপযোগী একটা গুণ দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, বিপুলকায় অজগরের মুখের সমীপে কোন না কোন জীব-জন্তু চলেই যেত, যাকে সে উদরস্থ করত। ভগবান দত্তাত্রেয় তার কাছে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, সাধুকে উদরপূর্তির জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করা উচিত নয়। অজগরটি গুরু ছিল না। কিন্তু ভগবান দত্তাত্রেয় তার মধ্যেও সদ্‌গুরুর বিদ্যা উদ্দীপ্তকারী একটা গুণ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তা গ্রহণ করেছিলেন।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোহস্য বশীকারঃ।। ৪০।।

এই প্রকার ধ্যান করতে-করতে যোগীর মন পরমাণু থেকে শুরু করে পরম মহত্ত্বের বিষয়ে একাগ্র হওয়ার ক্ষমতা লাভ করে। সেই সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণু থেকে শুরু করে বড়-বড় যে কোন বস্তুতে একবার মন স্থির হলেই চিত্ত সেখানেই স্থির থাকবে। এটা যোগীর বিজিত চিত্তের বিশেষত্ব। অভ্যাস করতে-করতে যখন সাধকের চিত্ত উত্তম-রূপে স্থিতিলাভের যোগ্যতা অর্জন করে, সেই সময় তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ থেকে শুরু করে মহত্ত্বপূর্ণ যে কোন বিষয়-বস্তুতে যেখানে চাইবেন সেখানেই চিত্তকে স্থির করতে সমর্থ হবেন।

গীতাশাস্ত্রে ভগবান বলেছেন—**'যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতঃ।' (৬।১৯)**

বায়ুশূণ্য স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না শিখা ঊর্ধ্বমুখী হয়, এটাই চিত্তজয়ী যোগীর উদাহরণ। তার চিত্তে ভাল-মন্দ কোনরূপ উদ্বেগ উৎপন্ন হয় না। হৃদয়ে কোন উদ্বেগ উৎপন্ন হবে না, আবার বহির্জগতের কোন সঙ্কল্প অন্তরকে স্পর্শ করবে না—এটা যোগীর বিজিত চিত্তের পরিভাষা। এইরূপ চিত্তে সাধনার স্বরূপ কি?

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু
তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।।৪১।।

যাঁর ক্লিষ্ট, অক্লিষ্ট সকল বৃত্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে, তার চিত্ত গ্রহীতা অর্থাৎ সাধক পুরুষ গ্রহণ অর্থাৎ অন্তঃকরণের দৃষ্টি সুরত এবং গ্রাহ্য ঈশ্বর এবং তাঁর নাম ইত্যাদিতে সেই প্রকার তদাকার (তদ্রূপ) হয়ে যায় যেরূপ উন্নতমানের বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি যে বস্তুর নিকটে থাকে সেটারই রং ধারণ করে। গ্রহীতা, গ্রহণ এবং গ্রাহ্যর, মানে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এই অবস্থাতে উপনীত হলে সাধকের নিজের এবং নিজের স্থিতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট জ্ঞান থাকে আমি কোথায়? কিরূপে আছি। এখন সমাধির পরবর্তী সোপানের উপর আলোকপাত করছেন—

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।।৪২।।

'সমাপত্তিঃ' অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যেও শব্দ, অর্থ, এবং জ্ঞান এই তিনটির বিকল্প থেকে সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত চিত্তের সমাধান হল সবিতর্ক সমাধি।

সংসারে বিভিন্ন ধরণের বাক্য আমরা শুনেই থাকি, তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করি, বস্তুর জ্ঞানও সংগ্রহ করি; কিন্তু এর ফলে কারও সমাধি হয়, এরূপ দেখা যায় না। বস্তুতঃ দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগ দ্বারা ভগবান যা প্রেরণা দেন, তারই নাম শব্দ, সন্ত কবীর বলেছেন—

শব্দৈ মারা গির পড়া, শব্দ ছুড়ায়া রাজ।
জিন জিন শব্দ বিবেকিয়া, তিন্‌হ কে সর গয়ো কাজ।।

এই শব্দের উপলব্ধি হলে, সাধক আত্মসমর্পণ করেন, সমর্পিত হন। আমি জ্ঞানী, আমি ধ্যানী—এইরূপ অহংকার দূর হয়। শব্দের শক্তি এতই যে, কেউ-কেউ রাজ্য-সুখ তৃণবৎ ত্যাগ করে পৃথক্ অবস্থান করেন এবং যাঁরা শব্দের অর্থ বুঝে বিবেকের প্রয়োগ করেন **'তিহ্নকে সর গয়ো কাজ'**— তাঁদের কার্য সিদ্ধি হয়। ভবসাগর পার হন।

'শব্দ বিনা শ্রুতি আঁধরী' কেউ চিন্তনে মনকে নিযুক্ত করে, মনের দৃষ্টি স্বরূপে স্থির করে কিন্তু এর সঙ্গে নিরীক্ষক-পরীক্ষক রূপে শব্দ উপলব্ধ হয় না, ভগবান যদি নির্ণয় না দেন তবে মনের দৃষ্টি (সুরত) ও অন্ধ।'

শব্দ বিনা শ্রুতি আঁধরী কহো কহাঁ লোঁ জায়।
দ্বার ন পায়ে শব্দ কা, ফির-ফির ভটকা খায়।।

যদি শব্দের স্রোত লাভ হয়নি তবে মনের দৃষ্টি (সুরত) স্থির করলে এবং যোগ অভ্যাস করে কোন লাভ নেই। না জানি কোন পরিস্থিতিতে নিয়ে গিয়ে ফেলে। এই শব্দ হল ভগবানের। দ্রষ্টা স্বয়ং যে দৃশ্য প্রসারিত করেন, তার প্রয়োজন পুরুষের জন্য

সাধনোপযোগী ভোগ এবং মোক্ষ প্রদান করা। সেই দ্রষ্টা যে-যে দৃশ্য প্রস্তুত করেন, তার নাম হল শব্দ। শান্ত প্রবাহিত চিত্তে কিরূপ শব্দ দেখতে শুনতে পাওয়া গেল তার অর্থ এবং তার উপলব্ধি—এই তিনটির বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত) চিত্তের সমাধি হল সবিতর্ক। এখানে পরমাত্মা তো নেই, শুধু সম্প্রজ্ঞাত সমাধি রয়েছে; কিন্তু পরমাত্মার বিকল্প অত্যন্ত তীব্র। কবীর বলেছেন—**'শব্দ সো প্রীতি করে সো পাবে।'** এর অপেক্ষা উন্নত সমাধির অবস্থা নির্বিতর্ক, এর উপর আলোকপাত করেছেন—

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।। ৪৩।।

যখন চিত্তের নিজ স্বরূপ শূন্য হয়, শুধু লক্ষ্যের আভাস থাকে, সেইসময় **'স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ'** স্মৃতি উত্তমরূপে শুদ্ধ হয়, এটাকে নির্বিতর্ক সমাধি বলে। শব্দ, অর্থ, জ্ঞান কিছু থাকে না, চিত্তের স্বরূপ শূন্য হয়ে যায়, এই অবস্থাতে কে শব্দ শুনবে এবং কার জ্ঞান থাকবে, লক্ষ্যের আভাস মাত্র হয় সেই সময় স্মৃতি বিশেষরূপে শুদ্ধ থাকে। এই অবস্থা নির্বিতর্ক সমাধির; কারণ স্মৃতি এবং সংস্কারের একই স্বরূপ হয়। এই অবস্থাতে স্মৃতিপটে কোন সংস্কার অঙ্কুরিত হবে না। কৈবল্যপাদের নবম সূত্রে মহর্ষি বলছেন যে জাতি অর্থাৎ জন্ম-পরিবর্তন, দেশ এবং কালের দীর্ঘ অন্তরালেও সংস্কারগুলিতে পরিবর্তন অথবা বিরাম হয় না। সেগুলি ঠিক সময়ে প্রকট হয়, কিন্তু এখানে সেই সংস্কার নির্মূল হয়ে যায় তা সত্ত্বেও সংস্কারগুলির বীজ এখনও বর্তমান; কারণ চিত্ত এখনও জীবিত। এর থেকেও উন্নত অবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন—

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।। ৪৪।।

'এতযা এব'-এর দ্বারাই (পূর্বোক্ত সবিতর্ক এবং নির্বিতর্ক এর বর্ণনা দ্বারা) সবিচার এবং নির্বিচার সমাধির এবং **'সূক্ষ্মবিষয়া'**—সাধনার সূক্ষ্ম অবস্থারও বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন দেখুন এই সমাধিগুলির পরিণাম—

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গ পর্যবসানম্।। ৪৫।।

সাধনার এই অতি সূক্ষ্ম অবস্থাগুলিতে— **অলিঙ্গ পর্যবসানম্**—প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম স্তরগুলি, মূল প্রকৃতি পর্যন্ত উত্তমরূপে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এই অবস্থা লাভ হলে প্রকৃতিও আর তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।। ৪৬।।

উপর্যুক্ত সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার সমাধিগুলি নির্বিকল্প হলেও নির্বীজ নয়। চিত্তের বীজ বিদ্যমান সেইজন্য এই সবই সবীজ সমাধি। এই চার প্রকারের সমাধির মধ্যেও নির্বিচার সমাধি নির্মল হলে—

নির্বিচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ।। ৪৭।।

নির্বিচার সমাধি অত্যন্ত নির্মল হলে যোগীর মধ্যে '**অধ্যাত্মপ্রসাদঃ**'—আত্মিক বিভূতিগুলি উত্তমরূপে প্রবাহিত হয়। সনাতন পুরুষ অজন্মা, শাশ্বত যে-যে বিভূতিগুলি দ্বারা যুক্ত, সেই সমস্ত বিভূতি যোগী লাভ করেন। আত্মার আধিপত্য স্থাপিত হয়। আত্মিক বিভূতিগুলির সমস্ত প্রসাদ যোগী লাভ করেন। এই অবস্থাতে কোন বিভূতি থেকে দূরে থাকেন না। সেই সময় যোগীর বুদ্ধি ঋতম্ভরা তুল্য হয়।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ।। ৪৮।।

সেইসময় যোগীর প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ঋতম্ভরা অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই অবস্থা লাভ হলে পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে ধারণ করার ক্ষমতা লাভ করে। যখন আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভ হয় তারপর শুধু পরম চেতনাকে লাভ করা বাকী থাকে। এইরূপ বুদ্ধির স্থিতি সাধারণ বুদ্ধি থেকে পৃথক্ হয়। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

'শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ'।। ৪৯।।

শ্রুত অর্থাৎ শোনা হয়েছে এমন এবং অনুমান অর্থাৎ যুক্তি বলে জ্ঞাত বস্তু থেকে অজ্ঞাত বস্তু—সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে গমন করে যে বুদ্ধি তা অপেক্ষা এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অবস্থা পৃথক্। যার জ্ঞান শ্রুত এবং অনুমান দ্বারা হয় না এর জ্ঞান এই প্রজ্ঞা দ্বারা হয়; কারণ এটা বিশেষ অর্থযুক্ত। বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর, সেই অর্থযুক্ত, তা গ্রহণ করার ক্ষমতাযুক্ত সেইজন্য শ্রবণ এবং অনুমান দ্বারা যে বুদ্ধি পরিপক্ক হয় তা অপেক্ষা এই বুদ্ধি অত্যন্ত পরিমার্জিত। এই বুদ্ধির বিষয় পৃথক্ ; কারণ এই বুদ্ধি শুধু প্রকৃতির অতীত আত্মা (দ্রষ্টা) কে ধারণ করার ক্ষমতাযুক্ত।

'শ্রুত'—শুধু শ্রবণ করে গেলে কোন বুদ্ধি পরিপক্ক হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ে কোন ধ্বনি যাওয়া মাত্র স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি প্রত্যেকটির অভ্যাস এবং অন্যান্য জন্মের সংস্কার স্মৃতিপটে জাগার সঙ্গে-সঙ্গে অনুমানের সূত্রপাত হয়, বস্তুর জ্ঞান হয়; কিন্তু এই প্রজ্ঞা বিশেষ অর্থযুক্ত।

শ্রুতি অথবা সুরত মনের দৃষ্টিকে বলে। যা ভাল মন্দ সব বিষয় গ্রহণ করে। সুরতিতে স্ফুরণ হওয়া মাত্র অনুমান শুরু হয়; কিন্তু এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার স্তর এর থেকে উন্নত। যা '**পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ**' কে ধারণ করার ক্ষমতাযুক্ত। এর মহত্ত্বের উপর পুনরায় আলোকপাত করছেন—

তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।। ৫০।।

এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার অন্য সমস্ত সংস্কারের প্রতিবন্ধক, সেই সব নিরুদ্ধ করে। এরপর প্রকৃতি বাধকের কাজ করে না। এই অবস্থাতে কোন সংস্কার প্রাপ্তিতে বাধক হয় না।

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ।। ৫১।।

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারও যখন শান্ত হয়ে যায়, সেই সময় সর্ব নিরোধ এর সঙ্গে নির্বীজ সমাধি হয়। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রভাবে যখন অন্য সমস্ত সংস্কারের অভাব হয়, এর থেকে উৎপন্ন সংস্কার ঈশ্বরকে ধারণ করার ক্ষমতাযুক্ত হয়, তা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করার পর লুপ্ত হয়—এইপ্রকার সংস্কারের বীজের সর্বথা অভাব হলে এই অবস্থার নাম নির্বীজ সমাধি। একেই কৈবল্যপদ, কৈবল্য সমাধিও বলা হয়।

নিষ্কর্ষ—

যোগদর্শনকার মহর্ষি পতঞ্জলি এর চারটি পাদের মধ্যে প্রথম পাদ সমাধিপাদ-এ যোগ নিরুপণের ক্রমে বলেছেন যে, যোগ একপ্রকার অনুশাসন। অনুশাসন কাকে করবেন? তিনি বলেছেন—'চিত্তের বৃত্তিগুলিকে।' বৃত্তিগুলিকে অনুশাসিত করে নিলে কি লাভ? মহর্ষি বলেছেন, ''সেই সময় দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হন।'' এর আগে কি দ্রষ্টা স্থিত ছিলেন না? দ্রষ্টা কি মলিন ছিলেন? মহর্ষি বলছেন, ''এর পূর্বে যেরূপ বৃত্তিগুলির প্রবাহ ছিল, সেটাই দ্রষ্টার রূপ ছিল।''

বৃত্তির সংখ্যা অনেক। সমস্ত বৃত্তির প্রকার দুটি। ক্লিষ্ট অথবা অক্লিষ্ট। কিছু বৃত্তি ক্লেশ প্রদান করে কিছু বৃত্তি ক্লেশ থেকে মুক্ত করে। এই বৃত্তিগুলিকে পাঁচ প্রকারে বিভাজিত করা হয়েছে—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। প্রমাণ বৃত্তিগুলিকে সঞ্চালিত করে, প্রমাণের তিনটি পার্থক্য (ভেদ)—প্রত্যক্ষ, আপ্তপুরুষগণের দর্শন এবং অনুমান। ইন্দ্রিয়গুলি যা কিছুর সংস্পর্শে আসে, অমনি অনুমান শুরু হয় এবং বৃত্তি সক্রিয় হয়। যদি প্রমাণ অবিদ্যাজন্য পাওয়া যায় তবে এই বৃত্তি ক্লিষ্ট হয়ে যায়। আপ্তপুরুষগণের দর্শন এবং তাঁদের বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ হলে বৃত্তি অক্লিষ্ট হয়ে যায়। প্রমাণ বৃত্তিগুলিকে শুধু সঞ্চালিত করে। প্রমাণ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বৃত্তি, গতিশীল হয়ে যায়। বিপর্যয়কে মিথ্যাজ্ঞান বলে, এটা অবিদ্যাজন্য, সেই কারণে এই অবস্থাতে মিথ্যা জ্ঞানকেই জড়তাবশতঃ জ্ঞান বলে মনে করা হয়। শব্দের সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাকে বিকল্প বলে। এখানে বস্তু তো শূন্য কিন্তু বস্তুর বিকল্প পুষ্ট হতে থাকে। এটা অনুভব দ্বারা সঞ্চালিত। এর নাম দৈবী সম্পদও। কিন্তু প্রমাণ বিপরীত লাভ হলে এই বৃত্তি ক্লিষ্ট হতে পারে। যদি প্রমাণ ইষ্টোন্মুখী লাভ হয় তবে বিপর্যয় বৃত্তিও অক্লিষ্ট স্বভাবের হয়ে যাবে। বৃত্তির চতুর্থ অবস্থা হল নিদ্রা—যা মিথ্যাজ্ঞানের জড়তা দ্বারাও আবদ্ধ নয়। আবার অনুভব দ্বারাও সঞ্চালিত নয়। অভাবকে অবলম্বন করে এই বৃত্তি যা হল নিদ্রা, যা সজাতীয় সংস্কারেরও সৃজন করে না আবার বিজাতীয় সংস্কারেরও সৃজন করে না। কখনও এদিক আবার কখনও ওদিক, ভাল-মন্দ বলে

কোন বোধই নেই। পঞ্চম প্রকার হল স্মৃতি। সমস্ত বৃত্তি স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে। সময় হলে প্রকট হয়। স্মৃতিও সেইসময় শুদ্ধ হয়ে যায়, যখন চিত্তের নিজ স্বরূপ শুদ্ধ হয়ে যায়। **'স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে।'** যখন শুধু লক্ষ্যের আভাস পাওয়া যায়, সমাধির সেই অবস্থাতে বৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যায়। অনন্ত বৃত্তিগুলি এই পাঁচটি রূপে হ্রাস—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করতে থাকে।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ সম্ভব। কি অভ্যাস করা হবে? 'ক্লেশকর্ম বিপাকাশ যৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।' অভ্যাসের আশ্রয় হল ঈশ্বর। তাঁর নাম হল প্রণব। ওঁ জপ করুন এবং ঈশ্বরের ধ্যান করুন। এর ফলে অন্তরায় (বিঘ্ন) শান্ত হয়ে যাবে। নাম এবং রূপ-এর অতিরিক্ত যা লাভের ইচ্ছুক—যোগ, চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ—যে সাধনা এই যোগে অবরোধ উৎপন্ন করে না, সাধনার সহায়ক তা অনুশীলনও করা যেতে পারে। এই প্রকার চার-পাঁচটি সহায়ক সাধনার চর্চা মহর্ষি করেছেন; যেমন—স্বপ্নাদেশ অথবা দৃশ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ, জ্যোতির্ময় পরমাত্মাতে ধ্যান কেন্দ্রিত করা, আপ্তপুরুষগণের সান্নিধ্যে থাকা ইত্যাদি। এই অভ্যাস দ্বারা চিত্ত স্ফটিক মণির সমান নির্মল, পারদর্শী হয়ে যায়। প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা হয়ে যায়, বিশেষ পুরুষ ঈশ্বরকে ধারণ করতে সমর্থ হয়। অমৃতপদের বোধ করিয়ে তার প্রাপ্তি এবং তাতে স্থিতি প্রদান করে প্রজ্ঞাজন্য সংস্কারও শান্ত হয়ে যায়। এটাই কৈবল্য, অমৃতপদ যেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নেই; শাশ্বত সুখ, শাশ্বত শান্তি এবং শাশ্বত জীবন শুধু বাকী থাকে। এখানেই প্রথমপাদ 'সমাধিপাদ' পূর্ণ হয়েছে।

।। ওঁ।।

ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাধনপাদ

প্রথম অধ্যায়ে যোগদর্শনকার মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা সাধনা শুরু হয়। ধৈর্যপূর্বক এগুলির সতত অনুশীলন দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যায়। কি অনুশীলন করা হবে তিনি স্পষ্ট বলেছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন, যা ক্লেশ এবং কর্মগুলির অতীত। ঈশ্বর গুরুরও গুরু। ঈশ্বরের মধ্যে সর্বজ্ঞতার সহজ বীজ বিদ্যমান যার নাম হল প্রণব। ওঁ জপ করুন, ঈশ্বরের চিন্তন করুন। এর ফলে যোগ পথের বিঘ্নগুলি দূর হবে, আপনি সমাধিলাভের পথে এগিয়ে যাবেন। তিনি সমাধির সহযোগী সাধনগুলির উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নাদেশ পালন, আপ্তপুরুষগণের স্থিতি এবং তাঁদের দর্শন করে তাঁদের কৃপা লাভ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যোগের অনুষ্ঠান, যা আপনার ঈপ্সিত তার অনুকূল আশয় পরিবর্তন করে নেওয়ার সম্মতি দিয়েছেন; তা সত্ত্বেও ধ্যান হয় না, নিরন্তর অভ্যাস করা সম্ভব হয় না, নাম রূপে চিত্ত স্থির হয় না। অতএব এই দ্বিতীয় অধ্যায় সাধন পাদে সম্পূর্ণ সাধন-বিধি প্রস্তুত করেছেন যাতে যোগের আটটি অঙ্গের বর্ণনা জনসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মহর্ষি শুরুতেই বলছেন যে, সাধনা কোথা থেকে আরম্ভ হয়?—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।। ১।।

তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান (শরণাগতি) দ্বারা যোগ ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি এক ঈশ্বরের স্বরূপ, এক ঈশ্বরের শরণ এবং তাঁর নাম জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন এখন প্রস্তুত অধ্যায়ে বলছেন যে, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে ইষ্টের অনুরূপ পরিবর্তিত করাকে তপস্যা বলে। নিজের মনকে অধ্যয়ন করাকে স্বাধ্যায় বলে যে, মন কতটা নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং মনকে কতটা নিযুক্ত করতে পেরেছি, নিজেকে কতটা আপ্তপুরুষগণের বাণীর অনুরূপ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি, এখনও কত ত্রুটি আছে? —এইপ্রকার নিজের অধ্যয়ন করে সাধনাতে অগ্রসর হওয়াকে স্বাধ্যায় বলে। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি মন, কর্ম, বচন অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সমর্পণ। এটুকু করতে সক্ষম হলেই যোগক্রিয়া জাগ্রত হয়। এই ক্রিয়াযোগের কি প্রয়োজন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।। ২।।

এই ক্রিয়াগুলির অভ্যাস করলে সমাধির প্রতি শ্রদ্ধা-ভাব দৃঢ় হয় এবং ক্লেশ ক্ষীণ হয়ে বলহীন হয়ে যায়।

কোন্ কোন্ ক্লেশ ক্ষীণ হয়?—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।। ৩।।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ। এই পাঁচটি ক্লেশ জীবমাত্রকে সংসার চক্রে আবর্তন করাতে থাকে, যা মহাদুঃখদায়ক। জন্ম-মৃত্যুর কারণ এটাই। কিন্তু এগুলির মধ্যেও প্রধান হল অবিদ্যা—

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।। ৪।।

অবিদ্যা পরবর্তী চারটি ক্লেশ অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, এবং অভিনিবেশ-এর উৎপাদক ক্ষেত্র। এই ক্লেশ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার—এই প্রকার চারটি অবস্থাতে থাকে। অস্মিতাদি সকল ক্লেশের কারণ অবিদ্যা। এই চারটি অবিদ্যা দ্বারাই জাগ্রত হয়। এই চারটির নাশ হলেও, অবিদ্যার নাশ হয় না। সন্ত কবীরের ভজনাতেও এই বিষয়ে বলা হয়েছে—

'পাঁচ সখী পাঁচোঁ গুনবন্তী, পাঁচ মে সরবস একৈ জনী।
বলম সঙ্গ সোই গয়ীঁ পাঁচোঁ জনী।।' (কবীর)

ক্লেশ নিজের কাজ করছে না এর অর্থ এই নয় যে, ক্লেশ নেই, আছে কিন্তু প্রসুপ্ত অবস্থাতে আছে। ক্রিয়াশীল নেই। উদ্দীপক বস্তুর সংস্পর্শে সেগুলি ক্রিয়াশীল হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দেবর্ষি নারদ হিমালয়ের গুহাতে তপস্যারত হয়েছিলেন। হরির স্মরণ মাত্রে একস্থানে দু'দণ্ডের বেশী তিষ্ঠতে অক্ষম দক্ষের অভিশাপের গতি নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। তপস্যার ফলে ইন্দ্র বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরাদের পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু **'কাম কলা কছু মুনিহি ন ব্যাপী।' (রামচরিত মানস ১।১২৫।৪)** —দেবর্ষির উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি। কামদেব উপাধিও প্রদান করেছিলেন যে, 'আপনি জিতেন্দ্রিয়, মন নিগ্রাহক।' এমন নয় যে, তিনি কাম জয় করেছিলেন। সেই বিকারটি প্রসুপ্ত ছিল। শীলনিধি রাজার সুন্দর নগর, সুন্দর নর-নারী এবং সুন্দরী রাজকন্যা এবং তার হস্তরেখা দেখার সঙ্গে-সঙ্গে প্রসুপ্ত বিকার জেগে উঠেছিল। বিকারটি ছিল, কোথাও যায়নি, প্রসুপ্ত অবস্থাতে ছিল।

এই প্রকার ক্লেশ কখনও প্রসুপ্ত থাকে, কখনও যোগ-সাধনার ফলস্বরূপ এর প্রভাব ক্ষীণ (তনু) হয়ে যায়। যোগ-সাধনা দ্বারা শনৈঃ-শনৈঃ এর প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে, সেই অবস্থাতে হীনবল ক্লেশকে 'তনু' বলা হয়। বিষয়ী লোকের উপর এই ক্লেশগুলির যত প্রভাব পড়ে,তত প্রভাব বিস্তার সাধকদের উপর করতে পারে না।

ক্লেশগুলির বিচ্ছিন্ন অবস্থা তখন হয় যখন অন্য ক্লেশ ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন কেউ রাগ দ্বারা আপ্লাবিত সেই অবস্থাতে তার মধ্যে দ্বেষ দেখা যায় না, কারণ সেটা বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। কোথাও যায়নি, কিন্তু সেই সময় এমন মনে হয় যে, অন্য কোন ক্লেশ যেন তার মধ্যে নেই ই।

যে সময় কোন ক্লেশ পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল থাকে তখন সেটা সেই ক্লেশের উদার অবস্থা। যা ভোগ সম্পূর্ণ হলে শান্ত হয়ে যাবে, এটাই সেই ক্লেশের উদারতা।

এই সমস্ত ক্লেশের মূল কারণ যে অবিদ্যাকে এই সূত্রে বলা হয়েছে, তার স্বরূপ কি?

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।। ৫।।

অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখ এবং অনাত্মাতে ক্রমশঃ নিত্য, পবিত্র, সুখ এবং আত্মভাব—এর বোধ, ধারণা অবিদ্যা।

'**সত্য বস্তু হ্যায় আত্মা, মিথ্যা জগত পসার**'—সত্য অর্থাৎ নিত্য একরস দ্রষ্টা পুরুষ। সংসারে দেহ এবং দেহগুলির পরস্পর সম্বন্ধ অনিত্য। এই অনিত্য সংসারকে নিত্য বলে ভাবা অবিদ্যা।

এই প্রকার যা অপবিত্র, অন্ততঃ দুঃখের কারণ তাকে পবিত্র মনে করা, তাতেই সুখ অনুভব করা অবিদ্যা, সন্ত কবীরের দোহা ছন্দে বর্ণনা আছে—

ঝুঠে সুখ কো সুখ কহে, মানত হ্যায় মন মোদ।
জগত চবৈনা কাল কা, কুছ মুখ মে কুছ গোদ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন, ''অর্জুন! আত্মাই সত্য এবং সকল ভূত প্রাণীর দেহ নাশবান্, এদের অস্তিত্ব নেই, এসবই অনাত্মা।'' তা সত্ত্বেও দেহকে আত্মা বলে ভাবা অবিদ্যা। এটাই সব দুঃখের কারণ, তা সত্ত্বেও সেই সাংসারিক বাতাবরণে ঐশ্বর্য্য এবং সুখের মনগড়া ধারণা অবিদ্যাই।

সারাংশতঃ যে পরমাত্মা নয় তাকেই লোকে ভগবান বলে মনে করে। এইপ্রকার অনিত্যকে নিত্য, অপবিত্রকে পবিত্র, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মা বলে ভাবা, তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার নামই অবিদ্যা। এখন শেষ ক্লেশগুলিতে অস্মিতার স্বরূপ বলছেন—

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।। ৬।।

দৃক্-শক্তি এবং দর্শন-শক্তি এই দুটির প্রায় একরূপ হওয়া 'অস্মিতা'। দৃক-শক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা-পুরুষ এবং দর্শন-শক্তি অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যে-যে মাধ্যমগুলিতে দৃশ্য অঙ্কিত হয় এই দুটির একরূপতা হল অস্মিতা। দ্রষ্টা চেতন এবং মাধ্যম জড়। দ্রষ্টা নিজেকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ইত্যাদি বলে মনে করে—'**জড় চেতনহি গ্রন্থি পরি গঈ। জদপি মৃষা ছুটত কঠিনঈ।।' (রামচরিত মানস, ৭।১১৬খ।২)** চেতনের জড়ের সঙ্গে এই মিশ্রণই হল অস্মিতা নামক ক্লেশ, এখন দেখুন 'রাগ'—

'সুখানুশয়ী রাগঃ ।। ৭।।'

সুখের আভাস এর পিছনে যে মন ছুটছে এর এই স্বভাবকে 'রাগ' বলে। যে কোন বস্তু সুখের বলে বোধ হল, অমনি সেটার প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয়। এটাও একটা ক্লেশ। অনুকূল পদার্থগুলিতে সুখের আভাস এবং তা সদা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাকে

আসক্তি বলে, এটাই রাগ, এই রাগ নামক ক্লেশ সুখের প্রতীতির সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে। এই প্রকার 'দ্বেষ' এর স্বরূপ দেখুন—

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ।। ৮।।

প্রকৃতির যে পদার্থেই দুঃখ বোধ হয়, মন তার বিরোধ করে। এটাই হল দ্বেষ নামক ক্লেশ, দুঃখের আড়ালে যে বোধ লুকিয়ে থাকে তা হল দ্বেষ। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। (৩।৩৪)

ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গুলির ভোগে রাগ এবং দ্বেষ নিবাস করে। সাধনা পথে এদের দুর্জয় শত্রু বলা হয়। এ দুটির বশ হওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয়গুলি ভোগের সংস্পর্শে আসার ফলস্বরূপ রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ভোগ অনুকূল হলে রাগ এবং প্রতিকূল হলে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। সাধককে এসব থেকে সাবধান থাকা উচিৎ। এখন অন্তিম ক্লেশ অভিনিবেশের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

স্বরসবাহী বিদুষোঽপী তথারূঢোঽভিনিবেশঃ ।। ৯।।

পূর্ব-নিবাসস্থানের প্রতি মমত্ব বোধকে অভিনিবেশ বলা হয়েছে। যা মূঢ়গণের ন্যায় বিবেক সম্পন্ন পুরুষগণের মধ্যেও পরম্পরাগতভাবে স্বভাবে বিদ্যমান। যেখানে আগে থাকতাম সেখানের প্রতি টান, আকর্ষণকে অভিনিবেশ বলে। এটা স্বরে প্রবাহিত হয়ে জন্ম-জন্মান্তর পর্যন্ত তাড়া করে। ইহ জগতের নিবাসস্থান আমাদের ঘর নয়। এটাকে আমরা নিজের বলে ভেবে রেখেছি এই যা—

তবন ঘর চেতিহে রে ভাই। তোহরা আবাগমন মিটি জাই।।
কহ কবীর নিজ ঘর চলো। জঁহা কাল নহীঁ জায়।।

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''অর্জুন! **ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।**'' (১৮।৬১)—ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের শরণাগত হও।'' মনে করুন, কেউ প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হলেন, তাতে তাঁর কি লাভ? ভগবান বলছেন ''**তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।'' (১৮ ৬২)**—তাঁর অনুগ্রহে তুমি পরমশান্তি, শাশ্বত পরমধাম লাভ করবে। এটাই আপনার নিবাস স্থান, যেখানে আপনার শাশ্বত জীবন, নিবাস থাকবে।

সাধককে এই অভিনিবেশ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। পরের ক্ষণে লাভ করার থাকলেও এই অভিনিবেশ এখান পর্যন্ত ধাওয়া করে। পূজ্য গুরুদেব বিচরণকালে মধ্বাপুরে চাতুর্মাস্যা করার নির্দেশ ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ওখানে

মহারাজ সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোতেন। একটা ঘরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় এমন মনে হত যে, এক্ষুণি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ি মনে হত যেন কত আপনার। দু'তিন বার এইরূপ আকর্ষণ বোধ হওয়ার পর তিনি ইষ্টের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে—এইরূপ কেন মনে হয়? ভগবান বলেছিলেন যে, গত জন্মে দু-আড়াই মাস পর্যন্ত এই ঘরেই ছিলে সেই সংস্কারই তাড়া করছে। আপনার জন্মদাত্রী মাতা এখনও জীবিত। মহারাজজী ভক্তদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, ঐ ঘরটিতে কি কোন দু' আড়াই মাসের শিশুর মৃত্যু হয়েছিল? এ সব কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই বৃদ্ধা মা মহারাজজীর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, কেঁদে-কেঁদে পুত্রের গুণের বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু মহারাজজী অনুভবে প্রাপ্ত সঙ্কেতগুলি প্রকাশ করেননি। জীবমাত্রই প্রকৃতিতে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, পূর্ব নিবাসের আকর্ষণ তাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে। চিত্তবৃত্তি শান্ত প্রবাহিত হলে নির্বীজ সমাধির অবস্থাতে এই ক্লেশও শান্ত হয়ে যায়, শুধু অবিদ্যা জীবিত থাকে। বীজ শান্ত হলে অবিদ্যাও শান্ত হয়ে যায়।

কিছু কিছু ব্যক্তি আত্মার নিবাসস্থান দেহের প্রতি মমত্ব-বোধ এবং মরণ-ভয়কে অভিনিবেশ বলে; কিন্তু তা নয়। জীব বিভিন্ন দেহ-এর যাত্রাই তো করে আসছে। কোন্-কোন্ দেহের প্রতি মমত্ব-বোধ রাখবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন, ‘‘অর্জুন! তুমি শুধু জ্ঞানীর মত কথা বল কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তি জীবিত অথবা মৃত কারও জন্য শোক করেন না। দেহে যেমন বাল্য, কিশোর, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধাবস্থার আগমন হয়, সেইরূপ অন্যান্য দেহেরও পরিবর্তন হয়। এতে ধীর পুরুষ কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না।” মহাপুরুষগণ এই ভয় ত্যাগ করেই যোগ সাধনাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন; কিন্তু জীব যেখানে এখন পর্যন্ত দিনপাত করছিল, সেই পূর্ব-নিবাসের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অন্তিম সংস্কার পর্যন্ত ধাওয়া করে। এবং মূঢ়গণের ন্যায় বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও পূর্ব-নিবাসের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।। ১০।।

ক্রিয়াযোগ দ্বারা সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত সেই ক্লেশ আত্মপথের বিরোধী বিকারগুলিকেই ‘প্রসব’ উৎপন্ন করে, সেইজন্য ‘হেয়াঃ’ নষ্ট করার যোগ্য।

ক্লেশগুলির বিপরীত পরিণাম প্রাপ্ত করার উপায় কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ ।। ১১।।

ক্লেশ সংযুক্ত বৃত্তিগুলি ধ্যানের মাধ্যমে নাশ করার যোগ্য অর্থাৎ ক্লেশের নিরসনের জন্য ধ্যান করা উচিৎ। ধ্যান করার বিধি তৃতীয় পাদ-এর দ্বিতীয় সূত্রে দ্রষ্টব্য। যেখানে বলা হয়েছে অভ্যাসের সময় চিত্তকে যেখানে (নিযুক্ত) স্থির করা

হবে সেখানে বৃত্তি একরস থাকা, উচ্চাটন না হওয়া এরূপ হলে তবেই বুঝতে হবে ধ্যান প্রগাঢ় হচ্ছে। ধ্যান করে এই ক্লেশগুলির নাশ করতেই হবে; কারণ এই শুভাশুভ সংস্কার দুঃখেরই কারণ।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ।। ১২।।

ক্লেশ-এর মূল যতক্ষণ বিদ্যমান, ততক্ষণ কর্ম সংস্কারগুলির সমুদায় দৃষ্ট অর্থাৎ বর্তমানে এবং অদৃষ্ট অর্থাৎ ভবিষ্যতে দু প্রকারের জন্মে ভোগ করা হবে। সেই ভোগের স্বরূপ কিরূপ হবে? তা কিরূপে প্রকট হয়—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। ১৩।।

ক্লেশরূপী মূল বিদ্যমান থাকতে 'তদ্বিপাকঃ'—সেই কর্ম-সংস্কার-এর সংগ্রহের পরিণাম জন্ম, পুনর্জন্ম, আয়ু এবং ভোগ হতেই থাকে।

পরিণামের স্বরূপ বেশী স্পষ্ট করেছেন—

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ।। ১৪।।

তা জন্ম, আয়ু এবং ভোগ, হর্ষ এবং শোকরূপ ফল প্রদান করে; কারণ তার দুটি —পুণ্যকর্ম এবং পাপকর্ম। পূর্ণত্বের দিকে নিয়ে যায় যে কর্ম, তা পুণ্যকর্ম এবং যে কর্মের জন্য পতন হয়, তা পাপকর্ম। পুণ্যকর্ম— অক্লিষ্ট বৃত্তি দ্বারা সঞ্চালিত কর্ম জন্ম, আয়ু এবং ভোগে হর্ষ প্রদান করে। এই প্রকার পাপকর্ম-ক্লিষ্ট বৃত্তি দ্বারা সঞ্চালিত কর্ম জন্ম, আয়ু এবং ভোগরূপে পরিতাপ প্রদান করে।

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সুখের তৃষ্ণাও একপ্রকার দুঃখই—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।। ১৫।।

পরিণাম দুঃখ, তাপ, দুঃখ এবং সংস্কারদুঃখ সকলের ভিতর বিদ্যমান থাকার ফলে এবং তিনটি গুণের বৃত্তিগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হওয়ার জন্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সকল কর্মফল দুঃখেরই রূপ।

প্রত্যেক কর্মফল ভোগফল সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরিণামে অবশেষে দুঃখ প্রদান করে। আজ আনন্দ করে নিলেও কাল এর সঙ্গে সম্পৃক্ত দুঃখও আসবে। তার কাছে ভোগ্য সামগ্রী বেশী আছে, আমার কাছে কম কেন?— এইরূপ মনোভাবকে তাপদুঃখ বলে। কখনও-কখনও না চাইলেও দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। এটাকে সংস্কারদুঃখ বলে। '**গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ**'—সত্ত্ব, রজ, তম তিনটি গুণের স্বভাবে বিরোধ হওয়ার জন্য পরস্পর বিরোধী পরিণাম প্রদান করে। সাত্ত্বিক বৃত্তি প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়, তামসিক বৃত্তি অন্ধকারের দিকে প্রবৃত্ত করে। এইপ্রকার একটা মাত্র পরিণামের ভোগে অন্য গুণবৃত্তি বাধকের কাজ করে। সেইজন্য বিবেকসম্পন্ন পুরুষের জন্য সমস্ত কর্মফল-ভোগই দুঃখরূপ। অতএব এই ক্লেশগুলির নাশ করা উচিৎ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেহমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।। (গীতা, ১৮।৩৮)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তা ভোগকালে যদিও অমৃততুল্য, কিন্তু পরিশেষে বিষতুল্য; কারণ এই সুখ জন্ম মৃত্যুর কারণ, সেই সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয়।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, জন্ম, আয়ু এবং ভোগরূপ সকল কর্মফলই দুঃখরূপ। সেইজন্য তার মূলোচ্ছেদ করা মানুষের কর্তব্য।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্।। ১৬।।

অব কল কী বাত বনা লে রে।
জো বীতী বীত গই। দুনিয়া কী রীতি ইয়হী।

কর্মগুলির দুঃখরূপ ফলের যে অংশ অতিবাহিত, তা তো কাটানো হয়েছেই। কিছু অংশ বর্তমানে উপভোগ করা হচ্ছে কিন্তু যে দুঃখের এখন মুখ দেখিনি, অনাগত, ভবিষ্যতে দুঃখ দেবে, সেই দুঃখ হেয়-নাশ করার যোগ্য। প্রশ্ন উঠছে যে, কিরূপে নাশ করব? সেই বিধি কিরূপ?

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।। ১৭।।

দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের যোগাযোগ হেয়-এর কারণ (উপায়)।

আগে দৃশ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।। ১৮।।

প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি যার স্বভাব; ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যার প্রকট স্বরূপ; পুরুষের জন্য ভোগ এবং মোক্ষ সম্পাদন করাই প্রয়োজনীয় কাজ— এটাই দৃশ্যের রূপ।

প্রকাশ পরমাত্মাতে বিদ্যমান, প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আত্মস্বরূপ লাভে সাহায্য, প্রকাশ বিদ্যমান এই বোধ করানো, প্রকাশ লাভ করতে পারে সেইজন্য ক্রিয়াশীল করা, যোগ-সাধনাতে নিযুক্ত, প্রবৃত্ত করা এবং স্থিতি প্রদান, দৃশ্যের এটাই প্রয়োজনীয় কাজ। ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যার প্রকট স্বরূপ, সৃষ্টিতে দৃশ্যমান্ সকল বস্তুই ভূত। ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যা গ্রহণ করা হয়। পুরুষের জন্য ভোগ এবং মুক্তি সম্পাদন করাই যার প্রধান কাজ। এই ভোগ সাংসারিক নয়। **'ইষ্টান্‌ভোগান্ হি বো দেবাঃ' (গীতা, ৩।১২)** —ইষ্ট সম্বন্ধীয় ভোগ প্রদান করা দৃশ্যের বিশেষত্ব। যে ভোগ আপনার অভীষ্ট, তা পূরণের জন্য কি কি প্রয়োজন? —সেই সুবিধা প্রদান করা দৃশ্যের কাজ। এটাই

ভগবানের ভোজন। **‘ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্।’ (গীতা, ৫। ২৯)**—যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ইত্যাদি ইষ্টোন্মুখী সাধন, আমি ভক্ষণ করি। ভগবানের এটাই আহার।

অতএব পুরুষের জন্য সাধনোপযোগী ভোগ সকলের ব্যবস্থা এবং অবশেষে উত্তমরূপে মুক্তি সম্পাদন, মুক্তি পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করানো যার প্রয়োজনীয় কাজ, তা হল দৃশ্য। প্রকৃতি দৃশ্য হলে, প্রকৃতি মোক্ষ প্রদান করত! প্রকৃতি তো সংসারে বদ্ধ করে, এর থেকেই তো মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন।

এখানে ‘দৃশ্য’ প্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্ময় পরমাত্মার প্রেরণা। প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি যার স্বভাব, তা হল দৃশ্য। ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যার প্রকট স্বরূপ, তা হল দৃশ্য। অনুভবে এই ভূতগুলির মধ্যে থেকে, জীব-জগৎ থেকে যে কোন দৃশ্য সম্মুখে আসতে পারে, যা ইন্দ্রিয়সমূহ গ্রহণ করে। যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি সাধনার ব্যবস্থা এবং মুক্তি পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করানো যার প্রয়োজনীয় কাজ, তা হল দৃশ্য। যে বিধির মাধ্যমে এই দৃশ্য প্রসারিত করেন, সেই প্রসারণ-সূত্রের নাম শব্দ।

দৃশ্য মুক্তি সম্পাদন কিরূপে করে?—এই প্রসঙ্গে বলছেন—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি।।১৯।।

বিশেষ, অবিশেষ লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ ‘**গুণপর্বাণি**’-গুণ ভেদে এই চারটি বিধি দ্বারা দৃশ্য প্রসারিত হয়।

বিশেষ পরমাত্মা হল—‘**পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।**’ বিশেষের বোধ করানো, অবিশেষ অর্থাৎ প্রকৃতির আবরণ ঘন হচ্ছে, সচেতন হও, অভ্যাসে বেশী সময় দাও। বিশেষ ঈশ্বরীয় আলোক সম্বন্ধে বোধ করানো যে, এগিয়ে চল, সাধনা ঠিক পথে চলছে। লিঙ্গমাত্র—স্বরূপ প্রকট করে বোঝানো; অলিঙ্গ-অদৃশ্যরূপে বোঝানো, যেমন—অঙ্গ-স্পন্দন, আকাশবাণী অথবা অদৃশ্য সঙ্কেতের মাধ্যমে ভগবান বোঝাতে থাকেন, কোন দৃশ্য সম্মুখে থাকে না এবং অনুভব আসতে থাকে। গুণের প্রভাবের অনুসারে এই দৃশ্যগুলি আসতে থাকে।

রামচরিতমানসে উল্লেখ রয়েছে—

জগু পেখন তুম দেখনিহারে। বিধি হরি সম্ভু নচাবনিহারে।।
তেউ ন জানহিঁ মরমু তুম্হারা। অউরু তুম্হহি কো জাননিহারা।।

(মানস, ২।১২৬।১)

জগৎ দৃশ্যমান্, আপনি দর্শক। বিধি-পরমাত্মার প্রশক্তি যার দ্বারা সাধনা জাগ্রত হয়, হরি—যিনি ভরণ-পোষণ করেন, শম্ভু—যিনি শুভ-অশুভ সঙ্কল্পগুলি সংহার করে স্থিতি প্রদান করেন—এঁকে নাচান, সঞ্চালিত করেন ভগবান। তিনি সঞ্চালিত হন;

কিন্তু ঈশ্বরের রহস্য তিনিও জানেন না, অন্য কেউ আর কি জানবে! অর্থাৎ ভগবান রথী হন, সঞ্চালন করেন। এখন দ্রষ্টার স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।। ২০।।

চেতনমাত্র জ্ঞানস্বরূপ দ্রষ্টা আত্মা যদ্যপি স্বভাবে সর্বথা শুদ্ধ, নির্বিকার, তা সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ দেখে। বুদ্ধির বৃত্তি অনুসারেই চেতন আত্মার স্বরূপ হয়। দ্রষ্টা দেখে কি করে?

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা।। ২১।।

সেই দৃশ্যের স্বরূপ দ্রষ্টার জন্যই প্রকট হয়। যে দৃশ্য পুরুষের জন্য ভোগ এবং মোক্ষের ব্যবস্থা করে, সেই দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা সেই দ্রষ্টার জন্যই হয়ে থাকে।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।। ২২।।

যাঁর ভোগ এবং অপবর্গরূপ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই পুরুষের জন্য সেই দৃশ্য নষ্ট হয় না। তাঁর জন্য দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলেও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য তার প্রয়োজন থাকে। এইরূপ মহাপুরুষ সদ্‌গুরু হন। এঁদের কাছে অন্যের মধ্যে দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগ প্রসারিত করার জাগৃতি থাকে। অন্যের জন্য দৃশ্যের প্রয়োজন থাকে, মহাপুরুষের জন্য কোন প্রয়োজন থাকে না।

একবার পূজ্য গুরুদেব ভগবানের সম্মুখে দৃশ্য উপস্থিত হয়েছিল যে, এক ভ্রষ্ট যোগী আসবে, তাকে সঠিক পথের নির্দেশ আপনাকে দিতে হবে। সারাদিন সেই যোগীর অপেক্ষা করেছিলেন তিনি, সন্ধ্যাবেলা সেই যোগী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইনিই আমাদের সতীর্থ, অগ্রজ এবং মহারাজজীর প্রথম শিষ্য ছিলেন। দৃশ্যের প্রয়োজন মহাপুরুষদের থাকে না; কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণের জন্য উদ্বোধন করার শক্তি তাঁদের মধ্যে থাকে।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন, "হো! ভজনার জাগরণ এমন এক বিদ্যা যে, লেখা পড়া করে অথবা শ্রবণ দ্বারা এর জাগরণ সম্ভব নয়। বাণী দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। জ্ঞানপ্রাপ্ত সদ্‌গুরুর দ্বারা কোন কোন অধিকারীর হৃদয়ে জাগ্রত হয়।" অতএব জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সেই দৃশ্যের প্রয়োজন। এখন দৃশ্য এবং দ্রষ্টার সংযোগের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ।। ২৩।।

স্বশক্তি, যা মুক্তি সম্পাদন করে অর্থাৎ দৃশ্য এবং স্বামিশক্তি অর্থাৎ পুরুষ—এই দুটির মিলন এবং কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া, যা হল স্বরূপপ্রাপ্তির কারণ, তা হল সংযোগ। এর দ্বারাই ভজনা জাগ্রত হয়।

সংযোগের কি প্রয়োজন?—

তস্য হেতুরবিদ্যা।। ২৪।।

এই সংযোগের কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা নাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংযোগও শেষ হয়ে যায়। নাশ তো হল অবিদ্যা তবে সংযোগ কেন শেষ হল? এর কারণও অবিদ্যা। অবিদ্যা না থাকলে দ্রষ্টাকে দৃশ্য বোঝাতে হত না। দৃশ্য যখন মোক্ষের ব্যবস্থা করে দেয় তখন কৃতার্থ মহাপুরুষের জন্য দৃশ্যের প্রয়োজন থাকে না, আর সংযোগেরও প্রয়োজন থাকে না।

তদভাবাৎসংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।। ২৫।।

অবিদ্যার অভাবে সংযোগের অভাব হয়। এই 'হান' পুনর্জন্মাদির কারণ। ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যত দুঃখের প্রাপ্তি হত সেসবের সর্বথা অভাব হয়। সেটাই চেতন আত্মার কৈবল্য পদ, অমৃতময় অবিনাশী পদ।

এই কৈবল্যপদ কিরূপ? দুঃখের অত্যন্ত অভাব 'হান' কখন হয়?—

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।। ২৬।।

নিশ্চল এবং নির্দোষ বিবেকজ্ঞানযুক্ত 'হান' হল দুঃখের সর্বথা অন্তের উপায়। বিবেক খ্যাতি সেই অবস্থার নাম যখন বিবেক নিজের পরিণাম দেওয়ার অবস্থা পার করে পরিণাম দর্শিত করে। বিবেক খ্যাতি হানের উপায়। অবিদ্যার অভাবে সংযোগের অভাব হয়। এই অবস্থাতে ভগবান কাকে বোঝাবেন? কাকে পড়াবেন? অতএব সেই সংযোগ মহাপুরুষের জন্য নষ্ট হয়ে যায়, সেটাই হান; কারণ এখন থেকে তিনি বন্ধনমুক্ত সেই মুক্তির সম্পাদনও বাকী থাকে না। পুনর্জন্মাদি দুঃখের অভাবই হল হান। সেটাই এই চেতন আত্মার কৈবল্য। নিশ্চল, নির্দোষ বিবেকখ্যাতি নিজের পরাকাষ্ঠাতে। এই 'হানোপায়'— হল দুঃখ -মুক্তির উপায়। সেই সময়—

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা।। ২৭।।

বিবেকখ্যাতি জ্ঞানের সাতটি অবস্থা। সাতটিই ভগবৎ পথের সাতটি ভূমিকা। মহর্ষি এগুলির নাম উল্লেখ করেননি; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে এগুলিকে শুভেচ্ছা, সুবিচারণা, তনুমানসী, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা এবং তুর্যগা বলা হয়েছে।

এই বিবেকখ্যাতি কখন লাভ হয়? —এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।। ২৮।।

যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধির নাশ হলে জ্ঞানের প্রকাশ বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত হয়।

জ্ঞানের তিনটি অবস্থা। প্রারম্ভিক, মধ্য এবং উন্নত; খ্যাতি অর্থাৎ জ্ঞানও নিজের পূর্ণ প্রকাশ দর্শিত করেছে—তা হল বিবেকখ্যাতি। এরপর থাকল কৈবল্যপদ। কিন্তু এই সমস্ত লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য যোগের অঙ্গগুলির অনুষ্ঠানই একমাত্র মাধ্যম।

যোগ কাকে বলে? এর কটা অঙ্গ?

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান—
সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি।। ২৯।।

যোগের আটটি অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এগুলির মধ্যে যোগের প্রথম অঙ্গ 'যম'এর বর্ণনা করেছেন—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।। ৩০।।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি হল যম। আত্মরমণ হল 'অহিংসা'। 'সত্য' একমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করার প্রযত্ন হল সত্যাচরণ। ইষ্টের সম্মুখে নিষ্কপটভাব হল 'অস্তেয়'। মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মাচরণে প্রবাহিত হওয়া হল 'ব্রহ্মচর্য'। বিজাতীয় সংস্কার সংগ্রহ থেকে বিরত হওয়া 'অপরিগ্রহ'।

এই যমগুলির বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলছেন—

জাতিদেশকালসমযানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্।। ৩১।।

উপর্যুক্ত যম জাতি, দেশ, কাল এবং সময় অর্থাৎ নিমিত্তের সীমা দ্বারা বাধিত না হলে সার্বভৌম মহাব্রত হয়ে যায়।

একপ্রকার থেকে আর এক প্রকারে চিত্তবৃত্তিগুলির পরিবর্তন হল জাতি অর্থাৎ জন্ম। চিত্তবৃত্তির প্রবাহ যা, মানুষের স্বরূপও তাই। এতে নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থাগুলির ক্রম আসতে থাকে। কাকভুশুন্ডি অজগর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; কাকদেহ লাভ করেছিলেন; জড়ভরত হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ভগবান বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সেই জন্মগুলিতে পাঁচটি যমের পালন করে গিয়েছিলেন। এই প্রকার দেশে অর্থাৎ নাম, রূপ অথবা যোগের যে কোন অঙ্গে যেখানে ইচ্ছা মনকে নিযুক্ত করুন। কাল অর্থাৎ এটুকু সময়ই মন নিযুক্ত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মন স্থির থাকে, অন্য সময় থাকে না। ছোট-ছোট নিমিত্ত (যেমন—কোন বিশেষ দিনে হিংসা করব না এই তিথিগুলিতে ব্রহ্মচর্য পালন করব—এই প্রকার শর্ত) দ্বারা যম বাধিত হয় না। সব সময় যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা এই যমগুলি পালনে মন উৎসাহিত থাকে, সেই সময় এই যমগুলি সার্বভৌমিক হয়ে যায়। সকল যোনিতে (ভূমিতে) সবসময়, সব অবস্থাতে, সকল দেশে, সব নিমিত্তে অবাধরূপে যখন এগুলির আচরণ করা হয়, তখন একেই মহাব্রত বলা হয়।

যমগুলির বর্ণনা করে এখন নিয়মগুলির বর্ণনা করছেন—

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।। ৩২।।

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-শরণাগতি-এই পাঁচটি হল 'নিয়ম'।

যম এবং নিয়মগুলি পালন করার সময় পরস্পর বিপরীত সঙ্কল্পের উদয় হয়।

বিরোধী সঙ্কল্পগুলি কি করে বর্জন করবেন ?—

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।। ৩৩।।

বিরোধী ভাব উৎপন্ন হলে প্রতিরোধী (প্রতিপক্ষী) বিচারগুলির বারংবার চিন্তন করা উচিৎ। প্রতিপক্ষী বিচারগুলির চিন্তন কিরূপে করবেন ?—

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।। ৩৪।।

যম-নিয়মগুলি পালনের সময় এর বিরোধী ভাব উৎপন্ন হয়। যেমন-সত্যের পরিবর্তে অসত্য, অস্তেয়-এর পরিবর্তে চুরি, ব্রহ্মচর্যের পরিবর্তে বাসনা, অপরিগ্রহ না করে সংগ্রহ, শৌচের পরিবর্তে অশুদ্ধি—এই বিরোধী ভাবগুলি উৎপন্ন হয়। এদের ‘বিতর্ক’—বিরোধী তর্ক বলা হয়। এগুলির তিনটি প্রকার—কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত অর্থাৎ স্বয়ং সম্পাদিত, অন্যের দ্বারা সম্পাদিত এবং অনুমোদিত। বিরোধী বিচার কেন উৎপন্ন হয় ? এর কারণ লোভ, ক্রোধ এবং মোহ। এদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মানুষ তপস্যায় অমনোযোগী হয়। এগুলির দ্বারা প্রেরিত বিতর্কের মাত্রা কাউকে অল্প, কাউকে একটু বেশী এবং কোন কোন ব্যক্তিকে অত্যধিক, প্রভাবিত করে। এই বিতর্কগুলির প্রতীপক্ষী বিচারগুলির ভাবকে আশ্রয় করা উচিৎ যে, ‘‘বিতর্কের ভাব দুঃখ এবং অজ্ঞানরূপ অনন্তফল প্রদানকারী। এগুলি পুনরায় নরকে, পতনের দিকে নিয়ে যাবে। এই সমস্তই তো এখন পর্যন্ত করে এসেছি, আবার সেই ? হে মন ! তুমি তো এগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এসেছ। কোন্ মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আছ ? ভেবে দেখেছ ? নিজের সাথে গুরু মহারাজের বিমল কীর্তিকে কলঙ্কিত করবে ?’’—মনকে এভাবে বোঝানো এটা প্রতিপক্ষের মনোভাব।

এখন যম—নিয়মগুলির পরাকাষ্ঠা বলছেন—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ।। ৩৫।।

অহিংসার স্থিতি দৃঢ় হলে সেই যোগীর সম্মুখে সকল প্রাণী বৈরভাব ত্যাগ করে, কারণ তাঁর চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডল শান্ত থাকে। এইরূপ মহাপুরুষের নিবাসস্থান আশ্রমের ব্যবস্থাও বিলক্ষণ হয়। মানসে উল্লেখ আছে যে, যখন থেকে ভগবান রাম চিত্রকূটে থাকতে শুরু করেছিলেন—

‘করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্গা। বিগত বৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা।।’ (২।১৩৭।১)

পূজ্য গুরু মহারাজ অনুসুইয়ার ঘন জঙ্গলে বাস করতেন যেখানে বাঘ, ভালুক, লম্বা-লম্বা সাপের বাহুল্য ছিল কিন্তু এই বন্যহিংসক প্রাণীদের দ্বারা আশ্রম পরিসরে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ভগবান মহাবীরের অভিমত হল যে, যে-যে বিকার আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যায়, সেগুলি হিংসার কারণ। এই বিকারগুলিকে নিরুদ্ধ করাই বিশুদ্ধ অহিংসা।

বাস্তবে হিংসার অর্থ কোন জীবকে বধ (হত্যা) করা নয় পরন্তু আত্মপথ থেকে বিচলিত হওয়াই হিংসা এবং আত্মপথ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অহিংসা। নিজ আত্মস্বরূপে প্রবেশ জীবের জন্য পরমকল্যাণকর। অতএব আত্মস্বরূপের সুরক্ষাই অহিংসা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে অহিংসা শব্দের উল্লেখ করেছেন। যোগবিধি যজ্ঞের চোদ্দোটি লক্ষণের মধ্যে সংশিত ব্রত অহিংসা, যার পরিণাম সনাতন ব্রহ্মের দর্শন এবং স্থিতি। স্বরূপে স্থিত মহাপুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণের মধ্যে একটি হল অহিংসা। দৈবী সম্পদ্ যা পরমদেব পরমাত্মার মধ্যে স্থিতি প্রদান করে, মোক্ষ প্রদান করে। এগুলির মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির দমন, মনের শমন, অনুভবে উপলব্ধি, বাস্তবিক জ্ঞান ইত্যাদি ছাব্বিশটি লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ অহিংসা। ''অর্জুন! আত্মাই শত্রু এবং আত্মাই মিত্র। যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেছেন তাঁর জন্য তাঁরই আত্মা মিত্র হয়ে যায়। পরমকল্যাণ করে। যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেননি তাঁর জন্য তাঁর আত্মা শত্রু হয়ে শত্রুর মত ব্যবহার করে, অধম এবং নীচ যোনিগুলিতে নিক্ষেপ করে। সেইজন্য পুরুষকে স্বীয় আত্মার উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিৎ, অধোগতি যাতে না হয় সেই চেষ্টা করা উচিৎ।''

অহিংসাপ্রাপ্ত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এই হিংসার কারণ যেগুলি সেই কারণগুলি সহজেই ত্যাগ করা সম্ভব হয়, সংযম দৃঢ় হয়, আত্মস্থিতি লাভ সহজসাধ্য হয়, আত্মার উদ্ধার সহজেই হয়। এই শিক্ষা মহাপুরুষ প্রদান করেন। অতএব অহিংসা কোন-কোন বিরল মহাপুরুষের ক্ষেত্রের বিষয়। এই স্তরের মহাপুরুষের চতুর্দিকে এক প্রভাব-ক্ষেত্র নির্মিত হয়। যে প্রকার কাকভুশুণ্ডি আশ্রমের প্রভাব ছিল যে, '**ব্যাপহিঁ তহঁ ন অবিদ্যা জোজন এক প্রজন্ত।**' সেখানের বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ এবং শান্ত হয়ে যায়। তাঁর পরিধির ভিতর যিনিই পৌঁছান, তাঁর অন্তরেও যোগের সংস্কারের সূত্রপাত হয়।

'**বৈরত্যাগঃ**' জগতে শত্রুকে মেরে ফেলা হয়, 'অহিংসা' যিনি ধারণ করেছেন তিনি শত্রুকে ত্যাগ করেন। শত্রু কে? মানুষ না চাইলেও কার প্রেরণাতে পাপের আচরণ করে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। (গীতা, ৩।৩৭)

অর্জুন! কাম এবং ক্রোধ অগ্নির ন্যায় ভোগে অতৃপ্ত, অত্যন্ত ক্ষতিকারক। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নাশক এরা জ্ঞানীর চিরশত্রু। মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এই শত্রুগুলির নাশ হয়।

'**পরম ধর্ম শ্রুতি বিদিত অহিংসা।' (মানস, ৭।১২০।২২)** সুরত অর্থাৎ মনের দৃষ্টি যা বায়ুর থেকে তীব্রবেগে ধাবমান হয়, স্থির হয়ে যায়। এই নিরোধের সঙ্গে মনের

অন্তরালে বিদ্যমান সত্তা, যা হল কল্যাণতত্ত্ব দ্রষ্টা আত্মা। তাঁকে স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে যা ধারণযোগ্য—ধর্ম, সেই কার্য সম্পূর্ণ হয়। এটা হল অহিংসার পরাকাষ্ঠা। এইরূপ মহাপুরুষের দৃষ্টি পড়ামাত্র ব্যক্তি হিংসা মার্গ ত্যাগ করে অহিংসার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে, যেমন—বাল্মীকি, অঙ্গুলিমাল ইত্যাদি। পূজ্য গুরুদেব ভগবানের সান্নিধ্যে অনুসুইয়া অঞ্চলের দস্যুদের প্রবৃত্তিতে পরিবর্তন হয়েছিল, তারা হিংসা ত্যাগ করে ভজনা করতে শুরু করেছিল।

দ্বিতীয় যম সত্য। তার পরাকাষ্ঠা কতদূর?

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।। ৩৬।।

সত্য দৃঢ় হলে ক্রিয়াফলের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

শুধু দ্রষ্টা আত্মা সত্য। সৃষ্টিতে অন্য যা কিছু আছে, সেসব নশ্বর। এই সত্য একমাত্র পরমাত্মাতে দৃঢ়স্থিতি লাভ হলে, শ্রদ্ধা কেন্দ্রিত হয়, সমর্পণ স্থির হলে, সাধনাতে তীব্রতা আসে এর ফলে '**ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্**'—ক্রিয়ার ফল হল পরমাত্মা, পরব্রহ্ম পরমাত্মার আশ্রয় লাভ হয়। অর্থাৎ ভগবান বিধিমত যোগক্ষেম করেন।

যমের তৃতীয় অঙ্গ 'অস্তেয়' দেখুন—

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্।। ৩৭।।

প্রায়ই চুরি না করাকে অস্তেয় বলা হয়। চৌর্যবৃত্তির অভাব হলেই যোগীর সমক্ষে সকল রত্ন সমূহ প্রকট হওয়া উচিৎ। শাস্ত্রে একথা উল্লিখিত যে সমুদ্র-মন্থনের ফলে চোদ্দোটি রত্ন নিঃসারণ হয়েছিল।

শ্রী মণি রম্ভা বারুণী, অমিয় শঙ্খ গজরাজ।
কল্পদ্রুম শশি ধেনু ধনু, ধনবন্তরি বিষ বাজি।।

ধরুন অচৌর্যবৃত্তি দৃঢ় হয়েছে, যোগীর সমক্ষে যদি রম্ভা অথবা বারুণী প্রকট হয় তবে তিনি কি করবেন? নিরিবিলিতে ভজনা করার সময় এটা খুব বড় বিঘ্ন। রম্ভা বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়েছিল ফলে তাঁর পতন হয়েছিল। অতএব অস্তেয় অথবা রত্নগুলির এই আশয় সঙ্গত প্রতীত হচ্ছে না।

ভগবান মহাবীরকে এক রাজা প্রশ্ন করেছিলেন, ''ভগবন! সদ্‌গৃহস্থ আশ্রমে বাস করে আমাদের কল্যাণ কিরূপে হবে?'' তিনি বলেছিলেন, ''রাজন! ত্রিরত্ন ধারণ করুন।'' '**সম্যকদর্শনজ্ঞানচরিত্রাণি**' তীর্থঙ্কর অর্থাৎ তীর্থস্বরূপ মহাপুরুষ সদ্‌গুরুকে দর্শন করুন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা স্থির করুন, তাঁর নিকট সাধন-বিধি জেনে সেই অনুসারে আচরণ করুন। এগুলিই ত্রিরত্ন।

পূজ্য গুরুদেব বলতেন, সদ্‌গুরুর সমক্ষে যা হৃদয়ে রয়েছে, তাই মুখেও থাকবে। মনে কিছু আর মুখে আর কিছু—এই ধরণের সাধক কখনও সফল হয় না। ভগবানের কাছে কিছু লুকোনোও তো যায় না। '**সব কে উর অন্তর বসহু, জানহু ভাউ কুভাউ।**'

(রামচরিতমানস, ২।২৫৭) ঈশ্বরের বাস সকলের হৃদয়ে, তিনি ভাব-কুভাব সবই দেখছেন। মনে সঙ্কল্প পরে জাগে, ভগবান আগেই বলে দেন কখন বিজাতীয় সঙ্কল্প জাগবে। বিতর্ক শুরু হয়নি, পরিস্থিতি অথবা বিপদ আসেনি, তার আগেই ভগবান বলে দেন; সাধক তখনই সাবধান হয়ে যান। অতএব ভগবানের কাছে অজানা কিছু নেই তা সত্ত্বেও জীবের স্বভাব হল, কিছু না কিছু ছল করেই। যখন কপটতা শেষ হয়, **'নবম সরল সব সন ছলহীনা।'** **(রামচরিতমানস, ৩।৩৫।৫)** হয়ে যায় তখন সাধনাতে সহায়ক সব রত্ন বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে যোগীর সমক্ষে প্রকট হতে থাকে।

এখন ব্রহ্মচর্যের পরিণাম বলছেন—

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।। ৩৮।।

ব্রহ্মচর্য দৃঢ় হলে সামর্থ্য লাভ হয়।

শুধু জননেন্দ্রিয় সংযমই ব্রহ্মচর্য নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে বলপূর্বক ইন্দ্রিয়গুলিকে রোধ করে মনে মনে যে বিষয় চিন্তা করে সে দম্ভাচারী। নিজের পূর্বজন্মের কাহিনী সম্বন্ধে বলতেন গুরু মহারাজজী, যে, গত জন্মেই নিবৃত্তি হয়ে যেত; কিন্তু মনে দুটি ইচ্ছা বাকী ছিল বিবাহ কি রকম অনুষ্ঠান এবং লোকে গঞ্জিকা সেবন করে মাতাল হয়ে ভজনা করে, এতে কত আনন্দ হয়? পূর্বজন্মে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করেননি এবং গঞ্জিকা স্পর্শও করেননি; কিন্তু মনে কৌতূহল ছিল সেইজন্য জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। ভগবান অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ, গৃহস্থজীবন দেখিয়ে দু'একবার তিরস্কার করে সাধু বানিয়ে দিয়েছেন। আকাশবাণী হয়েছিল যে, এই মন্দিরে তোমার গুরু মহারাজ আছেন। সেই তপোধনের সান্নিধ্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সাধনা জাগ্রত হয়েছিল, ভগবান রথী হয়ে যোগক্ষেম করতে শুরু করেছিলেন। ভজনার জন্য ঘুম ভাঙ্গানো, ওঠান, বসান সব করতে শুরু করেছিলেন। আহার গ্রহণে ভগবান সংযত করেছিলেন —এটা খাও, এটা খাবে না। জাগা-শোওয়া নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছিলেন। সব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন যেন কেউ গুপ্তধন লাভ করেছে সেইরকম যোগের বিভূতিগুলির দর্শন হচ্ছিল, রত্ন প্রকট হচ্ছিল। গতজন্মে পূজ্যশ্রী ব্রহ্মচারীই তো ছিলেন, সংযমী ছিলেন, তা সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল।

কুতর্ক শান্ত হয় ব্রহ্মাচরণ দ্বারা, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে ব্রহ্মচিন্তনে নিযুক্ত হলে। **'ব্রহ্মাচরতি স ব্রহ্মচারী।'** চক্ষু এবং কান অন্য কিছু দেখবে, শুনবে না। কানে বিষয়োত্তেজক কথা শ্রবণ করে, চক্ষু দ্বারা উত্তেজক দৃশ্য দেখে দেহকে রক্ষা করা সাপের মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে কামড় না খাওয়ার সমান। ব্রহ্মাচরণ দ্বারা, সতত চিন্তন

দ্বারা সকলেন্দ্রিয় সংযম সম্ভব হয়। এর দ্বারাই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের অবস্থা লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য দৃঢ় হলে 'বীর্যলাভঃ'—সামর্থ্য লাভ হয়। আত্মার বিলুপ্ত পরাক্রম প্রকট হয়। যে মনকে বলপূর্বক ভজনে নিযুক্ত করার প্রয়োজন হত তা ভজনে সহজেই প্রবৃত্ত হওয়ার সামর্থ্য লাভ করে। বিঘ্ন আসলেও পশ্চাৎপদ হয় না। মীরা পশ্চাৎপদ হয়নি। বিষের পেয়ালা, শূলের শয্যাও তাকে বিচলিত করতে পারেনি। প্রহ্লাদকে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, হস্তীপদ দ্বারা পেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল—বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল এবং দূরও হয়েছিল। সাধকের মধ্যে লক্ষ্যে স্থির থাকার ক্ষমতা চলে আসে। এই অবস্থাতে প্রয়াসপূর্বক নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না।

নোট—সকলেন্দ্রিয়-সংযম-এর মধ্যেও জননেন্দ্রিয় সংযম ব্রহ্মচর্যের অনিবার্য শর্ত। পূজ্য গুরুদেব ভগবান বলতেন গৃহস্থদের দ্বারা এই সংযমে ভুল হলে ভগবান ক্ষমা করে দেন; কিন্তু সাধুবেশে এইরূপ ভুল হলে ভগবান কখনও ক্ষমা করেন না। এইরূপ পতিত সাধকদের দেহ-ত্যাগই হল একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

এখন দেখুন 'অপরিগ্রহ'—

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ।। ৩৯।।

অপরিগ্রহ দৃঢ় হলে '**জন্মকথন্তাসম্বোধঃ**'—পূর্বজন্ম কিরূপ ছিল?—উত্তমরূপে এ জ্ঞান হয়।

কিছু কিছু ব্যক্তির অনুসারে প্রয়োজনের অধিক বস্তুর সংগ্রহ না করা অথবা কিছু সংগ্রহ করবেন না—এটাই অপরিগ্রহ। জঙ্গল নিবাসী আদিবাসী লোকেরা সকালবেলা জীবিকোপার্জন হেতু বেরিয়ে পড়ে। সারাদিনে যেটুকু জোগাড় করতে পারে তা দিয়ে যেন-তেন-প্রকারেণ উদরপূর্তিই হয়। তাদের ঘর খোলা থাকে। ভূমিশয্যা। সংগ্রহের নামে এল্যুমিনিয়ামের দু-একটা চেপটা বাসন! সকলেই অপরিগ্রহী! পূর্ব জন্ম তো কা কথা, আগামীকাল কি ঘটবে? এর জ্ঞানও তাদের নেই। সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও রাজর্ষি জনক অপরিগ্রহী ছিলেন।

অপরিগ্রহ বস্তু-সংগ্রহ-এর সঙ্গে ততটা সম্পর্কযুক্ত নয়, যতটা চিন্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চিন্তন এতটা উন্নত হবে যে তার দ্বারা নতুন সংস্কার সংগ্রহ হবে না। নতুন সংস্কারের সংগ্রহ না হলেও পুরোনো সংস্কারের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়ে থাকে, যার ফলে মনে ভাল-মন্দ সঙ্কল্প জাগে। এই অবস্থাতে সাধক এটা জানতে পারে যে, পূর্বজন্মের কত সংস্কার বাকী ছিল। সেগুলির অবসান এবং কতদিন পর সেগুলি নিবৃত্ত হবে? এও জানা সম্ভব হয়।

এই প্রকার যমের স্থিতির পরিণাম সম্বন্ধে বলে মহর্ষি নিয়মপালনের ফল সম্বন্ধে

বলছেন। নিয়ম পাঁচ প্রকারের—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান। এগুলির মধ্যে প্রথমটি হল 'শৌচ'—

শৌচাৎস্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।। ৪০।।

শৌচের পালন দ্বারা স্বীয় অঙ্গের প্রতি উদাসীনভাব এবং অন্যের সঙ্গে সংসর্গ না করার ইচ্ছা বলবতী হয়।

শৌচের অর্থ শরীরের সজ্জা, কেশের বিন্যাস অথবা প্রসাধন নয়। এর ফলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি উদাসীন ভাব উৎপন্ন হয় না, পক্ষান্তরে এটা মমত্বেরই পরিচায়ক। কিছু-কিছু ব্যক্তি দিনে কয়েকবার স্নান করাকে শৌচের সংজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু মহাপুরুষগণ কায়িক স্বচ্ছতাকে বেশী মহত্ত্ব দেননি। **'পানী লে লে সাবুন লে লে, মল মল কায়া ধোই। অন্তর ঘট কা দাগ ন ছুটে, নির্মল কইসে হোই।।'** ভজনা মন করে। এটা মুখ্যরূপে মানসিকক্রিয়া। দেহের সাজ-সজ্জার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের গুরু মহারাজ কখনও একবছর, কখনও ছ'মাস পর্যন্ত স্নান করতেন না। সর্বদা শ্বাসের উপর দৃষ্টি রেখে উদাসীনভাবে থাকতেন। কেউ স্নান সম্বন্ধে কিছু বললে বলতেন— যখন কোনরূপ কষ্ট নেই, স্নানের জন্য অকারণ কেন সময় নষ্ট করব! তাঁকে দেখলে মনেও হত না যে ইনি ছ'মাস, একবছর ধরে স্নান করেননি।

শৌচের অর্থ হল-মনের শুদ্ধি, যাতে অন্তঃকরণের পবিত্রতা, মন, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাণী ইত্যাদি সর্বত্র পবিত্রতা চলে আসে। দেহের ভানই (বোধ) থাকে না মন চিন্তনে নিযুক্ত হয়, এর ফলে কপটাচরণ থেকে বিরক্তি চলে আসে। এবং **'পরৈঃ অসংসর্গঃ'**—অন্যের সঙ্গে সংসর্গ থেকে দূরে থাকার ক্ষমতা চলে আসে।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন যে, যখন তিনি চিন্তনে বসতেন, সেইসময় কেউ তাঁর নিকটে বসলে তাঁর মনে হত যে, কত শীঘ্র সেই ব্যক্তি, সেখান থেকে যায়। ক্রমশঃ সকলে দূরে সরে গিয়েছিল। সঙ্গীহীন থাকার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। স্বীয় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি উদাসীন ভাব চলে আসে। স্নান করেছি অথবা করিনি হুঁশ থাকে না। শৌচ দ্বারা কিছু অন্য ক্ষমতার বিকাশও হয়—

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনসৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।। ৪১।।

এবং এছাড়া অন্তঃকরণের শুদ্ধি, মনে প্রসন্নতা, চিত্তের একাগ্রতা, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয় ও আত্ম দর্শনের যোগ্যতা চলে আসে। অন্তঃকরণ শান্ত এবং চিন্তনে প্রবাহিত হওয়ার ক্ষমতা লাভ করে। চিন্তনে অনুরাগ দেখে মন প্রসন্ন হয়। চিত্তে একাগ্রতা, অন্তঃকরণে নির্মলতা চলে আসে; কারণ অন্তঃকরণের ধৌতকরণই শৌচ।

এখন দ্বিতীয় নিয়ম 'সন্তোষ' দেখুন—

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।। ৪২।।

সন্তোষ দ্বারা সর্বোত্তম সুখ লাভ হয়, যার থেকে উত্তম আর কোন সুখ নেই। এইরূপ সুখ শুধু পরমাত্মাতে আছে। সন্তোষের পরাকাষ্ঠাতে প্রভুর কাছ থেকে তোশ লাভ হয়। **'জো আনন্দ সিন্ধু সুখরাসী। সীকর তেঁ ত্রৈলোক সুপাসী।।' (মানস, ১।১৯৬।৩)** ভগবান আনন্দের সমুদ্র, সুখের রাশি। এই আনন্দসিন্ধুর এক বিন্দুতে ত্রৈলোক্য তৃপ্ত হয়। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলা সন্তোষ নয়। সন্তোষ দ্বারা কামনার নাশ হয়; কারণ যখন সম—সেই পরমাত্মার কাছ থেকে তোশ লাভ হল তবে কামনাও কার করা হবে! এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই তবে কাকে লাভ করার স্পৃহা হবে।

এখন তপস্যার সর্বোপরি পরিণাম বলছেন—

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।। ৪৩।।

তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা যখন অশুদ্ধির নাশ হয়, তখন **'কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধিঃ'**—দেহ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সিদ্ধি হয়ে যায়। সেই অবস্থাতে ইন্দ্রিয়গুলিকে যেখানে ইচ্ছা আপনি সেখানে নিযুক্ত করতে পারেন। শীত-গ্রীষ্ম যে পরিবেশে রাখতে চান, রাগ-দ্বেষ রহিত সেই পরিবেশেই রাখতে পারেন। সামান্য জীব **'জহঁ তহঁ ইন্দ্রিন তান্যো' (বিনয় পত্রিকা, ৮৮।১)** ইন্দ্রিয়গুলির প্রবাহে ভেসে যায়।

গীতাশাস্ত্রে ভগবান বলেছেন যে, বিষয়ে লিপ্ত যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন থাকে, সেই একটামাত্র ইন্দ্রিয় অযুক্ত পুরুষের মনকে সেইপ্রকার অপহরণ করে, যে প্রকার প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ভরাডুবি হয়। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে মনকে সাধনাতে নিযুক্ত কর। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে ইষ্টের অনুরূপ করার চেষ্টাকে তপস্যা বলে।

এখন দেখুন স্বাধ্যায় এর স্বরূপ—

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।। ৪৪।।

স্বাধ্যায়-এর অর্থ হল নিজের অধ্যয়ন। সাধনাতে কত সময় দেওয়া উচিৎ, কত দিচ্ছি ? —এই নিরীক্ষণ করে সদৈব সচেতন থেকে, বুঝে সাধনারত থাকলে **'ইষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ'**—যোগের অবস্থা ইষ্টদেবের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়।

ঈশ্বর-প্রণিধানের পরাকাষ্ঠা দেখুন—

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।। ৪৫।।

ঈশ্বরের শরণাগত এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর প্রতি সমর্পণ ও তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হলে সমাধির সিদ্ধি হয়।

ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল সাধকের যোগক্ষেম ভগবান স্বয়ং দেখেন। অতএব সাধনা শীঘ্র এবং অনায়াসে পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ পরিস্থিতিতে 'সমাধি' অর্থাৎ সম এবং আদি তত্ত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে সমত্ব লাভে শীঘ্র সফলতা লাভ হয়।

এখন 'আসন'-এর স্বরূপ দেখুন—

স্থিরসুখমাসনম্।। ৪৬।।

নিশ্চল সুখপূর্বক বসার নাম আসন। আসনে বসা সোজা, কিন্তু কোথায় সুখ? সুখের ওঠা-নামা মনে, শরীরে হয় না।এই আসন কিরূপে সিদ্ধ হয়? তা বলেছেন—

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।। ৪৭।।

উক্ত আসন শিথিল প্রযত্ন দ্বারা এবং অনন্ত অর্থাৎ পরামাত্মাতে মন নিযুক্ত করলে সিদ্ধ হয়।

যদি দেহটা বসলেই আসন হত তবে অনন্ত (পরমাত্মা)তে মন নিযুক্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? এমন অনেক বিভূতি ছিলেন; যেমন—মহর্ষি অষ্টাবক্র, গুরু মহারাজের গুরুদেব পূজ্য সৎসঙ্গী মহারাজজী, যাঁদের পদযুগল বহুস্থানে বাঁকা ছিল, এখানে আসনের মুদ্রার প্রশ্নই উঠছে না, কখনও বসা হয়নি আসনে; কিন্তু তাঁরা নিজের যুগের সর্বোপরি মহাপুরুষ ছিলেন।

'প্রযত্নশৈথিল্য' অর্থাৎ যম, নিয়ম, তপস্যা, স্বাধ্যায়াদিতে যে প্রযত্ন করা হয়, সেই প্রযত্নে শিথিলতা, সহজ স্বাভাবিকভাবে এগুলি পালন হতে থাকলে, একবার মনকে নিযুক্ত করার সঙ্গে-সঙ্গে শান্ত প্রবাহিত হলে—এই প্রকার একমাত্র পরমাত্মাতে উত্তমরূপে মন নিযুক্ত হলে আসন সিদ্ধ হয়। অতএব এটা হল মনের আসন, মন স্থির হওয়াই আসন। ভজনা করার জন্য দেহকে একটা নির্ধারিত মুদ্রাতে বসাতে হয়, এতে দেহ, মস্তক, মেরুদণ্ড এবং গ্রীবা সোজা করে বসতে হয়। চক্ষু অর্ধোন্মীলিত নাসাগ্রে দৃষ্টি আবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি মন শান্ত এবং স্থির হওয়াকেই আসনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। '**আসন মারে কেয়া ভয়া, মুই ন মন কী আস। জ্যোঁ কোল্হু কে বৈল কো, ঘর হী কোস পচাস।।**' মনে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির উদয় হয়। এরাই স্থির হয়ে বসতে দেয় না।

আসনের প্রভাব কি?—

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।। ৪৮।।

আসন সিদ্ধ হলেই দ্বন্দ্বগুলির আঘাত বন্ধ হয়। রাগ-দ্বেষ, ভাল-মন্দ উদ্বেগ হল দ্বন্দ্ব যা মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। প্রকৃতির বিরোধী দিক্ থেকেও তার হৃদয়ে কোন প্রভাব পড়ে না।

সেইসময় তার অবস্থা কিরূপ হয়?—

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।। ৪৯।।

সেই আসন সাধিত হলেই শ্বাস এবং প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হয়, একেই প্রাণায়াম বলে।

প্রাণায়াম কোন পৃথক্ ক্রিয়া নয়। অভ্যাস করা হয় তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধানের, সাধন করা হয় অহিংসা,সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহের। এগুলি

সহজভাবে পালন করা সম্ভব হলেই আসন-সিদ্ধি এবং আসন সিদ্ধ হলেই প্রাণায়াম! প্রাণের ব্যাপারে বিরাম হয়। এই প্রকার এই স্থিতি পরিণামজন্য। এটা যম-নিয়ম পালনের ফল।

নিঃশ্বাস হল ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু, প্রশ্বাস হল বাইরে থেকে ফুসফুসের অভ্যন্তরে গৃহীত বায়ু। (প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও কোথাও এর বিপরীত উল্লেখও পাওয়া যায়, যাতে প্রাণ যা ত্যাগ করা হয় এবং প্রশ্বাস যা গ্রহণ করা হয়। এইরূপ অর্থগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মনীষীগণ শ্বাস অথবা প্রাণ সেই বায়ুকে বলেছেন যা আমরা গ্রহণ করি।) আত্মোন্নতির জন্য আপনি গ্রহণ করেন বিদ্যা এবং আত্মার অধোগামী অবিদ্যা ত্যাগ করেন। এই দুটির নিবৃত্তি, যখন ত্যাগ এবং গ্রহণের বৃত্তি শান্ত হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এর গতি রুদ্ধ হয়, একেই প্রাণায়াম বলে।

আসন সিদ্ধ হলে চিত্তবৃত্তি শান্ত প্রবাহিত হয়। অন্তরে কোন সঙ্কল্প জাগে না এবং বহির্জগতের কোন সঙ্কল্প ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এই কারণেই এইরূপ অবস্থাতে চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়ে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এর গতিরোধ এটাই। যদি আন্তরিক অথবা বহির্জগতের সঙ্কল্প মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তবে স্পষ্ট হবে যে আসন সিদ্ধ হয়নি, কারণ আসন সিদ্ধ হলে সঙ্কল্প শান্ত হয়ে যায়। প্রাণের ব্যাপার—এ নিবৃত্তি চলে আসে।

অন্তঃকরণকে প্রাণ বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে '**সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।**' (**গীতা, ৪।২৭**) সকল ইন্দ্রিয়ের কর্মকে, '**ইন্দ্রিয়কর্মাণি**' ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম করে, '**প্রাণকর্মাণি**'—প্রাণ কর্ম করে। বহির্জগতে ইন্দ্রিয়গুলি কর্ম করে, অন্তঃকরণে প্রাণ কর্ম করে। দুটির কর্মকেই ঈশ্বরের নির্দেশে প্রকাশিত আত্মাতে সংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেওয়াই হল যোগ।

সারাংশতঃ যম-নিয়মের অভ্যাস করা হয়। এর ফলে আসন সিদ্ধ হয়। এরই উন্নত স্তর হল প্রাণায়াম।

উক্ত প্রাণায়ামের অবস্থা কিরূপে লাভ হবে? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ।। ৫০।।

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তির ভেদে দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করলে প্রাণায়াম দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হতে থাকে।

বাহ্যবৃত্তি প্রকৃতিতে মুগ্ধ করে রাখে, যা হল অবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত ক্লিষ্টবৃত্তি। আভ্যন্তরবৃত্তি যোগ-সাধনাতে নিযুক্ত করে, পরমাত্মার দিকে নিয়ে যায়। তৃতীয়বৃত্তি হল স্তম্ভবৃত্তি, এতে বহির্জগতের চিন্তা আসে না আভ্যন্তর চিন্তনও আসে না, অতএব এটি স্থিরবৃত্তি। মন বহির্জগতের চিন্তা করলে কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষাদি কোন্ স্থানে

গমন করল? কতকাল পর্যন্ত সেখানের বিষয়ে চিন্তা করল?—গণনা দ্বারা তা দেখা উচিৎ। মন আভ্যন্তর বৃত্তিতে নিযুক্ত হলে বিবেকের বিশ্লেষণ করে অথবা বৈরাগ্যের? শ্রদ্ধা অথবা সমর্পণ কোন্ স্থানে চিন্তন করছে? কতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে থাকল? সেখান থেকে আকর্ষণ করে তাকে স্তম্ভবৃত্তিতে নিযুক্ত করুন। বাহ্যবৃত্তি থেকে মনকে আকর্ষিত করে আভ্যন্তর এবং স্তম্ভবৃত্তিতে স্থির করুন। আভ্যন্তর বৃত্তিতেও মন সঙ্কল্পই তো করছে—এই প্রকার নিরীক্ষণ করলে, সচেতন থাকলে প্রাণায়াম দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়। এই প্রাণায়ামে শ্বাসকে হ্রস্ব দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই, বৃত্তিকে নিরীক্ষণ করতে হবে।

প্রাণায়ামের অন্তিম স্তর দেখুন—

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।। ৫১।।

বাহ্যাভ্যন্তরের বিষয়গুলি রুদ্ধ হওয়া, ত্যাগ হওয়া চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। বহির্জগতের বিজাতীয় সঙ্কল্পও উঠবে না, এবং আভ্যন্তরের অক্লিষ্ট-দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত সঙ্কল্পও উঠবে না। মনের দৃষ্টি (সুরত) সহজভাবে প্রবাহিত। এটা প্রাণায়ামের চতুর্থ সর্বোন্নত অবস্থা। এটাই শুদ্ধ প্রাণায়াম, এতে প্রাণের ব্যাপার নিবৃত্ত হয়।

প্রাণায়ামের অর্থ বৃত্তিগুলির নিরোধ, শ্বাসের নিরোধ নয়। শ্বাস তো শরীরের জীবনীশক্তি। যেমন—চক্ষু, কর্ণ, নাসারন্ধ্র ক্রিয়াশীল তেমনই শ্বাস দেহকে বল প্রদান করে। একে রুদ্ধ করা, হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। শ্বাসের সঙ্গে ভাল-মন্দ সঙ্কল্পও মিশ্রিত থাকে। দু'প্রকারেরই সঙ্কল্প গ্রহণ না করার ক্ষমতালাভই হল প্রাণায়াম।

প্রাণায়ামে শ্বাসকে কিছু করার প্রয়োজন নেই। শুধু চিত্তকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করতে হবে। শ্বাস তো শিশুদের দেহে শিশুদের ন্যায়, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দেহে বৃদ্ধের ন্যায়, প্রৌঢ় অথবা যুবকদের ভিতর তাদের আয়ুর অনুপাতেই প্রবাহিত থাকে। এতে কমবেশি করা উচিৎ নয়, রোগের সৃষ্টি হতে পারে। চিত্তকে বাহ্য আভ্যন্তর থেকে স্তম্ভবৃত্তিতে স্থির করুন। বিষয় শান্ত হওয়া, চিত্তের প্রবাহ শান্ত, স্থির হওয়াকেই প্রাণায়াম বলে। এতে লাভ?—

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ।। ৫২।।

প্রাণায়াম সিদ্ধ হলেই বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় শান্ত হয়। প্রাণের ব্যাপার শান্ত প্রবাহিত হয়, প্রাণের ব্যাপার নিবৃত্ত হয়, প্রাণ একটা পরিধিতে স্থির হয়, এই প্রাণায়ামের ফলে জ্যোতির্ময় পরমাত্মা এবং সাধকের মাঝে বাহ্য অথবা আভ্যন্তর বৃত্তির যে আবরণ থাকে তা ক্ষীণ হয়। আবরণ থাকে অবশ্যই, কিন্তু সেই আবরণ প্রভাবহীন হয়ে যায়। এই প্রাণায়ামের একটা অন্য লাভ আছে—

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।। ৫৩।।

প্রাণায়াম হলে মনে ধারণ করার যোগ্যতা চলে আসে। আজ আপনি ধ্যানকালে রূপ ধারণ করার প্রয়াস করছেন অথবা মনকে নামে নিযুক্ত করছেন, কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরই আপনি বুঝতে পারেন যে নাম অথবা রূপচিন্তা কোনটাই মনে নেই। মনে ধারণ করার ক্ষমতার অভাব দেখা যায়; কিন্তু প্রাণায়াম সিদ্ধ হলেই মনে ধারণ করার যোগ্যতা চলে আসে যার ফলে নাম, রূপ অথবা যোগ-সাধনার যে কোন অঙ্গে মন স্থির সহজে হয়। এর থেকে উন্নত স্তর হল 'প্রত্যাহার'—

স্वবিষয়াসম্প্রযোগে চিত্তস্বরূপানুকার
ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।।৫৪।।

যখন ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব বিষয়ের সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে চিত্তের স্বরূপে তৎস্বরূপ হয়, তাকেই প্রত্যাহার বলে।

এতে লাভ? —এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ।। ৫৫।।

সেই প্রত্যাহারের ফলে ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করা সম্ভব হয়। অতএব প্রত্যাহারের অভ্যাস ততক্ষণ করা উচিৎ যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তমরূপে বশীভূত না হয়। যখন ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তমরূপে বশীভূত হয়, মনে ভাল-মন্দ কোনরূপ সঙ্কল্প উদয় হয় না, এই অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষকে জিতেন্দ্রিয় বলা হয়।

এইপ্রকার দ্বিতীয়পাদ 'সাধন পাদ' এখানেই সম্পূর্ণ হল।

নিষ্কর্ষ—

সাধনপাদ—এ মহর্ষি বলেছেন যে, সাধনা শুরু কোথা থেকে হয়? একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে ইষ্টের অনুরূপ গড়ে তোলাই তপস্যা এবং স্বাধ্যায়—নিজের অধ্যয়ন, যে, বৃত্তিতে যোগ-বিধি কতটা পালন করতে পেরেছি এবং কত ত্রুটি থেকে গেল? —এইপ্রকার অধ্যয়ন করে অগ্রসর হলে যোগ-ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

এই যোগক্রিয়ার প্রভাবে ক্লেশ ক্ষীণ হয়, 'তনু'—বলহীন হয় এবং সমাধির ভাব পরিণত হয়, যে-যে ক্লেশ ক্ষীণ হয় সেগুলির নাম হল—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। এগুলিই পাঁচটি ক্লেশ। এই পাঁচটি ক্লেশই যখন ক্রিয়াশীল থাকে না তখন প্রসুপ্ত, কখনও 'তনু'—বলহীন, কখনও 'বিচ্ছিন্ন'—যেন কখনও ছিল না এবং কখনও উদার অবস্থাতে থাকে। একটি ক্লেশ উদার হলে অপরটি বিচ্ছিন্ন বলে বোধ হয় যদিও তা পূর্বের ন্যায় থাকে। এই সমস্ত ক্লেশের আধার হল অবিদ্যা। অনিত্যকে নিত্য, অপবিত্রকে পবিত্র, দুঃখকে সুখ, অনাত্মাকে আত্মা বলে স্বীকার করা অর্থাৎ অসত্যে সত্যের প্রতীতি হওয়া অবিদ্যা। প্রকৃতি এবং পুরুষ, দৃক-শক্তি এবং দর্শন শক্তি এই দুটির এক হওয়া অস্মিতা। রামচরিতমানসে উল্লেখ করা হয়েছে—

জড় চেতনহি গ্রন্থি পরি গই। জদপি মৃষা ছুটত কঠিনই।।
(মানস, ৭।১১৬খ।২)

সুখবোধ এর অন্তরালে থাকে রাগ নামক ক্লেশ। সুখ প্রাপ্তি হলে রাগ উৎপন্ন হবে। দুঃখবোধ এর অন্তরালে থাকে দ্বেষ নামক ক্লেশ। যে বস্তু অথবা ব্যক্তির জন্য মনে দুঃখ উৎপন্ন হবে তার প্রতি দ্বেষ অবশ্য উৎপন্ন হবে। যা স্বভাবতই চলে আসছে, যা মূঢ়গণের ন্যায় বিবেকসম্পন্ন পুরুষদের মধ্যেও বিদ্যমান, সেই অভিনিবেশ অর্থাৎ পূর্ব-নিবাসের প্রতি মমত্ব, যা আমাদের নিবাস-স্থান নয়। কিন্তু আমরা সেটাকে নিজের বলেই চিন্তা করি—এটা অন্তিম ক্লেশ। প্রকৃতির অন্তর্গত জীবন যদ্যপি আমাদের নয়, তথাপি অনাদিকাল থেকে এর মাঝেই থাকার জন্য তার প্রতি আকর্ষণ হল অভিনিবেশ। জীবের শুদ্ধ নিবাস তো পরমাত্মাতে। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা বলহীন এবং সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত এই ক্লেশগুলি নাশ করা উচিৎ।

ক্লেশের সঙ্গে সংযুক্ত বৃত্তিগুলি ধ্যান দ্বারা শান্ত হয়। এই ক্লেশগুলি নাশ করা প্রয়োজন; কারণ এই কর্ম-সংস্কারের পরিণাম জন্ম, পুনর্জন্ম, আয়ু এবং ভোগ আবর্তমান থাকে। এইরূপ সংস্কার পুণ্য এবং পাপকর্মের জন্য প্রারব্ধরূপে হর্ষ এবং শোকরূপ ফল প্রদান করে। যে সংস্কার হর্ষ উৎপন্ন করে সেগুলিও দুঃখেরই রূপ। জন্মগ্রহণ করতে হবে। গুণ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ক্রমে সাত্ত্বিক গুণ তামসিক গুণে যখনই পরিবর্তিত হবে, এই আহ্লাদ শোকে পরিবর্তিত হবে। সেইজন্য প্রায় সকল কর্ম বিবেকসম্পন্ন পুরুষের জন্য দুঃখরূপ। এগুলি ত্যাগ করা উচিৎ। যে দুঃখ এখনও আসেনি, আসবে, সেই দুঃখ নাশ করা উচিৎ। এগুলি নাশ কিরূপে হবে? দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই 'হেয়হেতুঃ'—হেয়-এর সাধন। বাস্তবে ঈশ্বর-প্রণিধান হলে ঈশ্বর কিরূপে যোগক্ষেম করে, কিরূপে দৃশ্য প্রসারিত করে, একে সংযোগ বলে। সেই দৃশ্য নাম, রূপ অথবা যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অনুষ্ঠানকে সঠিক দিশা নির্দেশ করে। তা না হলে ক্লেশ নাশ হয়ই না। সেই দৃশ্য এবং দ্রষ্টার মিলন হল সংযোগ। এই মিলনই হেয়-এর সাধন। তিনি দৃশ্যের স্বরূপ বলেছেন যা, প্রকাশ ক্রিয়া এবং স্থিতির স্বভাব যুক্ত। জ্যোতির্ময় প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তি, প্রাপ্তির ক্রিয়াকালে আপনার অবস্থা কিরূপ? —এই স্থিতি বোধ করানো, পুরুষের জন্য ভোগ এবং মুক্তির সম্পাদন করাই যার প্রয়োজন। এই দৃশ্য জীবিত প্রাণী এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই স্বরূপ প্রকট করে। এই দৃশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত নেই; কারণ এটা দ্রষ্টার সংসর্গে সঞ্চালিত। দৃশ্য চারটি রূপে প্রসারিত হয়—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গ এবং অলিঙ্গ। **'পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ'** দৃশ্য বলে যে বিশেষের পরিবেশে আপনার স্তর কি? অবিশেষ হল প্রকৃতি। দৃশ্যের মাধ্যমে সঙ্কেত পাওয়া যায় যে, প্রকৃতিতে আপনি কি পরিমাণ

মুগ্ধ। কখনও এই দৃশ্য মূর্তরূপে (লিঙ্গ রূপে) প্রকট হয় এবং কখনও ভগবান অমূর্ত হয়ে বুঝিয়ে দেন। এর কয়েকটি রূপ হল আকাশবাণী, অঙ্গ-স্পন্দন ইত্যাদি।

দ্রষ্টা আত্মা চেতন, জ্ঞানস্বরূপ এবং স্বভাবে সর্বথা শুদ্ধ, নির্বিকার; কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির অনুসারে দেখে। বুদ্ধিতে বৃত্তিগুলির যেরূপ প্রবাহ সেই অনুসারেই দৃশ্য প্রসারিত করে। দ্রষ্টার জন্যই দৃশ্যের প্রয়োগ হয়। কিন্তু যে পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গরূপ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে সেই পুরুষের জন্য এই সংযোগের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়, তা সত্ত্বেও এর নাশ হয় না, অন্য সাধারণ ব্যক্তিদের পথ প্রদর্শনের জন্য এর প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের হিতের জন্য এই জ্ঞানের সূত্রপাত সেই মহাপুরুষের মাধ্যমে হতে থাকে।

এই 'সংযোগ' কাকে বলে? **'স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধি হেতুঃ সংযোগঃ।' (২।২৩)** স্বশক্তি অর্থাৎ দৃশ্য, যা মোক্ষ প্রদান করে এবং স্বামি শক্তি পুরুষ—এই দুইয়ের স্বরূপের উপলব্ধি সংযোগ। এই দুটি একসঙ্গে কার্য করবে, আমি লাভ করব, আমার সঙ্গে এ দুটির যোগাযোগ ঘটবে—এই দুইয়ের সঙ্গে মিলনকে সংযোগ বলে। এই সংযোগ ব্যতীত সাধনা জাগ্রতই হয় না।

সংযোগের কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা নাশ হলে সংযোগও নাশ হয়। এটাই 'হান'। পুনর্জন্মাদি দুঃখের অত্যন্ত অভাব। এটাই চেতন আত্মার কৈবল্য পদ। গুরুদেব বলতেন—**'হানি হো জিসসে চৌরাসী'** অর্থাৎ ডিম্বজ, দেহজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—এই চারটিরূপে প্রসারিত অনন্ত সৃষ্টির অন্ত হওয়া, ভব-বন্ধন কেটে যাওয়া হল 'হান'। এই হান বিবেকের দ্বারা লাভ হয়। বিবেক-জ্ঞান-এর সময় সাধনা জ্ঞানের সাতটি ভূমিকা অতিক্রম করে। সাতটিতে দক্ষতা লাভ হলে অশুদ্ধির নাশ হয় এবং জ্ঞানের প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ে।

যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা বিবেক জ্ঞান-এর প্রাপ্তি হয়, এর আটটি অঙ্গ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। যমের সংখ্যা পাঁচটি—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। সতত অভ্যাস দ্বারা দেশ, কাল এবং জন্মাদির সীমার উর্ধ্বে উঠলেই এই যম সার্বভৌমিক এবং মহাব্রত হয়ে যায়। চিন্তন দ্বারা বৃত্তিগুলির একপ্রকার থেকে অন্যপ্রকারে পরিবর্তন এবং উৎকর্ষ হল জন্ম-পরিবর্তন। উৎকর্ষ যে স্তর পর্যন্ত ভবিষ্যতে সেইরূপ জন্ম হয়। জন্ম-পরিবর্তন হলে যমগুলি পালনে ব্যবধান উৎপন্ন হয় না তখন সেগুলি মহাব্রত হয়ে যায়। যম সিদ্ধ হলে নাম, রূপ যে কোন স্থানে চিত্তকে চিন্তনে নিযুক্ত করলে তৎক্ষণাৎ সুরত (মনের দৃষ্টি) স্থির হয়। গ্রীষ্ম-শীত এই যমগুলি পালনে বাধা দিতে পারে না। যম যখন এই অবরোধগুলি দ্বারা বাধিত হয় না তখন এর উর্ধ্বে উঠলে সার্বভৌমিক হয়।

যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ 'নিয়ম'—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-শরণাগতির সমাহার। বিতর্ক অর্থাৎ বিজাতীয় তর্ক এই নিয়মগুলি পালনে বাধা দেয়। এর নিবারণের জন্য বিতর্কের বিরোধী ভাবের সঙ্কল্প করা উচিৎ। যম এবং নিয়ম পালন করলে ভজনাতে শান্ত, স্থির সুখপূর্বক বসার ক্ষমতা চলে আসে, এটা যোগের তৃতীয় অঙ্গ 'আসন'। যোগাসনের নাম করে সমাজে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ব্যায়াম শেখানো হচ্ছে। এই ব্যায়ামের সঙ্গে যোগের কোন সম্বন্ধ নেই। যোগসম্মত আসন যম-নিয়ম পালন সহজ হওয়ার জন্য সেগুলি পালনে প্রযত্নের শিথিলতা এবং পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত করলে সম্পন্ন হয়। যদি বাহ্য শারীরিক ব্যায়ামই আসন হত তবে পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত করার কি প্রয়োজন ছিল?

আসন সিদ্ধ হলেই দ্বন্দ্বের আঘাত লাগে না। এরপর প্রকৃতিতে এমন কিছুই নেই, যা সাধককে বিচলিত করতে পারে। রাগ-দ্বেষ-এর দ্বন্দ্ব সাধকের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আসনের পরিপক্ক অবস্থাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ হওয়া প্রাণায়াম। আসন করা হয়েছিল এবং অবস্থা প্রকট হল প্রাণায়ামের! যখন আসনে সুখপূর্বক সুরত (মনের দৃষ্টি) স্থির হয়, সেই সময় প্রশ্বাস যা আমরা গ্রহণ করি (সজাতীয় প্রবৃত্তি-অক্লিষ্ট বৃত্তি) এবং নিঃশ্বাস (যা আমরা ত্যাগ করি, বিজাতীয় প্রবৃত্তি—ক্লিষ্ট বৃত্তি) দুটিই নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্বাস একটি নির্ধারিত আয়ামে (নাম অথবা রূপে) প্রবাহিত হয়— এরই নাম প্রাণায়াম। যম-নিয়ম পালন দ্বারা আসনের অবস্থা লাভ হয় এবং আসন সিদ্ধ হলেই প্রাণায়ামের স্থিতি প্রকট হয়। চারটি ক্রমোন্নত সোপান প্রাণায়ামের ।বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি, স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা দেখা হয় যা দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হতে থাকে। বাহ্যবৃত্তি প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আভ্যন্তরবৃত্তি ঈশ্বর পথে যোগ-সাধনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-এর বিশ্লেষণ করে। চিন্তন বাহ্যবৃত্তির হলে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি কোন স্থানে কতক্ষণ পর্যন্ত বিচরণ করল, সেখান থেকে আকর্ষণ করে স্তম্ভবৃত্তিতে নিযুক্ত করুন। এইপ্রকার আভ্যন্তরবৃত্তিতে বিচরণকারী চিত্ত বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম কোন স্থানে কতক্ষণ পর্যন্ত থাকল, সংখ্যা দ্বারা জানার চেষ্টা করুন এবং সেখান থেকে আকর্ষণ করে স্তম্ভবৃত্তিতে নিযুক্ত করুন। এই প্রকার নিরীক্ষণ করা হলে এমন এক স্তর আসে যে, '**বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।' (২।৫১)**—বাহ্য এবং আন্তরিক বিষয়গুলি সর্বথা নিরুদ্ধ হওয়াই হল চতুর্থ প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পরমাত্মা এবং সাধকের মাঝের বৃত্তির আবরণ ক্ষীণ হয়ে যায়, ঈশ্বর প্রতিভাসিত হন। মনে স্বরূপ ধারণ করার ক্ষমতা চলে

আসে। প্রারম্ভিক অবস্থাতে সাধকের মন নাম অথবা রূপে স্থির হয় না। প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে এই চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়। নাম অথবা রূপ যেখানে চাইবেন, সেখানেই মনকে স্থির করতে সমর্থ হবেন।

যোগের পঞ্চম স্তর হল 'প্রত্যাহার'। বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হলে ইন্দ্রিয়সমূহ চিত্তের সঙ্গে অভিন্ন হয়, একেই প্রত্যাহার বলে। যে-যে বিষয়ে ইন্দ্রিয়সমূহ লিপ্ত ছিল। সেই বিষয়গুলি প্রভাবহীন হয়। প্রত্যাহার সিদ্ধ হলে ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ এই অবস্থাযুক্ত হন।

এই প্রকার মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রণীত যোগ দর্শনের দ্বিতীয় পাদ 'সাধনপাদ' সম্পূর্ণ হল, এতে যোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে পাঁচটি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার) অঙ্গের নিরূপণ এই পাদে করা হয়েছে। বাকী তিনটি অঙ্গ-ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির নিরূপণ মহর্ষি তৃতীয় পাদ বিভূতিপাদের অন্তর্গত করেছেন কারণ লক্ষ্য পরমাত্মাকে ধারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বর প্রেরিত বিভূতিগুলি ধ্যান এবং সমাধি স্তরেও প্রকট হতে থাকে, যথাস্থানে এর উল্লেখ করা হবে।

।। ওঁ ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

তৃতীয় অধ্যায়—বিভূতিপাদ

যোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে প্রথম পাঁচটির বর্ণন দ্বিতীয়পাদ সাধন পাদে করা হয়েছে। শেষ তিনটি অঙ্গ ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির বর্ণন এই তৃতীয় পাদ বিভূতিপাদে করা হয়েছে। প্রথম পাঁচটিকে বহিরঙ্গ সাধন বলা হয় যা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরোক্ষরূপে সহায়তা করে। অন্তিম তিনটি অঙ্গ ধারণা, ধ্যান এবং সমাধিকে অন্তরঙ্গ বলা হয় কিন্তু নির্বীজ সমাধির সন্দর্ভে এই তিনটিও বহিরঙ্গ; কারণ এই তিনটির অভাবেই নির্বীজ সমাধি সম্ভব। ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি—এই তিনটি অভ্যাস দ্বারা একমাত্র লক্ষ্যে স্থির হয়। তখন একে সংযম বলা হয়, যা যোগের পারিভাষিক শব্দ। এই সংযমের সঙ্গে-সঙ্গে বিভূতিগুলি প্রকট হয়। এই বিভূতিপাদে তিনটি শব্দের স্থানে অধিকাংশ সূত্রে 'সংযম' শব্দই প্রয়োগ করা হয়েছে।

ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি—এগুলি যোগের ক্রমোন্নত অবস্থা। এই তিনটির অভ্যাস হল সংযম এবং সংযম দ্বারা অনেক বিভূতি দৃষ্টিগোচর হয়, সেইজন্য এই তিনটির বর্ণনা বিভূতিপাদে করা হয়েছে। বিভূতি ঈশ্বর প্রেরিত ঐশ্বর্য অথবা অলৌকিক ক্ষমতা, যা যোগের এই অঙ্গগুলির অভ্যাসকালে মহাপুরুষ লাভ করেন। রামচরিত মানসে ভগবান শিবের বিভূতিগুলির উল্লেখ আছে—

সুকৃতি সম্ভু তন বিমল বিভূতী। মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী।।
(বালকান্ড, মঙ্গলাচরণ, চৌপাই)

পুণ্যাত্মা শিবের দেহ নির্মল বিভূতিযুক্ত; যেমন—অবঢরদানী, দানে উদারতা—যাকে ইচ্ছা তাকে তাকে উদ্ধার, সর্বজ্ঞতা **'সতীঁ জো কীহ্ন চরিত সবু জানা।' (মানস, ১।৫৫।২)** এই বিভূতিগুলি গুরু মহারাজকে ভক্তি করার ফলস্বরূপ লাভ হয়।

সংসারে সর্বপ্রথম অবতরিত অপৌরুষেয় বাণী গীতা শাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।।(১০।৪০)

শত্রুদের সন্তাপপ্রদানকারী অর্জুন! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই। সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করলাম। বস্তুতঃ সে সকল অনন্ত। যেমন—জ্যোতি সমূহের মধ্যে আমি প্রকাশমান সূর্য। পৃথিবীর শক্তি আমি। আকাশের ব্যাপকতা আমি; আমি বৃষ্ণীবংশে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, ঋষিগণের মধ্যে সনকাদি

ইত্যাদি। এইপ্রকার সংক্ষেপে দশম অধ্যায়ে বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে; কারণ এর পরের অধ্যায়েই অর্জুন সে সমস্ত দেখতে চেয়েছেন, কারণ প্রত্যক্ষ দর্শনের পরই বিভূতিগুলির সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানা যায়।

কাকভুশুণ্ডি ঈশ্বরকে দর্শন করেছিলেন। তাঁর উদরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন তখন **'উদর মাঝ সুনু অণ্ডজ রায়া। দেখেউঁ বহু ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া।।' (মানস, ৭।৭৯খ।২)**—তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন। **'প্রতি ব্রহ্মাণ্ড রাম অবতারা।' (মানস, ৭।৮০।৮)**—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবতার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিছু দর্শন এরূপ হয়েছিল— **'জো নহিঁ দেখা নহিঁ সুনা, জো মনহুঁ ন সমাই। সো সব অদ্ভূত দেখেউঁ, বরনি কবন বিধি জাই।।' (মানস, ৭।৮০ ক)**—কখনও দর্শন, শ্রবণ হয়নি, বোধগম্যও হচ্ছিল না, অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। **'লোক-লোক প্রতি ভিন্ন বিধাতা। ভিন্ন বিষ্ণু সিব মনু দিসিত্রাতা।।' (মানস। ৭।৮০খ।১); দসরথ কৌশল্যা সুনু তাতা। বিবিধ রূপ ভরতাদিক ভ্রাতা।। (মানস। ৭।৮০খ।৪); ভিন্ন ভিন্ন ম্যায় দীখ সবু, অতি বিচিত্র হরিজান। অগনিত ভুবন ফিরেউঁ, প্রভু, রাম ন দেখেউঁ আন।। (মানস। ৭।৮১ক)** ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশকে কখনও বৃদ্ধ, কখনও যুবারূপে দেখলাম, শুধু পরমাত্মা রামকে একরকমের দেখলাম। অর্থাৎ চিন্তন একমাত্র পরমাত্মার এবং সেই পরমাত্মার চিন্তনের অন্তরালে এই বিভূতিগুলি ফলপ্রসূ হয়।

যখন সন্ত কবীরের সমক্ষে এই দৃশ্য উপস্থিত হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন—

দেখি দেখি জিয় অচরজ হোই।
ইয়হ্ পদ বুঝে বিরলা কোই।।

ধরতী উলটি অকাসহিঁ জাই।
চীঁটী কে মুখ হস্তি সমাই।।

সূখে সরবর উঠে হিলোরা।
বিন জল চকবা করে কিলোলা।।

বৈঠা পণ্ডিত পঢ়ে পুরানা।
বিন দেখে কা করৈ বখানা।। (সবদ, ১০১)

কবীর অত্যদ্ভূত দেখেছিলেন, আশ্চর্য দেখেছিলেন, এবং **'জো নহিঁ দেখা নহিঁ সুনা, জো মনহুঁ ন সমাই।'** একই ব্যাপার এটা। প্রত্যেক মহাপুরুষের সমক্ষে এই বিভূতিগুলি প্রকট হয়; কিন্তু অন্তর্চিন্তনে ধারণা, ধ্যান, সমাধির অবস্থার পরেই এগুলি প্রকট হয়। এখন প্রস্তুত 'ধারণা'—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।। ১।।

কোন এক স্থানে চিত্তকে নিযুক্ত করা ধারণা। চিত্তকে যেখানে স্থির করা হবে, সেই লক্ষ্যকে ধারণ করে থাকা হল ধারণা। যোগ পথে নাম, রূপ ধারণ করার প্রধানতঃ দুটি দেশ অথবা স্থান রয়েছে। সাধনার প্রারম্ভিক স্তরে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এই ব্রতগুলি পালন করতে হয়। অবস্থা উন্নত হলে শুধু নামে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ সুরত অর্থাৎ মনের দৃষ্টি নিযুক্ত থাকা উচিৎ। এই ধারণাই 'ধ্যানে পরিবর্তিত হয়—'

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।। ২।।

যেখানে চিত্তকে নিযুক্ত করা হবে, সেখানে বৃত্তি একরকম প্রবাহিত থাকবে, ধ্যান খন্ডিত হবে না, একেই ধ্যান বলে।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন, ''হো! চিন্তন তৈল-ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে হতে থাকবে, শ্বাস বাঁশের ন্যায় সোজা হবে, ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ... অন্য কোন বিকল্পে মন ছুটবে না, এই প্রকার চিন্তনে বৃত্তি অবিচ্ছিন্নভাবে নিযুক্ত থাকলে একেই ধ্যান বলে।" এর মাঝে একটা বিকল্পও যদি আসে তবে ধ্যান খণ্ডিত হবে। ধ্যানকালে ধ্যাতা এবং ধ্যেয়—এর দ্বৈত থাকে, ধ্যানের অভ্যাসের চেতনতা থাকে না। ধ্যান সূক্ষ্ম হতে-হতে যখন শুধু ধ্যেয়ই প্রকাশিত থাকে, তখন 'সমাধি'-এর অবস্থা লাভ হয়—

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।। ৩।।

যখন শুধু ধ্যেয়মাত্রের প্রতীতি থাকবে এবং চিত্তের নিজ স্বরূপ শূন্য হয়ে যাবে, তখন সেই ধ্যানই সমাধিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

এটাই সন্ত কবীর বলেছেন **'সুরত সমানী শব্দ মে, তাহি কাল না খায়।'** মনের দৃষ্টিকে সুরত বলে। সুরত (মনের দৃষ্টি) শব্দে সমাহিত হবে। চিত্তের নিজ স্বরূপ শূন্য হয়ে যাবে, যাঁকে ধ্যানে দেখছে সেই ধ্যেয়মাত্র থাকবে একেই সমাধি বলে। **'সম আদি স সমাধিঃ', 'সম্যকধীয়তে চিত্তে যস্মিন্ স সমাধিঃ'** আদি তত্ত্ব পরমাত্মার সমান অবস্থা লাভ করার যোগ্যতা চলে আসে; চিত্তকে যেখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল, চিত্ত যখন তৎস্বরূপ হয়, তখন সমাধি হয়।

ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি তিনটি সাধনের সামূহিক নাম 'সংযম'—

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।। ৪।।

এক ধ্যেয়-এর ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি হওয়া সংযম। ধারণা, ধ্যান এবং সমাধিকে উদ্দেশ্য করেই সংযম শব্দের প্রয়োগ করা হয়। আগে ধ্যেয়কে ধারণ করতে হবে। ধ্যানের স্থিতি অতিক্রম করতে হবে। শুধু ধ্যেয়-এর অনুভব হলে সমাধি হবে। এই প্রকার সংযম সিদ্ধ হয়। এই তিনটির প্রতিফলন সংযম।

সংযম সহজ হওয়ার পর এর প্রভাব দেখুন—

তজ্জয়াৎপ্রজ্ঞালোকঃ ।। ৫।।

সংযম সিদ্ধ হলেই বুদ্ধি জ্যোতির্ময় পরমাত্মার প্রকাশে প্রকাশিত হয়। '**প্রজ্ঞালোকঃ**'—প্রজ্ঞা অলৌকিকভাবে আয়ত্তে আসে।

এই সংযম হঠাৎ সিদ্ধ হয় না, ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হয়—

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।। ৬ ।।

সেই সংযমকে ক্রমানুযায়ী ভূমিতে প্রবৃত্ত করা উচিৎ। ধারণা ভূমি, ধ্যান ভূমি, সমাধি ভূমি, এইপ্রকার প্রবৃত্ত থাকলে ক্রমে ভূমিগুলি অতিক্রম করলে সংযম সিদ্ধ হয়।

এই সংযমের বিশেষত্ব বলছেন—

ত্রয়মন্তরঙ্গ পূর্বেভ্যঃ।। ৭।।

দ্বিতীয় পাদে যে পাঁচটি সাধন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেগুলি অপেক্ষা ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি সূক্ষ্ম, গভীর এবং অন্তরঙ্গ সাধন; তা সত্ত্বেও,

তদপি বহিরঙ্গ নির্বীজস্য।। ৮।।

অন্তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির বীজ তো বিদ্যমান অতএব নির্বীজ সমাধির তুলনাতে এই সাধন বহিরঙ্গই। বহিরঙ্গের আশয় প্রকৃতির অভিমুখে গমন নয় পরন্তু এটা সমাধির উপরের স্তর। নির্বীজ সমাধি অতি গভীরের স্তর।

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ।
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।।৯।।

ব্যুত্থান সংস্কার অর্থাৎ মনের চঞ্চলতার অভিভব অর্থাৎ চঞ্চলতা দূর হলে এবং নিরোধের সংস্কার প্রকট হলে চিত্ত নিরোধ সংস্কারে ওতপ্রোত হয় এটা চিত্তের নিরোধ-পরিণাম। এতে লাভ ?—

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ।। ১০।।

এই নিরোধ-সংস্কারের জোরে চিত্ত একদম '**প্রশান্তবাহিতা**'—প্রশান্ত প্রবাহিত হয়।

গীতাতে ভগবান বলেছেন—'**জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য**' অর্থাৎ যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন, চিত্তবৃত্তি শান্ত প্রবাহিত, সেই যোগীর মধ্যে, '**পরমাত্মা সমাহিতঃ**' (৬।৭)—পরমাত্মা সদা স্থিত। এটাই মহর্ষি পতঞ্জলিও এখানে বলছেন যে নিরোধ পরিণামের প্রভাবে চিত্তবৃত্তি প্রশান্তবাহিত হয়। মন্দ সঙ্কল্প তো নাশ হয়েই যায়, ভাল সঙ্কল্পও ওঠে না। চিত্ত উদ্বেগবিহীন হয়।

এই সমাধির পরিণাম দেখুন—

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।। ১১।।

সব রকমের বিষয়ে চিন্তা করে যে চিত্তবৃত্তি সেই বৃত্তি যখন শান্ত হয় এবং ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তন করার অবস্থা একাগ্রতা উদয় হওয়া চিত্তের সমাধি-পরিণাম। তার সমাধি উত্তম প্রকারের। তার পরের স্থিতির বর্ণনা করছেন—

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ।। ১২।।

বৃত্তিগুলি নিরোধ হওয়ার পর বিষয়গুলি উদিত হওয়া, শান্ত হওয়ার পর চিত্ত-এর ধ্যেয়-এর মধ্যে সমাহিত হওয়াকে সমাধি বলে। তদনন্তর যে বৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে গেছে এবং যে বৃত্তিগুলি উদয় হয়েছিল দু'প্রকারেরই বৃত্তি একরূপ ধারণ করে, সেটাই চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম। এই অবস্থাতে চিত্ত উত্তমরূপে একাগ্র থাকে, কোন বৃত্তি উদয়ও হয় না সেইজন্য বৃত্তিকে শান্ত করার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়।

এখন পর্যন্ত তিনটি পরিণাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—নিরোধ-পরিণাম (সংস্কারগুলির নিরোধ) সমাধি-পরিণাম (লক্ষ্যমাত্রের আভাস) এই দুটির পর শান্ত এবং উদিত বৃত্তিগুলি একরূপ হলে চিত্ত একাগ্রতাতে পরিণত হয়।

এখন চিত্তের সদৃশ্যই ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহের পরিণাম বলছেন—

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।। ১৩।।

নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতা এদেরই পরিণাম দ্বারা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে সম্পাদিত অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে সম্পন্ন ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম এবং অবস্থা-পরিণামের ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। যোগ দর্শনে মহর্ষি এখানে প্রথমবার ধর্মের নাম নিয়েছেন। যখন সংস্কার নিরোধ হয়েছে, চিত্তে একাগ্রতা-পরিণাম দেখা গেছে, তখন 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে—এটা ধর্ম-পরিণাম। যোগীর লক্ষণ কি, লক্ষণ প্রকট হওয়া—এটা লক্ষণ-পরিণাম। যোগের অবস্থা তাঁর মধ্যে উত্তমরূপে আনীত—এটা অবস্থা-পরিণাম। নিরোধ-পরিণাম, সমাধি-পরিণাম এবং একাগ্রতা-পরিণামের মাধ্যমে উক্ত তিনটিরও বর্ণনা করা হয়েছে। যোগের অবস্থা, লক্ষণ এবং ধর্ম প্রকটিত। ধর্ম কাকে বলে ? — এটা একটা প্রশ্ন।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী।। ১৪।।

শান্ত এবং উদিত বৃত্তিগুলির জন্য কোন দেশ নয় অর্থাৎ সেই বৃত্তিগুলি ব্যাপ্ত যে হবে তার জন্য কোন স্থানই নেই—ধর্মের এই অনুপাত যেখানে, সেই পুরুষই ধার্মিক।

অবিদ্যা নাশ, অস্মিতাদি, পুনর্জন্মাদি, জন্ম, আয়ু এবং ভোগের বৃত্তিগুলি এবং উদিত সমাধি-একাগ্রতা-পরিণাম ইত্যাদির '**অব্যপদেশ্য**'-ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য কোন শূন্যস্থান নেই। ধর্মের এইরূপ অনুপাত অর্থাৎ ধর্মের এই তুলনাত্মক অবস্থাতে পুরুষ ধর্মী অর্থাৎ ধর্মাত্মা হয়ে যায়। এই অনুপাতের নাম ধর্ম। তিনি ঈশ্বর লাভ করেন।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ।। ১৫।।

পরিণামের ভিন্নতার কারণ হল ক্রমের ভিন্নতা। একসঙ্গে সাধনা আরম্ভ করলেও কোন-কোন সাধক শীঘ্র লাভ করেন, আবার কারও দেরী হয়। নিরোধ-সমাধি-একাগ্রতা এবং ধর্ম-লক্ষণ-অবস্থা-পরিণাম সকলের মধ্যে সমান দেখা যায় না। এতে **'ক্রমান্যত্বম্'** ক্রমের ভিন্নতাই হল এর কারণ।

প্রথম পাদে উল্লিখিত আছে যে, একসঙ্গে এক অবস্থাযুক্ত সাধকগণ যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাদের প্রাপ্তিকালে ভিন্নতা দেখা যায়। ক্রমের ভিন্নতাই হল এর কারণ। সকলের চিত্তের অবস্থা একরকম নয়, এই অন্তরালের হেতু সেটাই। অনুভূতির উপলব্ধিতে শ্রদ্ধার স্তর পূর্বাপর পরিণামের কারণ হয়ে যায়। **শ্রদ্ধাবান্লভতেজ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। (গীতা, ৪।৩৯)**—শ্রদ্ধাবান্, সংযতেন্দ্রিয় এবং সেই তত্ত্বের পরায়ণ পুরুষই কৈবল্য জ্ঞান প্রাপ্ত করতে সমর্থ, যাকে এখানে নিরোধ-সমাধি একাগ্রতা; ধর্ম-লক্ষণ-অবস্থা-পরিণাম দ্বারা বলা হয়েছে।

সংযম সিদ্ধ হলে বিভূতিগুলি লাভ হয়। এখন তিন প্রকারের পরিণামের বর্ণনা করা হয়েছে অতএব এদের মধ্যে সর্বপ্রথম সংযম করার ফল সম্বন্ধে বলছেন—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।। ১৬।।

তিনটি পরিণামের মধ্যে সংযম সিদ্ধ হলে অতীত অর্থাৎ ভূতকাল এবং **'অনাগত'**—যা এখনও আসেনি, এইরূপ ভবিষ্যত অথবা ভবিতব্য সম্বন্ধে আগে থেকে জানা যায়।

আমাদের গুরু মহারাজ যে কোন ব্যক্তির অতীত এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে জানতেন। আমাদের সতীর্থ অগ্রজ স্বামী শ্রী ভগবানানন্দজী মহারাজের চার-পাঁচজন বালসখাও পূজ্য মহারাজশ্রীর শরণে গিয়েছিলেন। মহারাজজী তাদের বলেছিলেন, ''বাবা! তোমাদের মধ্যে সাধু হওয়ার সংস্কার নেই, অতএব ঘরে ফিরে যাও, নিজেদের কাজ মনোযোগ দিয়ে কর। হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে একজনের সংস্কার আছে।'' তাঁর কথা শুনে তাঁকে বাদ দিয়ে সকলেই চলে গিয়েছিল। মহারাজজী বলেছিলেন, ''বাবা! নাম তো গুলাবসিংহই ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যক্তি তুমি নও, সে ব্যক্তি অন্য কেউ।'' তাকেও মহারাজজী কোন রকমে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার দু'বছর পর আমি অনুসুইয়া আশ্রম পৌঁছেছিলাম। আশ্রমে আমার পৌঁছানোর পূর্বেই পূজ্যশ্রীকে ভগবান অনুভবে দেখিয়েছিলেন যে, একটি খরস্রোতা নদী, নদীর জল কিঞ্চিৎ কালো, নদীর তীরে একটি নবযুবক বসে-বসে কাঁদছে। পূজ্যশ্রী সেখানে এসে তাকে বলেছিলেন ''কাঁদছ কেন? জলে নামো, ওপারে চলে যাও। আমি তো রয়েছি! আমি দেখছি। ভয় পেয়ো না! এইভাবে সাঁতার কাটো। তাঁর কথা শুনে যুবকটি জলে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিল, সে যখন চার-পাঁচ

মিটার এগিয়ে গিয়েছিল তখন তাকে প্রোৎসাহিত করে মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘ব্যস বাবা ! এইভাবেই সাঁতার কাটতে থাক, ওপারে চলে যাবে।’’

প্রাতঃকালে গুরুদেব এই সঙ্কেতের উপর বিচার করেছিলেন যে, নদী হল ভব-সরিতা। যা অতি ভয়ঙ্কর। উত্তাল-তরঙ্গ একে অগাধ এবং অগম করে রেখেছে। এই ভব-সরিতা পার করার জন্য একটি যুবক ব্যাকুল হয়ে আছে। যার পথ-প্রদর্শন করতে হবে।

আমার উপর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজজী আমাকে চিনে ফেলেছিলেন এবং খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। সাধুসন্তদের প্রতি আমার মনে ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। সেই পর্যন্ত যতজন মহাত্মাদের দর্শন করেছিলাম, মহারাজজীকে সবথেকে বেশী ভালো লেগেছিল—ঘোর জঙ্গলে একাকী নিবাস, দেদীপ্যমান চেহারা, সৌম্য মূর্তি, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ! আমি ভক্তি ভরে প্রণাম করেছিলাম এবং একপাশে বসেছিলাম। মহারাজজী কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলার পর তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘সাধু হবে কি?’’ আমি ভেবেছিলাম অপরিচিত মহাত্মা; হ্যাঁ বললে কোথাও কোন কুরীতিতে না জড়িয়ে দেন। অতএব সাবধান হয়ে তাঁর প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলাম, টাল-বাহানা করেছিলাম যে, ‘‘মহারাজ! নিজের ভরসায় সাধু হবে, একথা কেউ বলতে পারে না।’’ এটুকু বলে আমি মহারাজজীর কাছ থেকে তফাতে গিয়ে বসেছিলাম যে, আরো কিছু জিজ্ঞাসা না করে বসেন। মহারাজজী নিকটে উপবিষ্ট ভক্তদের বলেছিলেন, ‘‘ছেলেটি এখনও এড়িয়ে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, একে এখানেই থাকতে হবে। আমি পথ প্রদর্শন করব।’’ আমি ভেবেছিলাম, এতদিন পর্যন্ত যত মহাপুরুষের দর্শন করেছি, এঁকে সব থেকে ভালো লেগেছে। এঁর কাছ থেকে অল্প বিস্তর সাধনা সম্বন্ধে জেনে, অন্য কোথাও চলে যাবো। কারণ ভজনা তো আমাকে করতে হবে, এখানে থাকি, অথবা অন্য কোথাও থাকি। এটা জানতাম না যে ভজনা করান গুরুদেব। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে থাকতে হয়েছিল। ভজনা জাগ্রত হয়েছিল এবং আজও গুরু মহারাজ শ্বাস নিয়ন্ত্রণে রেখে অষ্টপ্রহর সঙ্গে-সঙ্গেই রয়েছেন। সংযম সিদ্ধ হওয়ার পর মহাপুরুষের স্থিতি এটা। ত্রিকালদর্শী হওয়া তাঁর সহজ বিভূতি। এই প্রকার—

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ।
সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্।। ১৭।।

শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান এই তিনটির পরস্পর অধ্যাস হওয়ার জন্য মিশ্রণ হচ্ছে। এই বিষয়ে সংযম অভ্যাস করলে ‘**সর্বভূতরুতজ্ঞানম্**’—সকল প্রাণীর ভাষার জ্ঞাতা হওয়া সম্ভব হয়।

অনুসুইয়া আশ্রমে এইরূপ ঘটনা ঘটতেই থাকত। মহারাজজী প্রায়ই বলতেন যে এই বাঁদরটা এই বলছে, ঐ পাখিটি এই-এই বলছে। একবার একটি লোক মন্দাকিনী গঙ্গাতে স্নান করছিল। সেখানে তার পুঁটলি হারিয়ে গিয়েছিল, তার অদ্ভুত ঠেকেছিল ব্যাপারটা যে, কাউকে দেখছিও না, অথচ পুঁটলিও নেই? সেই পুঁটলিতে সরকারী কাগজ, কিছু টাকা, ঘড়ি ইত্যাদি ছিল, প্রায় এক ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর সে মহারাজজীর কাছে প্রার্থনা করেছিল যে, সরকার! পুঁটলিতে সরকারী কাগজ ছিল, আমার চাকরী যাবে। মহারাজজী দয়ার্দ্র হয়ে পড়েছিলেন, তিনি আসন থেকে উঠে একদিকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। কিছু দূরে বিস্তীর্ণ শিলাভূমির উপর এক বানর বসেছিল। মহারাজজী তার দিকে চেয়ে দেখেছিলেন তখন সে মাথা হেঁটে করে বলেছিল, 'ওঁ....।' মহারাজজী তাকে বলেছিলেন, ''দেখ রে! বানরটা ওখানে খুঁজতে বলছে।'' সেই লোকটি শিলাভূমির কাছে গিয়েছিল। তার কাছেই যে ঝোপ ছিল, সেই ঝোপে তার পুঁটলিটি পড়েছিল। পুঁটলিটি ছেঁড়া অবস্থাতে ছিল কিন্তু সব জিনিষ সেই পুঁটলির ভেতর ছিল।

একসময় গুরুদেব এক ভক্তের আমন্ত্রণে তার বাড়ি গিয়েছিলেন। তার বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা কুকুর গাঢ় নিদ্রাতেও ঘেউ-ঘেউ করছিল এবং মাঝে মাঝে পা নাড়ছিল। মহারাজজী বলেছিলেন—''কুকুরটা স্বপ্নে কাউকে তাড়াচ্ছে।'' ভক্তরা জিজ্ঞাসা করেছিল,''ভগবন্! কাকে তাড়াচ্ছে?'' মহারাজজী তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন তারপর বলেছিলেন, ''মনে হয় কাল এখানে ভান্ডারা হবে, খাবার খেয়ে এঁটো পাতা ফেলা হবে। উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়ার জন্য গরু, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি আসবে, এই কুকুরটি তাদেরই তাড়াচ্ছে। এ ভবিষ্যত দেখছে।''

সেই সময় সেখানে ভান্ডারা আয়োজন করার কথা কেউ ভাবেওনি। কথা চালাচালি হল শুধু। রাত্রিবেলা কয়েকজন, বড় ব্যবসায়ী মহারাজজীকে দর্শন করার জন্য এসেছিল। দর্শন করে তারা ফিরে গিয়েছিল। পরের দিন সকালবেলা কিছু লোক রাঁধুনিদের সঙ্গে হাতা, খুন্তী, তাওয়া, কড়াই, হাঁড়ী নিয়ে হাজির হয়েছিল। ভান্ডারার উপক্রম হয়েছিল। ভান্ডারা শেষ হওয়ার পর উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলা হয়েছিল। সকলেই দেখেছিল যে, সেই কুকুরটি গরুদের ঘেউ ঘেউ করে তাড়াবার চেষ্টা করছে। মহারাজজী সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, ''দেখ, কুকুরটি কিভাবে গরুদের তাড়াচ্ছে।'' সত্যিই সেখানে ভান্ডারা করা হয়েছিল। এটাই হল **'ভূতরুতজ্ঞানম্'**—প্রাণীদের ভাষার জ্ঞান হওয়া।

সতী ভগবান শিবকে বলেছিলেন, ''ভগবন্! আমি কোন পরীক্ষা নিইনি; আপনার মত আমিও তাঁকে প্রণাম করে নিয়েছি।'' শিবের মনে সন্দেহ উৎপন্ন

হয়েছিল। ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন এবং **"সতীঁ জো কীন্হ চরিত সবু জানা।" (মানস, ১।৫৫।২)**—সতীর কৃত্য ধরা পড়েছিল। ভগবান শিব দেখে নিয়েছিলেন যে, সতী, সীতার রূপ ধারণ করে পরীক্ষা নেওয়ার অপরাধ করেছে।

শব্দ, অর্থ এবং আশয় পৃথক্-পৃথক্ করার ক্ষমতা লাভ হলে এগুলি সংযত করলে সকল প্রাণীর আশয় ব্যক্ত হয়। কারও বাণী শুনে, বক্তাকে দেখে, বাণী ধারণ করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃত্তি একভাবে প্রবাহিত হয়। চিত্ত একাগ্র হয়, ধ্যেয় মাত্রের প্রতীতি থাকে। সমাধির স্থিতি চলে আসে। যেই তিনটি একত্রিত হয়, সংযম সিদ্ধ হয়। সেই সংযমের ফলে জানা যায় যে সেই বাণীর আশয় কি? এই সমস্ত ক্রিয়া এক দু'মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়; কারণ সংযম তার সিদ্ধ। এখন দেখুন, প্রকারান্তরে সংযম এবং বিভূতি—

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।। ১৮।।

সংযম দ্বারা সংস্কারগুলির সাক্ষাৎকার করলে পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জানা যায়।

প্রাণী নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যা কর্ম সম্পাদিত করে এবং বুদ্ধি দ্বারা যা কিছু চিন্তা করে, সে সব তার অন্তঃকরণে সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়। এই সংস্কার জন্ম-জন্মান্তর ধরে সংগ্রহীত হচ্ছে। এই সংস্কারগুলি সংযত করে সেগুলি প্রত্যক্ষ করে নিলে যোগী পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জানতে পারেন। যেরূপ নিজের সংস্কারগুলি সাক্ষাৎ করলে নিজের পূর্ব-পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জানা যায়। সেইরূপ অন্যের সংস্কারগুলি সংযত করলে তাদেরও পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জানা যায়।

আমাদের সতীর্থ স্বামী শিবানন্দজী পূজ্য মহারাজজীর শরণে গিয়েছিলেন, তৃতীয় দিন মহারাজজী তাঁকে সম্বোধিত করে বলেছিলেন, "দেখ, কয়েকজন্ম পূর্বে আমার-তোমার সম্বন্ধ ছিল, সেই সংস্কার তোমাকে এখানে বলপূর্বক নিয়ে এসেছে। তোমার মধ্যে ভজনা করার কোন লক্ষণ তো নেই, তা সত্ত্বেও সেবা করলে ভব সাগর অতিক্রম করবে।" মহাপুরুষ সংযম প্রয়োগ যেখানেই করবেন, সেখানের স্থিতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন যে, সংস্কারের স্থিতি কিরূপ। এইরূপ মহাপুরুষগণ দ্বারা সংযমের বিভিন্ন প্রয়োগের চর্চাতে বলছেন—

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।। ১৯।।

অন্যের চিত্তের সংযম দ্বারা সাক্ষাৎ করে নিলে তার চিত্তের জ্ঞান হয়। মহারাজজী বলতেন কারও চিত্তের স্থিতি জানতে হলে সেই ব্যক্তির রূপ হৃদয়ে ধারণ করে ধ্যানস্থ হয়ে যাও। তার অন্তরের খবর জানতে পারবে। এই বিভূতি মহাপুরুষগণের মধ্যে সহজেই চলে আসে।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।। ২০।।

কিন্তু সেই জ্ঞান গ্রহণ না করেই হয়; কারণ সেই বিষয় যোগীর চিত্তের নয়। যোগীর চিত্ত শান্ত প্রবাহিত থাকে এবং সামনের জনের চিত্ত বেগবান চঞ্চল। তিনি যখন কারও চিত্ত ধারণ করেন সেই সময় সেই ব্যক্তির চিত্তে কি প্রবাহিত, এটুকু বোঝা যায়। সেই চঞ্চল চিত্ত পরক্ষণেই না জানি কোথায় পৌঁছিয়ে দিত!

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ
প্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্।। ২১।।

দেহের রূপে সংযম করতে সক্ষম হলে যখন বৃত্তির গ্রহণ শক্তি নিরুদ্ধ করা হয়, তখন চক্ষুর প্রকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকার জন্য যোগী অন্তর্ধান হন।

দেহের অন্তরালে ভজনাতে মন রত হওয়া—এটাই সংযম। দেহের অন্তরালে যখন সংযম সিদ্ধ হয় তখন '**তদ্যগ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে**'—তখন তিনি অন্যের দৃষ্টিতে দেহের দৃশ্যতা-শক্তি রোধ করলে অন্যের নেত্রের প্রকাশন-শক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধ না থাকার জন্য যোগী অন্তর্ধান হন।

ধ্যানের প্রারম্ভিক অবস্থাতে তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুকে নাসাগ্রে দেখার অভ্যাস করেন, সেই বিন্দুটিকে দেখতে-দেখতে সুরত (মনের দৃষ্টি)কে অন্তরে পরিচালন করেন। ধ্যানকালে সুরত (মনের দৃষ্টি) অন্তর্মুখী হয় সেই অবস্থাতে চক্ষু উন্মীলিত থাকে কিন্তু কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না; কারণ আমরা চক্ষু দ্বারা দেখি না মনের ভিতরে যে চিন্তাধারা তাই চক্ষুর মাধ্যমে দর্শন করি। মনের যে চিন্তাধারা তা হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্যানে লীন হয়। ধ্যানের সময় যে ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলিত থাকে, তার মন ধ্যানে অধিক রত হয়। সেইজন্য চক্ষু বন্ধ করে ভজনা করার বিধান নেই। চক্ষু খোলা রেখে ভজনা করুন। যিনি বেশীক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে সমর্থ তাঁর ধ্যান গভীর হয়। মন চঞ্চল। চোখ খোলা থাকলেও মন ভজনা ছেড়ে পালাতে চায়; কিন্তু পালানোর সঙ্কল্প জানতে পারা যায়, এর নিবারণও হয়। এইরূপ মন বেশী স্থির হয়। ভগবান শিবের, ধ্যান-মুদ্রা দেখুন—চক্ষু অর্ধোন্মীলিত, অর্ধেক খোলা। সাধকদের এইরূপই করা উচিৎ।

সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ কর্ম।
তৎসংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা।। ২২।।

কর্ম দু'প্রকারের—'**সোপক্রমম্**'—উপক্রমসহিত এবং '**নিরুপক্রমম্**'—উপক্রমরহিত। গীতাশাস্ত্রে এদুটিকেই পুণ্যকর্ম এবং পাপকর্ম বলা হয়েছে। উপক্রমসহিত অর্থাৎ উপায় দ্বারা সম্পাদিত এবং বিনা উপায়ে সম্পাদিত। পুণ্যকর্ম পূর্ণতা প্রদান করে, এই কর্ম উপায়জন্য। উপক্রমরহিত বিনা উপায়ে সম্পাদিত পাপকর্ম অধোগতিতে নিয়ে যায়। এই দুটির স্থিতিতে সংযমের প্রভাব থাকলে, দুটি সংস্কারেরই স্থিতি বোধগম্য হলে যোগী মৃত্যু সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানতে পারেন।

এই সংস্কার কতদিন সক্রিয় থাকবে, কখন শান্ত হবে?—এ সম্বন্ধে জানা যায় এবং **'অরিষ্টেভ্যঃ'**— অরিষ্টগুলি থেকেও সাধক জানতে পারেন যে, বিপত্তিগুলির প্রবাহ কিরূপ? আরো কত কষ্ট ভোগ করা বাকী? সেগুলির ওঠা-নামা এবং সেগুলির প্রকোপ থেকেও জানা যায় যে, অন্তিম সংস্কারের বিলয় হতে এখন কত দেরী?

দেহের মৃত্যু হওয়া তো বস্ত্র-পরিবর্তন মাত্র, এটা মৃত্যু নয়। সেই মৃত্যুই প্রশংসনীয় যখন সেই আত্মাকে আর দেহধারণ করতে হয় না। সন্ত কবীর বলছেন যে, এই অবস্থা জীবিত অবস্থাতেই অর্জন করা সম্ভব।

জীবত মে মরনা ভলা, মরৈ জো জানে কোয়।
মরনে সে পহলে মরে, অজর অমর সো হোয়।।

জা মরনে সে জগ ডরৈ, সো মেরো আনন্দ।
কব মরিহোঁ কব পাইহোঁ, পূরন পরমানন্দ।।

মন মরা মায়া মরী, হংসা বেপরওয়াহ।
জাকা কছু ন চাহিয়ে, সোই শাহন্‌শাহ।।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ।। ২৩।।

সংসারে কোথাও মিত্রতা হয় না। যা প্রতীত হয় তা পারস্পরিক ব্যবহার। কদাচিৎ আপনি কারও সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করার প্রয়াস করলেন তখন হতে পারে তার বিকার আপনার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে অথবা আপনার বিকার তার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। জীবের প্রতি করুণার সঞ্চার হতে পারে; কিন্তু যতদূর প্রশ্ন মৈত্রীর, আদি শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, **'কঃ শত্রুবে সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি, তান্যেব মিত্রাণি জিতানি যানি।'** —সংসারে কে শত্রু? স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহ! এই ইন্দ্রিয়সমূহ যখন সংযত হয় তখন এই ইন্দ্রিয়সমূহই মিত্রতাপূর্ণ আচরণ করে, পরম কল্যাণ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ইন্দ্রিয়সমূহকেই জয় করার উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, ''অর্জুন! আত্মাই শত্রু এবং আত্মাই মিত্র।'' কিরূপে? যাঁরা মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছেন, তাঁদের জন্য তাঁদেরই আত্মা মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করে এবং যাঁরা মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেননি তাঁদের আত্মা তাঁদের সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করে, তাঁদের অধোগতি হয় এবং তাঁদের নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করে। অতএব মৈত্রী হল ইন্দ্রিয় সংযমের। মৈত্রী ইত্যাদি সংযমে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম সিদ্ধ হলে বল প্রাপ্ত হয়। সর্বোপরি বল আত্মস্থিতি, আত্মকল্যাণকারী বল লাভ হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে **'সক্রু মিত্র সুখ দুখ জগ মাহীঁ। মায়াকৃত পরমারথ নাহীঁ।।'** (মানস, ৪।৬।৯) **'সখা পরম পরমারথু এহু। মন ক্রম বচন রাম পদ নেহু।।'** (মানস, ২।৯২।৩)

বলেষু হস্তিবলাদীনি।। ২৪।।

বিভিন্ন বলের মধ্যে সংযম যেমন-যেমন উত্তরোত্তর সিদ্ধ হয়, সকল প্রকারের সামর্থ্যের বল লাভ হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

বলং বলবতাং চাহং কামরাগ বিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ।।(গীতা, ৭।১১)

বলবানগণের কামনা ও আসক্তিশূন্য বল আমি। সংসারে শাশ্বত বল কারও কাছে নেই। কাম (কামনা) এবং রাগ (প্রকৃতিতে আসক্তি)— এর ঊর্ধ্বে যে বল, ভগবান বলছেন যে, সেই বল আমি। যেমন-যেমন সংযম সিদ্ধ হয়, তেমন-তেমন সব প্রকারের ক্রমোন্নত সামর্থ্যের বোধ হয়। '**অপবল তপবল বাহুবল, চৌথো হ্যায় বল দাম।' 'সূর' কিশোর কৃপা তে সব বল, হারে কো হরি নাম।।**' তিনি হরি-কৃপার বল লাভ করেন।

পূর্বকালে 'হস্তি' বলের মাপকাঠি ছিল। ভীমের মধ্যে আশী হাজার হাতীর, দুঃশাসনের দশ হাজার এবং ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এক লক্ষ হাতীর বল ছিল। বর্তমানে 'হর্স পাওয়ার' বলের মাপকাঠি। এই প্রকার সাধনার প্রত্যেক স্তরের বল উত্তরোত্তর উপলব্ধ হতে থাকে।

প্রবৃত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।। ২৫।।

বিভূতিপাদেরই পঞ্চম সূত্রে মহর্ষি বলেছেন যে সংযম সিদ্ধ হলে '**প্রজ্ঞালোকঃ**'—বুদ্ধি অলৌকিক প্রকাশ ধারণ করতে সমর্থ হয়। ঠিক এই প্রকার সমাধি পাদের ষট্‌ত্রিংশৎ সূত্রে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির চর্চা আছে। এখানে মহর্ষি বলেছেন, '**প্রবৃত্যালোকঃ**' —প্রবৃত্তিও অলৌকিক জ্যোতি সম্পন্ন হয়। এই আলোক ন্যাস করলে '**সূক্ষ্মব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট জ্ঞানম্**'—সূক্ষ্ম, ব্যবধানযুক্ত এবং দূর দেশে কোথাও স্থিত বস্তুর জ্ঞান হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতে চীন আক্রমণ করেছিল। পূজ্য মহারাজজী অনুসুইয়াতে ভক্তদের বলেছিলেন, ''হো, চীন হিমালয় অতিক্রম করেছে এবং ভারতে আক্রমণ করেছে। এখন কি হচ্ছে, কেউ আমাকেও খবর দিত!'' এক ভক্ত মহারাজজীকে একটি রেডিয়ো অর্পিত করেছিল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''কেন রে! লোকে বলে যে, লোহার যন্ত্র?'' ভক্তটি বলেছিল, ''সরকার! এটা রেডিয়ো। আপনাকে সব খবর অবগত করাবে।'' ঐ অঞ্চলে সেই সময় রেডিয়োর প্রচার-প্রসার ছিল না।

একটা নিশ্চিত সময়ে রেডিয়ো থেকে খবর প্রসারিত হত। খবর শুনে মহারাজজী চিন্তিত হয়ে উঠতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজজী ক্ষুণ্ণ মনে বসেছিলেন। হঠাৎ

তিনি বলে উঠেছিলেন, ‘‘আগামীকাল শেষ হবে। কাল যুদ্ধ সমাপ্ত হবে। ভগবান এক্ষুনি দেখালেন যে আমি ঐ বরফের পাহাড়ে ছিলিম হাতে নিয়ে বসে রয়েছি। কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আমিই ঘোষণা করছি যে, ব্যস, অনেক হয়েছে। বন্ধ কর এসব। এই রেখার ওপারে চীন এবং এইপারে ভারতের অধিকার।’’

পরের দিন প্রাতঃকালে খবর প্রসারিত হয়েছিল যে, যুদ্ধ-বন্ধ হয়েছে। যুদ্ধ-বন্ধ হওয়া সামান্য ঘটনা। স্বপ্নে যা কিছু হোক শোনা যেতে পারে; কিন্তু সেখানের বাতাবরণ, যার চর্চা একদিন পূর্বেই করেছিলেন, পাহাড়ী দৃশ্য, বরফে ঢাকা পাহাড়—এ সমস্তই গুরুদেব অনুসুইয়াতে বসে-বসে দর্শন করেছিলেন।

রামচরিতমানসে উল্লিখিত আছে, ‘**জথা সুঅঞ্জন অঞ্জি দৃগ সাধক সিদ্ধ সুজান। কৌতুক দেখত সৈল বন ভূতল ভূরি নিধান।।**’ **(১ ১)**—গুরু মহারাজজীর চরণ-রজ মৃদু অঞ্জন তুল্য। সেই অঞ্জনে হৃদয়ের নেত্রের উন্মীলন হয়। তিনি নির্জনে শান্ত পরিবেশে থেকেও যে কোন স্থানের কোন কৃত্য দেখতে সমর্থ হন।

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।। ২৬।।

সূর্যে সংযম সিদ্ধ করলে সকল লোকের জ্ঞান হয়।

‘ভুবন’ যৌগিক শব্দ। শ্রীরামচরিত মানসে তিনটি ভুবন (ত্রিভুবন), চোদ্দোটি ভুবন এবং অসংখ্য ভুবনের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ দশটি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার) জীবের বৃত্তিগুলি টেকার এই চোদ্দোটি স্থানই চোদ্দোটি ভুবন। এগুলির অসংখ্য প্রবৃত্তি হল অসংখ্য ভুবন। এই চতুর্দশ স্থানে ভূত প্রাণীগণের যখন শরণস্থান থাকে তখন এটাই চোদ্দোটি অধিভূত, ভূতগণের জন্ম-মৃত্যুর কারণ এটা। সাধনার ফলস্বরূপ এই চোদ্দোটিতে দৈবী সম্পদ্ প্রবাহিত হয় তখন এটাই হল চোদ্দোটা অধিদৈব অর্থাৎ দৈবের অধিষ্ঠান হয়ে যায়। স্তর উন্নত হলে এটাই অধিআত্ম, আত্মার প্রসারণ কেন্দ্র হয়ে যায়। দর্শন, স্পর্শ এবং স্থিতি লাভ হওয়ার পর ভুবন সমাপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতি পুরুষত্বে বিলীন হয়ে যায়। সূর্যে সংযম সিদ্ধ হলে সকল ভুবনের জ্ঞান হয়। সূর্য জ্যোতির্ময় পরমাত্মার প্রতীক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন যে, (উত্তরায়ণে যাঁরা দেহ ত্যাগ করেন, তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।) সূর্যের পথে যাঁরা পরলোক গমন করেছেন তাঁদের প্রত্যাবর্তন হয় না। এটাই মহর্ষি পতঞ্জলিও বলতে চাইছেন যে, চিন্তন যখন শুধু ভগবানের হয় তখন ‘**ভুবনজ্ঞানম্**’—ভুবনগুলি সম্বন্ধে জানা যায়। কোন্ ভুবনে কোথায় আমাদের আসক্তি ? ভূত কত পরিমাণ, দৈব কত পরিমাণ, আত্মার আধিপত্য কতটা বিস্তার লাভ করেছে—এই সমস্তের জ্ঞান হয়। কদাচিৎ তা সূর্যস্তরের সংযম না হলে তখন ? এই প্রসঙ্গে বলছেন —

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্।। ২৭।।

চন্দ্রমাতে সংযম সিদ্ধ করলে তারার সৃষ্টির জ্ঞান হয়।

এই জগতই রাত্রিস্বরূপ। **'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।' (গীতা, ২।৬৯)** জগতরূপ রাত্রিতে সকলেই অচৈতন্য। এখানে সংযমী পুরুষ সচেতন হন। এই জগতরূপ রাত্রিতে তিনি পরমাত্মার ক্ষীণ প্রকাশ লাভ করেন এবং **'তারাব্যূহজ্ঞানম্'**—তারার স্থিতির জ্ঞান হয় যে, চিত্তবৃত্তির তার, সূত্র, এগুলির গতি কোন্-কোন্ স্থানে? গ্রন্থি স্থান কোথায়? এর ব্যূহ সম্বন্ধে জানা যায়।

এখন দেখুন সাধনাতে স্থির হওয়ার পরিণাম—

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্।। ২৮।।

ধ্রুব তারাতে সংযম স্থির করলে তারার গতির জ্ঞান হয়।

স্তম্ভবৃত্তির পরিপক্ক অবস্থাতে যখন সুরত (মনের দৃষ্টি) অচল স্থির হয় **'তদ্গতি জ্ঞানম'**—সেই তারা সমূহের গতি সম্বন্ধে জানা যায় যে, চিত্তবৃত্তির বেগ কিরূপ? কখনও চিত্ত অচল স্থির হয়, কখনও উদ্বেগ উৎপন্ন হয়। এখন কিরূপ চিন্তা উঠবে, চিন্তা জাগার পূর্বেই তা জানা যায় সেইজন্য উদ্বেগ জাগার পূর্বেই তা শান্ত হয়ে যায়। এই সমস্ত ব্যাপার চিদাকাশেই ঘটে।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্।। ২৯।।

সংযম দ্বারা নাভিচক্র ধৃত হয় তখন **'কায়ব্যূহজ্ঞানম্'**—দেহের স্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে জানা যায়।

নাভি হল কেন্দ্রের প্রতীক। বৃত্তি সংযত হয়ে যখন নিজের উদ্গমে স্থিত হয় তখন **'কায়ব্যূহজ্ঞানম্'**—বারংবার কায়া—সৃষ্টির কারণ কি, আর ক'টা দেহধারণ করতে হবে? —এটা জানা যায়। বুদ্ধ পূর্বের কয়েকশো জন্ম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। গুরু মহারাজ যে পূর্বে সাতজন্ম ধরে সাধু ছিলেন তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। জড়ভরত মৃগ-যোনিতেও জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাকভুশুণ্ডি হাজার-হাজার জন্ম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। সংযম এই স্তরে পৌঁছালে জানা যায় যে, আর কতবার দেহধারণ করতে হবে, কিরূপ হবে?

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ।। ৩০।।

কণ্ঠকূপে সংযম সিদ্ধ হলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাবোধ নিবৃত্ত হয়।

যখন কণ্ঠে পরমাত্মার নাম ভিন্ন কিছু থাকে না, ধ্যান পরমাত্মাতে স্থির থাকে তখন সমস্ত আশা, তৃষ্ণা এবং বাসনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়। শ্রীরামচরিতমানসে উল্লিখিত আছে যে ভগবান রাম বিশ্বামিত্রের আশ্রমে পৌঁছেছিলেন তখন মহর্ষি তাঁকে অধিকারী রূপে চিনেছিলেন এবং তাঁকে বিদ্যা প্রদান করেছিলেন। **জাতে লাগ ন ছুধা পিপাসা।**

অতুলিত বল তনু তেজ প্রকাসা।। (১।২০৮খ।৪) এত প্রভাবশালী মন্ত্র সম্বন্ধে তিনি জানতেন কিন্তু এই মন্ত্র গ্রহণ করার পর যখন তিনি জনকপুর পৌঁছেছিলেন, সেখানে রাম তো মুখ্য অতিথিই ছিলেন, সেখানে উত্তম আহার্যের ব্যবস্থা ছিল। রইলেন গুরুদেব বিশ্বামিত্র! তিনিও **'করি ভোজনু মুনিবর বিজ্ঞানী। লগে কহন কছু কথা পুরানী।।' (১।২৩৬।৩)**—আগে বিধিপূর্বক ভোজন গ্রহণ করেছিলেন তৎপশ্চাৎ প্রাচীন কাহিনী বলতে শুরু করেছিলেন। মন্ত্রের প্রভাব দেখা যাচ্ছে না, যেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ হবে না।

বস্তুতঃ এটা রামচরিতমানস। রামের সেই চরিত্র, যা মনে প্রবাহিত। এর মধ্যে আছেন বিজ্ঞানরূপ রাম এবং বিশ্বাসরূপ বিশ্বামিত্র। বিজ্ঞান, বিনা তারের জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব। বিশ্বাস যখন অনুভবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন বিদ্যা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেয়। অতুলনীয় শক্তি হলেন পরমাত্মা, সাধক তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হন তারপর তাঁর কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা—পিপাসা থাকে না, সাধক চিরকালের জন্য তৃপ্ত হন।

পরমাত্মাতে সুরত (মনের দৃষ্টি) স্থির হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ সমাপ্ত হয়। এই কারণেই মহারাজজীর সাধনকালে দু'তিনদিনের উপবাস তাঁর জন্য সামান্য ঘটনা ছিল। সাতদিন উপবাস, চোদ্দোদিন উপবাস করলেও মহারাজজীর মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছাপ দেখা যেত না। চোদ্দো দিন উপবাস করার পর বেশী গরমের জন্য লঘুশঙ্কাতে রক্তের ন্যায় কিছু দেখে পূজ্যশ্রী ভগবানকেও কিছু কটু কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইষ্টদেব হয়ে বসে রয়েছেন। ঘোর জঙ্গলে নিয়ে এসে বসিয়ে দিয়েছো, যেখানে কিছু খাবারও নেই এবং পান করারও নেই। এখন তো রক্তপাতই হচ্ছে, দু'চারদিনে দেহপাতও হবে। দেহটাই থাকবে না তাহলে কে ভজনা করবে। সেদিন ভগবান বলেছিলেন, "ঠিক আছে, খেতেই চাইছ তবে কাল থেকে খেয়ো।" পরের দিন থেকে অযাচিতভাবে খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মহারাজজী বিচার করতে শুরু করেছিলেন যে, ভগবান রুক্ষভাবে কেন বললেন যে, খেতে চাইছ তবে কাল থেকে খেয়ো। ভগবান কি চাইছিলেন? ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন, "যদি একুশ দিন পর্যন্ত অন্নগ্রহণ না করতে তবে জীবনে আর ভোজন গ্রহণ করার প্রয়োজনই হত না। এইভাবেই বসে থাকতে, মুখমণ্ডলে কুঞ্চন, পর্যন্ত দেখা যেত না।" এর তাৎপর্য হল যখন সংযম কণ্ঠকূপে সিদ্ধ হয় তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করার ক্ষমতা সাধকের মধ্যে চলে আসে।

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্।। ৩১।।

কূর্ম নাড়ীতে সংযম সিদ্ধ হলে স্থিরতা চলে আসে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রাণের সংবাহিকা মুখ্য নাড়ীকে 'কূর্ম নাড়ী' সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত

করা হয়েছে। প্রাণবায়ুতে ব্যক্তি শুধু শ্বাসগ্রহণ করে না পরন্তু এর সঙ্গে বায়ুমণ্ডল থেকে সঙ্কল্পও গ্রহণ করে। শ্বাসের সঙ্গে যে সঙ্কল্পগুলি অন্তরে প্রবেশ করে সেই সঙ্কল্পগুলি সংযত করে নিলে যোগী সঙ্কল্পগুলির অতীত হন, পুনরায় কোন সঙ্কল্প তার মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে না এর ফলে চিন্তন ধারাবাহিকভাবে হয়। মহর্ষি নামের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপিত করে এখানে কূর্মের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিঞ্চিৎ শব্দ পেয়েই কচ্ছপ ঘাড়, পা ইত্যাদি অঙ্গগুলিকে গুটিয়ে নেয়, সাধকও বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে অন্তর্মুখী করে নেন।

গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কূর্মের উদাহরণ প্রস্তুত করেছেন—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। (গীতা, ২।৫৮)

কচ্ছপ যেমন নিজ অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ এই পুরুষ যখন চারিদিক থেকে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়। বিপদ দূর হলেই কচ্ছপ নিজ অঙ্গসমূহ পুনরায় প্রসারিত করে—স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষও কি সেইপ্রকার বিষয়ে অনুরক্ত হন? ভগবান এই প্রসঙ্গে বলেছেন।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।। (গীতা, ২।৫৯)

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পুরুষগণ বিষয়ভোগ গ্রহণ করেন না, তাঁরা বিষয় থেকে নিবৃত্ত হন; কারণ তাঁরা গ্রহণ করেন না, কিন্তু বিষয়ের প্রতি তাঁদের আসক্তি দূর হয় না। এইরূপ যোগীর আসক্তি '**পরং দৃষ্ট্বা**'—পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে নিবৃত্ত হয়। কূর্ম নাড়ীতে সংযমের প্রভাব এটা। মহর্ষি পতঞ্জলিও এ বিষয়ে তাই বলছেন।

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।। ৩২।।

মস্তকের জ্যোতিতে সংযম সিদ্ধ হলে সিদ্ধ পুরুষগণের দর্শন হয়।

মূর্ধা মস্তিষ্ক অথবা মস্তককে বলে, যেখান থেকে সঙ্কল্প-বিকল্প উদয় হয়। সেখানে উত্তমরূপে সংযম সিদ্ধ হলে '**সিদ্ধদর্শনম্**'—সমস্ত সিদ্ধগণের দর্শন হয়। এই সিদ্ধ পুরুষগণের সিদ্ধত্ব কি? তাঁদের মধ্যে যে পরমতত্ত্ব সঞ্চারিত সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার, সিদ্ধ হওয়াই সর্বোপরি সিদ্ধি।

গীতাশাস্ত্রেও এই সংযমের উল্লেখ আছে—

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।। (গীতা, ৮।১২)

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে অর্থাৎ বাসনা থেকে পৃথক্ অবস্থান করে মন হৃদয়ে স্থিত করে, প্রাণ অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্যাপারকে '**মূর্ধ্ন্যাধায়**' —মস্তিষ্কে নিরুদ্ধ করে ওঁ

কেবল যা অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, এর জপ এবং আমাকে স্মরণ (ধ্যান) করতে-করতে যে পুরুষ '**ত্যজন্ দেহং**'—দেহাধ্যাস ত্যাগ করেন, সেই পুরুষ, পরমগতি লাভ করেন।

মহর্ষি পতঞ্জলিরও এটাই অভিপ্রায় যে, মূর্ধাতে স্থিত জ্যোতিতে সংযম সিদ্ধ করলে সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন হয়। অর্থাৎ নৈষ্ঠিকীম্ সিদ্ধি পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে জানাকে বলে। ঐ পথের ছোট-বড় সিদ্ধির স্তরও তিনি অতিক্রম করেন।

প্রাতিভাদ্বা সর্বম্।। ৩৩।।

প্রাতিভ জ্ঞান উৎপন্ন হলে যোগী সংযম ছাড়াই সমস্ত বিষয় জানতে পারেন।

পরমাত্মার নির্দেশে সঞ্চালিত জ্ঞানকে প্রাতিভ বলে। প্রাতিভ জ্ঞান লাভ হলে কোন প্রয়াস ছাড়াই সহজেই সব কিছুর জ্ঞাতা হওয়া যায়। আগন্তুক আশ্রমে পৌঁছানোর পূর্বেই পূজ্য মহারাজজী তার সম্বন্ধে বলে দিতেন।

কখনও-কখনও মহারাজজী আপনমনে বলে উঠতেন—"হুঁ এখন আসছেন। আবর্জনা নিয়ে শ্বশুরালয় থেকে। এদের বসাবার ব্যবস্থা কর, খাবারের ব্যবস্থা কর! হাল দাও, হাল চালনাকারী দাও, খনন করার জন্য অস্ত্র দাও।" আমরা ভাবতাম, মহারাজজী কাকে কটু কথা শোনাচ্ছেন? কিছুক্ষণের মধ্যেই চার-ছ'জন সাধুবেশধারী ব্যক্তিদের দেখতে পেতাম। মহারাজজী বলতেন, "মনে হয় ধানরোপণের কাজ সারা হয়ে গেছে। এখন ধুতির পশ্চাদভাগকে খুলে সেটাকে আঁচল বানিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তীর্থ দর্শনে।" কিছু লোক বকুনি খেয়ে পালিয়ে যেত; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তারা দর্শন করার জন্য পৌঁছে যেত তখন মহারাজজী তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে দিতেন।

কখনও-কখনও মহারাজজী সঙ্কেত পেতেন যে, কোন উচ্চস্তরের মহাত্মা আসছেন। আমাদের সকলকে সজাগ করে দিতেন যে, "দেখতে থাক। বেরিয়ে না যান। কোন উচ্চস্তরের মহাপুরুষ আসছেন।" এরই মধ্যে বিক্ষিপ্তের ন্যায় কাউকে দেখতে পেতাম, পূজ্যশ্রী বলতেন—"ইনিই সেই মহাত্মা! এঁকে সসম্মানে নিয়ে এসো, এঁর সেবা কর।" নিজের আসনের কাছেই বসবার আসন দিতেন। কুশল জিজ্ঞাসা করতেন এবং বিচরণ স্থান সম্বন্ধে জানতে চাইতেন। এইপ্রকার তাঁদের বার্তালাপের মাঝে সৎপ্রসঙ্গের সূক্ষ্ম দিক্‌গুলির সম্বন্ধে জানার সৌভাগ্য আমরাও লাভ করতাম। মহারাজজী সেখানে বসেই সবরকমের খবর সম্বন্ধে জানতে পারতেন। এটা প্রাতিভা জ্ঞানেরই প্রভাব ছিল।

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ।। ৩৪।।

হৃদয়ে সংযম সিদ্ধ হলে চিত্তের স্বরূপের জ্ঞান হয়। সেই সময় চিত্তের স্বরূপ কত সূক্ষ্ম, নির্মল অথবা কতটা বিকৃত—এটা স্পষ্ট জানা যায়। এইরূপ চিত্তে কোন

প্রকারের উদ্বেগ উৎপন্ন হয় না এবং সাধনাতেও কোন পরিবর্তন আসে না। সেইজন্য যা কিছু আছে, সব প্রত্যক্ষীকৃত হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তা সংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থাৎস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্।। ৩৫।।

সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রসারিত প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। এর 'অবিশেষ প্রত্যয়' অর্থাৎ মিলন সদৃশ হওয়া ভোগ, জীবের গমনাগমনের কারণ। পরার্থ যা পরম ধনকে লাভ করার ক্রমোন্নত যোগ বিধি এর দ্বারা স্ব-অর্থ (স্বার্থ) অর্থাৎ আত্মিক সম্পদে সংযম করলে পুরুষ জ্ঞান লাভ করেন। পরম পুরুষ কেবল আত্মা, সেই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের দর্শন হয়, এর বিশেষত্ব সম্বন্ধে জানা যায়।

ভজনা করার বিধি সেই নির্ধারিত বিধি। অভ্যাস করতে হবে সেই প্রণব, ওম জপ, সদ্‌গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান, অষ্টাঙ্গ যোগের নিয়মানুযায়ী পালন, সংযম স্বরূপের স্থিতি পর্যন্ত যত রকমের সাধনা রয়েছে সেগুলির নাম পরার্থ-বিদ্যা। এই পরার্থ সাধনের দ্বারা যিনি স্বার্থ সিদ্ধি করে নেন, স্বার্থে সংযম অভ্যাস করলে '**পুরুষজ্ঞানম্**'—পরম পুরুষ পরমাত্মার জ্ঞান হয়। এই অবস্থাতে দ্রষ্টার স্বীয় স্বরূপে স্থিত হওয়াই বাকী থাকে।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে।। ৩৬।।

সেই স্বার্থ-সংযম সিদ্ধ হলেই কয়েকটি সিদ্ধিলাভ হয়;

যেমন—

১. **প্রাতিভ**—পরমাত্মার নির্দেশে সঞ্চালিত জ্ঞান, যার ফলে কোন প্রয়াস (সংযম) ছাড়াই যোগী সহজেই সমস্ত কিছু বসে-বসে জানতে পারেন ?

২. **শ্রাবণ**—যোগী দূরের ধ্বনিগুলিও শুনতে সমর্থ হন। তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় দিব্য হয়ে যায়। তিনি দিব্য ধ্বনিই শ্রবণ করেন।

৩. **বেদন**-যোগীর স্পর্শ-জ্ঞানও দিব্য হয়ে যায়।

৪. **আদর্শ**—তিনি দিব্যরূপ দর্শন করার ক্ষমতা লাভ করেন।

৫. **আস্বাদ**—যোগী ব্রহ্ম-পীযূষ পান করেন। জাগতিক রসে কোন স্বাদ পান না।

৬.**বার্তা**—'বর্তি' শব্দে অন্ প্রত্যয় প্রযুক্ত করলে 'বার্ত' শব্দের উৎপত্তি হয়। এরই বহুবচন 'বার্তা'। বর্তি হয় সুগন্ধযুক্ত। এইরূপ যোগীর মধ্যেও দিব্যগন্ধ অনুভব করার ক্ষমতা চলে আসে।

এই সিদ্ধাইগুলির প্রাদুর্ভাব হলে যোগীকে তাতে অনুরক্ত হওয়া উচিৎ নয়। তার দৃষ্টি লক্ষ্যে স্থির থাকা উচিৎ। সিদ্ধাই করতলগত হলে সাধনাতে রত থাকার উৎসাহ পাওয়া যায়। এগুলি এই পথের সুবিধা। এতে মত্ত হয়ে সাধককে নিজের গন্তব্য ভোলা উচিৎ নয়। সেইজন্য মহর্ষি সতর্ক করেছেন—

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ।। ৩৭।।

উক্ত ছয় প্রকারের সিদ্ধি সমাধি সিদ্ধিতে, কৈবল্য প্রাপ্তিতে বিঘ্নস্বরূপ, সম এবং আদি তত্ত্ব পরমাত্মাতে প্রবেশের পথে ব্যবধান এগুলি। এ সমস্তই যোগ পথের বিভূতি। শোভাস্বরূপ; কিন্তু যে সাধকের দৃষ্টি লক্ষ্যে তিনি এগুলির দিকে চেয়েও দেখেন না। সাধক এ সমস্ত বিভূতি লাভ করেনই, তাঁর মধ্যে এগুলি প্রকট হওয়াও উচিৎ, এর ফলে সাধকের উৎসাহবর্ধন হয়; কিন্তু সাধক, এগুলিকেই উপলব্ধি মনে করে এগুলি ভোগ করতে ব্যস্ত হলে এই সিদ্ধিই কৈবল্য প্রাপ্তিতে সেই প্রকার বাধক যে প্রকার কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি। অতএব সাধকের দৃষ্টি সদৈব লক্ষ্যে থাকা উচিৎ। এরই সঙ্গে—

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎপ্রচারসংবেদনাচ্চ
চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।।৩৮।।

বন্ধনের কারণগুলির (কর্ম এবং তজ্জনিত সংস্কার) শিথিলতা থেকে এবং '**প্রচারসংবেদনাৎ**'— চিত্তের শান্ত প্রবাহিত অবস্থার জ্ঞান হলে চিত্তের অন্যের দেহে প্রবেশ সম্ভব। এইরূপ চিত্তের দ্বারা কারও স্বরূপ ধৃত করে তার মনে যে সঙ্কল্প-বিকল্প উঠছে তা জানা সম্ভব হয়। এই প্রয়োগ পূজ্য গুরু মহারাজ প্রায়ঃ করতেই থাকতেন। কেউ অনুসুইয়া আশ্রমে পৌঁছালে তিনি গুনগুন করে গাইতেন, '**কাম রূপ কেহি কারণ আয়া।**' তিনি ধ্যানের দ্বারা তক্ষুণি দেখে নিতেন এবং বলেও দিতেন, ''ভন্ড কোথাকার! বক ধার্মিক। ধূর্ত কোথাকার!'' সংযমের একটা স্তরে পৌঁছালে এসব জানা সম্ভব হয়। অন্যের দেহকে চিন্তন দ্বারা ধারণ করলে, ধ্যান গভীর হলে, সমাধিতে সুরত (মনের দৃষ্টি) স্থির হলে, সংযম সিদ্ধ হলে, সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা কিরূপ তা জানা যায়।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককন্টকাদিষ্বসঙ্গউৎক্রান্তিশ্চ।। ৩৯।।

উদান বায়ু নিয়ন্ত্রিত হলে যোগীর দেহ জল, পঙ্ক, কণ্টকাদিতে লিপ্ত হয় না। তার ঊর্ধ্ব গতি হয়।

উদান বায়ুর ক্ষেত্র হল কণ্ঠ থেকে শির পর্যন্ত, যা ঊর্ধ্বে গমন করে। যা জীবকে পাপ-পুণ্য কর্মের অনুসারে ভাল-মন্দ যোনিতে নিক্ষেপ করে। এই স্থানে সংযম সিদ্ধ হলে যোগী সংসার-সমুদ্রের বিষয়-বারি থেকে নির্লিপ্ত থাকে। কাম, ক্রোধাদি ষড়বিকারের শূল তাকে ব্যথিত করতে পারে না। তার গতি প্রকৃতির দিকে অধোমুখী না হয়ে পরমাত্মার দিকে উর্ধ্বরেতা হয়।

এক স্থানে সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছিল। যেমন সৎসঙ্গে প্রায়ই হয়, শ্রোতাগণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বক্তা মহাত্মা বলে উঠেছিলেন—সৎসঙ্গে ফুলের বৃষ্টি

হয়, সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মিষ্টি গন্ধে ঘুম চলে আসে। নাচ-গানের আসরে ঘুম পায় না; কারণ সেখানে কণ্টক বৃষ্টি হয়—কখনও লোভ, কখনও রাগ, কখনও দ্বেষ, কখনও বাসনার। **‘তে সব সূল নাম কো জানা।’** শূলের সংখ্যা অসংখ্য। সেসব থেকে নির্লিপ্ত থাকার ক্ষমতা মহাপুরুষ লাভ করেন।

‘লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।’ গীতা (৫।১০) ভগবান বলেছেন যে, যেরূপ পদ্মপাতার উপর তরঙ্গ রাত দিন যাওয়া-আসা করে কিন্তু পাতা জল অথবা পাঁকে লিপ্ত হয় না, এইপ্রকার মহাপুরুষের উপর বিকারগুলির প্রভাব পড়ে না।

সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ।। ৪০।।

সমান বায়ুকে সংযম দ্বারা সিদ্ধ করে নিলে যোগীর দেহ দীপ্তিমান্ হয়ে যায়। পরমাত্মা জ্যোতির্ময়, তাঁর তেজ যোগীর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়।

হৃদয় থেকে নাভি পর্যন্ত সমান বায়ুর স্থান। চিত্তবৃত্তি হল একপ্রকার বায়ুমণ্ডল। যখন সংযম দ্বারা একে সম প্রবাহিত করা সম্ভব হয় তখন যোগী ভাল মন্দ উদ্বেগ দ্বারা বিচলিত হন না, ঈশ্বরীয় তেজ এর দীপ্তি প্রতিভাত হয়।

পূজ্য গুরু মহারাজজী বলতেন, ‘হো! আমার দেহটা কালো-কালো কেমন যেন ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়েছে, দেহটাই অন্যরকম হয়ে গেছে।’

অবধপুরী প্রভু আবত জানী। ভই সকল সোভা কৈ খানী। (মানস, ৭।২খ।৫) এই দেহটা অবধ। এতে অবধ্য স্থিতির সূত্রপাত হয়। এই মনুষ্য দেহে যখন ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয় তখন এই দেহটা সমস্ত শোভার খনি হয়ে যায়। জীব শ্রেণীর স্বভাব তিরোহিত হয়, ঈশ্বরীয় বায়ুমণ্ডল—প্রভুর বিভূতিগুলির দ্বারা জীব যুক্ত হয়। চিত্ত শান্ত সম প্রবাহিত হয়। এই সমতাতে সংযম সিদ্ধ হলে চিত্তে উদ্বেগ উৎপন্ন হয় না, ‘**জ্বলনম**্’-পরমাত্মার জ্যোতির্ময় স্বরূপের প্রভাব প্রকাশ তার মধ্যে প্রতিভাত হয়। যোগীর দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্ দিব্যং শ্রোত্রম্।। ৪১।।

শ্রোত্র অর্থাৎ কান এবং আকাশের সম্বন্ধ সংযম করতে সমর্থ হলে যোগীর শ্রোত্র দিব্য হয়ে যায়।

সংযমের একটা স্তরে শ্রবণেন্দ্রিয় এত বেশী উন্নত হয়ে যায় যে আকাশে ধ্বনিত শব্দ গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে যায়। শ্রোত্র শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের নাম নয়। বধির ব্যক্তিও ঈশ্বরকে লাভ করতে পারেন। যে শক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়কে শোনার জন্য প্রেরিত করে তাতে দিব্যভাবের সঞ্চার হয়। এমন এক অবস্থা আসে যে, ‘**বিন বাজা ঝঙ্কার উঠে তহঁ, সমুঝি পড়ে জব ধ্যান ধরে।**’ প্রকৃতির কোন ধ্বনি অথবা সঙ্গীত-লহরী সেই যোগীকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাঁর শ্রোত্র দিব্য ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্।। ৪২।।

'কায়াকাশয়োঃ'—দেহ এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করতে সমর্থ হলে **'লঘুতূলসমাপত্তেঃ'**—দেহ কার্পাসের সদৃশ ভারহীন হয়ে যায় এবং আকাশেই সদা গতিশীল থাকার শক্তি চলে আসে। সুরত (মনের দৃষ্টি) আকাশবৎ হয়ে যায়, নিরন্তর নিযুক্ত থাকে। **'কোই অবকাস কি নভ বিনু পাবই।' (মানস, ৭।৮৯।৩)**—আকাশ এমন স্তর যেখানে মানুষ শান্তি খুঁজে পায়। চিদাকাশ এবং কায়াকাশে সংযম হল যোগপথের বিভূতি। এই ক্ষমতা লাভের পর দেহাধ্যাস মিটে যায়।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ।। ৪৩।।

সৃষ্টিতে দৃশ্য-শ্রব্য সমস্ত কিছুর মধ্যে কল্পনারহিত বৃত্তির প্রবাহিত হওয়া হল মহাবিদেহাবস্থা। সম্মুখে উপস্থিত কোন কিছুর প্রতি সঙ্কল্প-বিকল্প উৎপন্ন না হওয়া যে, এটা কি? —এই মহাবিদেহাবস্থা লাভ হলে প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়, দ্রষ্টা এবং সাধকের মাঝের আবরণ ক্ষীণ হয়। ভাল-মন্দ গ্রহণ করা ছিল আবরণ, এখন যদি গ্রহণই না করা হয় তবে আবরণ কোথা থেকে আসবে? বুদ্ধিতে আত্মার যতখানি প্রকাশ, যতটা বাকী, তা বোঝার বাধা এখন সমাপ্ত হয়।

গীতাতে ভগবান বলেছেন—

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।(৫।২১)

বাহ্য সংসারের বিষয়ভোগে অনাসক্ত পুরুষ অন্তরাত্মাতে স্থিত যে সুখ বিদ্যমান, সেই সুখলাভ করেন। এটাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলছেন যে, এর প্রকাশের আবরণ সমাপ্ত হয়ে যায়। বিচারশক্তির ঈশ্বরীয় প্রকাশ লাভের পথে যে বাধা, তা দূর হয়।

পরবর্তী সূত্রে বলছেন—

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ ভূতজয়ঃ।। ৪৪।।

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব—এই পাঁচ প্রকারের অবস্থাতে সংযম সিদ্ধ করলে **'ভূতজয়ঃ'**—সমস্ত ভূতগণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চলে আসে।

গীতাশাস্ত্রে কথিত আছে, **'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।'।। (১৮।৬১)** ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ভূত হল জীবিত প্রাণী। কিন্তু জীবিত প্রাণীদের মূল কারণভূত পঞ্চমহাভূত—আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি, জল এবং বায়ু; এদের পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এগুলি ভূতগণের স্থূল স্বরূপ। যেই ইন্দ্রিয়গুলি স্ব-স্ব বিষয় দর্শন করে তেমনই স্বরূপ প্রকট হয়। দৃশ্য দেখা—এটা স্থূল দর্শন। স্বরূপ স্পষ্ট হলেই এর সূক্ষ্ম অবস্থাগুলি সম্বন্ধে জানা যায়। এগুলির অন্বয়, এগুলিকে পৃথক্-পৃথক্ বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। অন্তিম অবস্থা হল অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ এর গুণবত্তা, প্রয়োজন বত্তা যে, বস্তু সজাতীয় অথবা বিজাতীয়। এর যে স্বরূপ

প্রকটিত, তা ক্লেশের দিকে নিয়ে যায়—সেইজন্য ক্লিষ্ট। যখন সংযম এই অবস্থাতে পৌঁছায় তখন পঞ্চভূতের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা লাভ হয় এই অবস্থাতে ভূতগণকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা চলে আসে। এই সংযম ক্রমে-ক্রমে হয়। স্থূল যখন দর্শন হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শোনা হয়ে যায়, স্থূলরূপ সম্মুখে চলে আসে, এর স্বরূপ কি, এর অন্তরে কত গভীরতা, সূক্ষ্মতা, বিশ্লেষণ, প্রয়োজন কি? —সেই প্রয়োজন বুঝে এবং জেনে যিনি প্রবৃত্ত হন তিনি সদৈব স্বরূপের দিকেই অগ্রসর হন। পঞ্চভূত নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ভূত থেকে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়ের গোচর যে কোন দৃশ্য যোগীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। এর সঙ্গে একটা বিশেষ লাভ হয়—

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ।। ৪৫।।

ভূত জয় হলে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি প্রকট হওয়া, কায়সম্পৎ-এর প্রাপ্তি এবং সেই ভূতের ধর্ম থেকে কোন বাধা না উৎপন্ন হওয়া—এই তিন প্রকারের যোগ্যতা চলে আসে। শাস্ত্রগুলিতে অণিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব এবং ঈশিত্ব অষ্টসিদ্ধি যোগের অষ্ট ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অষ্টধা মূল প্রকৃতিতে অষ্টসিদ্ধির সঞ্চার হয়।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর জ্ঞান হল 'অণিমা'। মহাপুরুষের শিশুতুল্য স্বভাব হল 'লঘিমা' এই সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কোন সেবাকে তুচ্ছ মনে করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এঁটো পাতা উঠাতে শুরু করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ নিজের এক রুগ্ন শিষ্যকে স্নান করিয়ে, ঔষুধ খাইয়েছিলেন। পূজ্য মহারাজজী ব্যথায় কাতর এক শিষ্যকে পা দিয়ে টিপতে শুরু করেছিলেন। সাধক সঙ্কুচিত হয়ে তাঁকে এরূপ না করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে, মহারাজ! আপনি স্পর্শ করবেন না", তিনি কিন্তু ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত দু'চারবার টিপে বলেছিলেন, "দেখবে! এবার সেরে উঠবে।" ব্যথা সেরে উঠেছিল। ঈশ্বরের মহিমা সাধকের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

সংযম সিদ্ধ হওয়ার পর দত্তাত্রেয়র মহিমা প্রচারিত হয়েছিল, তাঁর কাছে লোকের আসা-যাওয়া বেড়ে গেছিল, ভজন-চিন্তনে ব্যবধান উৎপন্ন হচ্ছিল সেইজন্য তিনি ভগবানের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে, এই ভীড় আমার পিছনে লেগেছে কেন? ভগবান বলেছিলেন, "আপনার হৃদয়ে আমি জাগ্রত হয়েছি, সেইজন্য লক্ষ্মী আপনার সেবা করতে চায়।" 'গরিমা' রূপে যোগীর গৌরবপূর্ণ অবস্থা চলে আসে। বিনা বাধাতে ইচ্ছিত পদার্থগুলির আপুর্তি হল 'প্রাকাম্য'। পূজ্য গুরুদেব মুম্বাই বিচরণকালে একদিন একটি ঠেলাগাড়িতে নারকেল দেখেছিলেন, দেখেই তাঁর মনে নারকেল খাওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল কিন্তু সঙ্গে পয়সা ছিল না সেইজন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি বৃক্ষতলে বসেছিলেন। এরই মধ্যে একটা কাক সেই ঠেলাগাড়ি থেকে একটা

নারকেল টুকরো তুলে সেই বৃক্ষের উপর এসে বসেছিল। খাওয়ার জন্য চঞ্চুপুট খুলতেই নারকেল টুকরোটি ঠিক মহারাজের সম্মুখে পতিত হয়েছিল। মহারাজ ভগবানের কাছ থেকে শুভ সঙ্কেত পেয়েছিলেন। তাঁর পেটের ডানদিক এবং ডান পা একসঙ্গে স্পন্দিত হয়েছিল, এর অর্থ হল তুলে খেয়ে নাও। **'জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ। হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ'।।' (মানস, ৭।১১৩খ।২)** সমস্ত ভাবের উপর প্রভুভাব হল 'ঈশিত্ব' যেরূপ গীতা শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের স্বভাব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—**'দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।'** (১৮।৪৩) মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সদা সর্বদার জন্য বশীভূত হওয়াকে 'বশিত্ব' বলে।

'তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ'—সেই ভূতগণের বিষয় শান্ত হয় সেইজন্য এই ধর্মে কোন প্রকার ব্যবধান উৎপন্ন হয় না। কায়সম্পতের স্বরূপ সূত্রকার স্বয়ং প্রস্তুত করেছেন—

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ।। ৪৬।।

রূপ, লাবণ্য, বল এবং বজ্রের সদৃশ গঠন—এগুলি দেহের সম্পদ্। সংযমের এই উচ্চস্তরে যোগীর দেহ কান্তিযুক্ত হয়ে যায়, শারীরিক সৌষ্ঠব চলে আসে। নিবৃত্তির পর মহাপুরুষের দেহে রোগ হয় না। এইরূপ যোগী অন্যের দেহ ব্যাধিমুক্ত করলে তবেই রুগ্ন হন অন্যথা কখনও নয়।

পুজ্য মহারাজজীর জীবনের একটি ঘটনা এই তথ্যই উদ্ঘাটিত করে। পূজ্য গুরুদেব আসনে বসেছিলেন। একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক পণ্ডিতমশাই আশ্রমে পৌঁছেছিলেন। তিনি প্রণাম করে একপাশে বসেছিলেন। তাঁর উপর দৃষ্টি পড়তেই গুরু মহারাজজী বলেছিলেন, ''পাণ্ডে! ভাল করেছ এসে। লুচি ছাঁকবে যাও।'' পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, ''মহারাজ! আমি তো ব্যথায় মরে যাচ্ছি। আমার হাত উঠছেই না। জানি না হাতে কি হয়েছে? দু'দিন ধরে ঘুম হচ্ছে না।''

মহারাজজী বলেছিলেন, ''দেখি হাত দেখা।'' তিনি তার হাত ধরে দু'চারবার তার হাত টিপে দেখেছিলেন তারপর বলেছিলেন—''বিভূতি খেয়ে নাও। এখন গিয়ে লুচি তৈরী কর।'' পাণ্ডেজী লুচি তৈরী করে সকলকে খাইয়েছিলেন এবং নিজেও প্রসাদ গ্রহণ করে চলে গিয়েছিলেন। এদিকে মহারাজের হাতে ব্যথা উঠেছিল। নবম দিনে ব্যথা এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল, দিনে রাতে এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। গরম জলে সেঁক নিলে কিছু আরামবোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন হাড়ের ভিতর থেকে ফোড়া বার হচ্ছে।

গুরুদেব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''নিবৃত্তি হয়ে গেছে, পাপের ফলভোগ করাও বাকী নেই, তবে এই অসহ্য ব্যথা পাচ্ছি কেন?'' ভগবান বলেছিলেন, 'পাণ্ডে ব্যথাতে এক বছর কষ্ট পেত। ওকে আপনি কষ্টমুক্ত করেছেন এখন অন্তত বারোদিন তো সহ্য করুন।' মহারাজজী বলেছিলেন, ''গুনে দেখ, কবে থেকে ফোড়া হয়েছে?''

শিষ্যরা গুনে বলেছিল আজ নবমদিন। মহারাজজী গুনে বলেছিলেন, ‘‘দশ, এগারো আর বারো! আরো তিনদিন বাকী।’’ দ্বাদশ দিনে ফোড়া ফেটে গিয়েছিল, ব্যথাও দূর হয়েছিল। এইরূপ কয়েকটি ঘটনার পর কেউ কষ্ট পেলেও মহারাজজী তাকে স্পর্শ করতেন না। শুধু ধুনী থেকে বিভূতি তুলে খেয়ে নিতে বলতেন। এতে রোগী সুস্থও হয়ে উঠত।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বযার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ।। ৪৭।।

গ্রহণ,স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব—এই পাঁচটি অবস্থাতে পৃথক্-পৃথক্ ভাবে সংযম সিদ্ধ করলে মন এবং সকল ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হয়।

ইন্দ্রিয়সমূহের কাজ হল গ্রহণ করা। চক্ষু দর্শন করে, গ্রহণ করে, শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করে গ্রহণ করে। রসনার স্বাদবোধ হল রসনার গ্রহণ। নাসিকা গন্ধগ্রহণ করে। গ্রহণ দ্বারা বস্তুর স্বরূপ স্পষ্ট হয়। অস্মিতা হল সেই বস্তুগুলির ভাল-মন্দ উপভোগ। অন্বয় দ্বারা বস্তুর বিশ্লেষণ এবং অর্থবত্ত্বে বস্তুর প্রয়োজন সম্বন্ধে বিচার করা হয় যে, এটা ক্লিষ্ট অথবা অক্লিষ্ট। এই প্রকার বিশ্লেষণ দ্বারা সাক্ষাৎ করলে ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়।

এইরূপ ভাবই রামচরিতমানসের এই পঙক্তিগুলিতে জ্ঞাতব্য—

জড় চেতন গুণ দোষময়, বিস্ব কীহ্ন করতার।
সন্ত হংস গুন গহহিঁ পয়, পরিহরি বারি বিকার।।(১।৬)
ভরতু হংস রবিবংশ তড়াগা।
জনমি কীহ্ন গুন দোষ বিভাগা।। (২।২৩১।৩)

ভরতের মধ্যে এই ক্ষমতা ছিল। হনুমানের মধ্যেও এই ক্ষমতা ছিল। তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করছিলেন, মাঝে সিংহিকা নামক রাক্ষসীকে দেখেছিলেন। সে তাঁর ছায়া ধৃত করে অবরোধ উৎপন্ন করার চেষ্টা করছিল। হনুমান তার কপট বুঝতে পেরেছিলেন। ‘**তাহি মারি মারুত সুত বীরা। বারিধি পার গয়উ মতিধীরা।।**’ **(মানস, ৫।২।৩)** —তাকে বধ করে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রকার বিবেকপূর্বক সংযম করলে ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধক যখন সর্বদা সচেতন থাকার ক্ষমতা লাভ করেন তখন ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করেন। এই অবস্থাতে ইন্দ্রিয়সমূহ বিকার উৎপন্ন করে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; কারণ ইন্দ্রিয়সমূহের গতিবিধি সম্বন্ধে সাধক অবগত হন, সেইজন্য সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না।

ততো মনোজবিত্ত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ।। ৪৮।।

ইন্দ্রিয়সমূহ জয় হলে ‘**মনোজবিত্ত্বম্**’—মনের সদৃশ গতি, ‘**বিকরণভাবঃ**’— দেহ ছাড়াও বিষয়কে অনুভব করার শক্তি এবং ‘**প্রধানজয়ঃ**’ প্রকৃতির উপর আধিপত্য—এই তিনটি যোগ্যতা চলে আসে।

ইন্দ্রিয়গুলি জয় করলে **'মনোজবিত্ত্বম্'**—মনের মধ্যেই সাধনা গতিশীল হয়। সাধক বহির্জগতের বিষয়ে চিন্তা করেন না। গতি যখন মনের মধ্যেই সীমিত হয়, তখন দেহের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। এটাই হল দেহ বিনা বিষয়বস্তুকে বোঝা।

বৈষ্ণব সন্ত নাভাদাসজীর গুরুদেব ধ্যানে বসেছিলেন। তাঁর এক ভক্তের নৌকা সমুদ্রে আটকে গিয়েছিল। তিনি গুরুদেবের কাছে বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, গুরুদেব চিন্তিত হয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল যে, কেউ সঙ্কটে পড়েছে। নাভাজী গুরুদেবের কক্ষের বাইরে এই সেবাতে নিযুক্ত ছিলেন, যাতে কেউ গুরুদেবের ভজনাতে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে। নাভাজী বলেছিলেন,''মহারাজ! নৌকা ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগ কাটিয়ে উঠেছে। এখন আপনি চিন্তা ছেড়ে দিন।'' গুরুদেব কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''এ তো দেখছি নাভিচক্রের খবর জানে। আমার অন্তর্মনের খবর জেনে ফেলেছে। আজ থেকে তোমার নাম নাভাজী। এখন তোমার একটা মাত্র ঋণ বাকী রয়েছে। একশ আটটি দানার মালা আমাকে পরিয়ে দাও।'' নাভাজী আধ্যাত্মিক সন্ত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, 'মালা তো মনের শ্রেষ্ঠ।' যাঁরা মন নিরুদ্ধ করেছেন, এইরূপ মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত্র লিপিবদ্ধ করে তিনি গুরুদেবকে অর্পিত করেছিলেন, যা 'ভক্তমাল' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দেহাতীত হয়ে সব জানতে পেরেছিলেন।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং
সর্বজ্ঞাতৃত্বং চ।। ৪৯।।

সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধি এবং পুরুষ অর্থাৎ চেতন আত্মা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যের বোধ যাঁর হয়, সবীজ সমাধি প্রাপ্ত এইরূপ যোগীর সমস্তভাবের উপর প্রভুভাব এবং সর্বজ্ঞভাব হয়ে যায়, সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্বজ্ঞ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এইরূপ যোগী মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহ অথবা শুধু দেহের উপরই নয়, পরন্তু সমস্ত প্রকৃতির উপর আধিপত্যের বিস্তার করেন। পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার শুধু বাকী থাকে, যে কোন মুহূর্তে তা ঘটা সম্ভব। সর্বজ্ঞতা এবং প্রভুভাবও এই পথের শুধু বিভূতি। এগুলি থেকেও নিরাসক্ত ভাব থাকা আবশ্যক এই প্রসঙ্গে দেখুন—

তদ্‌বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।। ৫০।।

এই সকল সিদ্ধিগুলির প্রতি নিরাসক্ত ভাব থাকলে দোষগুলির বীজের ক্ষয় হয় এবং কৈবল্য পদের প্রাপ্তি হয়। বুদ্ধি এবং পুরুষ অর্থাৎ সেবক এবং প্রভুর মধ্যে লেশমাত্রও ভিন্নতা থাকলে বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও অনুরাগ অবশ্যই আছে, বীজ-দোষ এখনও বাকী, কোন বিষয়ে তো গ্রস্ত—যখন সেই বিষয়েও বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে তখন দোষমুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। দোষ-বীজ ক্ষয় হলে যোগী কৈবল্য পদ লাভ

করেন। এইরূপ উন্নত অবস্থাতেও লোক-সংসর্গের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তা থেকে দূরে থাকতে বলছেন—

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।। ৫১।।

যোগী যে-যে ভূমিকাতে রয়েছেন, সেই ভূমিগুলির শক্তি তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। সেই স্থানের অধিকারীগণের দ্বারা সমাদৃত হলেও তাতে আসক্ত হওয়া উচিৎ নয়। অহংকার করা উচিৎ নয়; কারণ তাতে পুনরায় অনিষ্ট হতে পারে। যখন যোগীর মধ্যে সর্বজ্ঞতা ইত্যাদি গুণ চলে আসে, সেই সময় এই শক্তিগুলির আশ্রিত দেবতা ভোগের সুখ দেখিয়ে অথবা যোগীকে প্রশংসা করে তাতে অভিভূত করার চেষ্টা করেন।

মহারাজ মনু যখন ভজনা করতে শুরু করেছিলেন তখন দেবাদিদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনজনই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—"বর চাও!" **'বহু ভাঁতি লোভাএ' (মানস, ১।১৪৪।২)** কিছু দিচ্ছিলেন না পরন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর—এর ন্যায় ষড়বিকারে লোভকেই সংবর্ধিত করেছিলেন; পরন্তু পরম ধৈর্যশীল মনু বিচলিত হননি। ভগবান আকাশবাণী দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং মনু সর্বস্ব লাভ করেছিলেন।

সাধককে সাবধান থাকা উচিৎ, তাদের প্রলোভনে আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। নিজের মনে বার-বার এই চিন্তা করা উচিৎ যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে কর্মফল ভোগ করে-করে বড় ভাগ্যে মনুষ্য-দেহ লাভ হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপাতে যোগ-পথ-এ সফলতা লাভ করে চলেছি। এই সমস্ত ভোগ ক্ষণভঙ্গুর। সর্বদা এগুলি পাওয়াও যাবে না। সাধন-পথ থেকে বিচ্যুত হলেই এগুলিও তিরোহিত হবে। সেসমস্ত লাভ করলেও অবশেষে দুঃখই পাবো। এই সব চিন্তা করা উচিৎ সেগুলিতে দুঃখের স্বরূপ দেখা উচিৎ। স্ময় অর্থাৎ আত্মপ্রশংসার ভাবও জাগা উচিৎ নয় যে এখন তো রাজপুরুষ চরণযুগল ধুয়ে দিচ্ছে, দেবগণও সম্মান দেন—এইরূপ উচ্চস্থিতি আমি লাভ করেছি! ভোগে আসক্তি অথবা নিজের স্থিতির অহংকার উভয় দশাতেই পুনরায় অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে।

কৈবল্যের জন্য বিবেক—জ্ঞানের প্রয়োজন হয়—

ক্ষণতৎক্রমযোঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।। ৫২।।

ক্ষণ এবং এর ক্রমে সংযম সিদ্ধ করলে বিবেকজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ক্ষণের পর দ্বিতীয় ক্ষণের যে ক্রম, এর মাঝে দুটো ক্ষণের অন্তরালে সঙ্কল্প যাতে না ওঠে। প্রশ্বাসে ওম, নিঃশ্বাসে ওম—এই ক্রমভঙ্গ যাতে না হয়, বিঘ্ন যাতে উপস্থিত না হয়। যখন ক্ষণ এবং এর ক্রমে সংযম সিদ্ধ হয়, তখন বিবেকজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দেবতা, স্বর্গীয় ভোগের প্রলোভন এবং শক্তিগুলির অহং থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

প্রতি ক্ষণের সংযম করা উচিৎ, তাতে ইতর সঙ্কল্পগুলিকে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিৎ নয়।

এই বিবেক-জ্ঞান থেকে লাভ ?

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ।। ৫৩।।

জাতি, লক্ষণ এবং দেশের পার্থক্যের নিশ্চয় না হলে দুটি তুল্য বস্তুর নিশ্চয় বিবেক-জ্ঞান দ্বারা হয়।

বিবেক-জ্ঞান থেকে উৎপন্ন অবস্থাতে জাতি, লক্ষণ এবং দেশ-ভেদ থেকেও পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। চিত্তবৃত্তি এক প্রকার থেকে অন্য অবস্থাতে পরিবর্তন হল জাতি-পরিবর্তন। এইরূপ ক্রমানুযায়ী পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধক লক্ষ্য পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে। এইরূপ কিছু অবস্থার অনন্তর দেহপাত হয়েছে—এইরূপ সাধক জন্মগ্রহণ করে। এটাও একটা জাতি-পরিবর্তন, কিন্তু বিবেক-জ্ঞানের পর জাতি-ভেদ, এর অনুরূপ লক্ষণ এবং দেশ-পরিবর্তন হলেও বিবেক-জ্ঞান কম হয় না। সেই বিবেক-জ্ঞানের বিশেষত্ব বলে যে, তিনি উদ্ধারকর্তা হন।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্।। ৫৪।।

এই বিবেকজাত জ্ঞান সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে, সর্বজ্ঞ, সকল প্রকার জ্ঞাতা এবং কোন সহযোগ পূর্বপরম্পরা ব্যতীত জ্ঞাতা হন।

এরপরের অবস্থা কৈবল্যের—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্।। ৫৫।।

যখন চিত্ত এবং পুরুষ উভয়ই সমানরূপে শুদ্ধ হয়, সমত্বে স্থিত হন তখন কৈবল্য লাভ হয়।

এই অধ্যায়ের ঊনপঞ্চাশতম সূত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধি এবং পুরুষের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল, শুধু পার্থক্য ছিল এটুকু বলা চলে; যখন উভয়ের এইপ্রকার শুদ্ধি হয় যে উভয়েই তুল্য হয়—সত্য পরায়ণ বুদ্ধি এবং পুরুষ অভিন্ন হয়; তখন কৈবল্য লাভ হয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে এইরূপ উল্লিখিত আছে—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।(৫।১৯)

সেই মহাপুরুষগণ জীবিত অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সংসার জয় করেন, যাঁদের মন সমভাবে স্থিত, কারণ সেই ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম হন, এদিকে সেই পুরুষগণের মনও নির্দোষ এবং সমস্থিতি যুক্ত হয়ে যায়—‘**তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ**’—সেইজন্য তাঁরা ব্রহ্মে স্থিত হন। একেই অপুনরাবর্তী, পরমগতি বলে।

ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মন উত্তমরূপে জয় করলেও বুদ্ধি এবং পুরুষে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকে। সেই অবস্থাতে সর্বজ্ঞতা, প্রভুভাব ইত্যাদি উপলব্ধিগুলি সঙ্গে থাকে। বুদ্ধি এবং পুরুষ অত্যন্ত শুদ্ধ হলে সাম্য অবস্থা চলে আসে। তারপর উভয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়। বুদ্ধির স্থানে পুরুষ দাঁড়িয়ে, বুদ্ধি পুরুষে সমাহিত—এরই নাম কৈবল্য।
এই প্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রমানুযায়ী সংযমের উৎকর্ষের সঙ্গে যে-যে সিদ্ধাইগুলি লাভ হয়, সেগুলির বর্ণনা আছে, যেগুলিকে বিভূতি বলা হয়েছে সেইজন্য এই অধ্যায়ের নাম বিভূতিপাদ। এগুলির অন্তিম লক্ষ্য হল কৈবল্য। প্রথম অধ্যায়েও কৈবল্যের চর্চা আছে। এখানে কৈবল্যের বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু এটাও জানা আবশ্যক যে, কি-কি পরিস্থিতি অতিক্রম করে সাধক এই স্থিতি লাভ করেছেন। এইপ্রকার এখানে তৃতীয় পাদ সমাপ্ত হচ্ছে। অতএব, পরবর্তী পাদ হল কৈবল্য।

নিষ্কর্ষ—

অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনার তিনটি অঙ্গ-ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি হল বিভূতি পাদের অঙ্গ; কারণ এগুলিতে স্থিতিলাভ করার সঙ্গে-সঙ্গে যোগের বিভূতিগুলির প্রস্ফুটন হয়। ধারণাতে ধ্যেয় আসার সঙ্গে-সঙ্গে ধ্যানের রূপে বৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হয়, লক্ষ্যমাত্রের আভাস হয়। এইপ্রকার সমাধির অবস্থা চলে আসে। **‘ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।’ (৩।৪)**— ক্রমশঃ তিনটিই সিদ্ধ হলে সংযম সাধিত হয়। এই সংযম সিদ্ধ হলে বিভূতিগুলি লাভ হয়। এই বিভূতিগুলি ক্রমানুযায়ী ছোট-বড় অবস্থা অনুসারে লাভ হয়। এই সংযম একবার সিদ্ধ হলে সর্বদার জন্য স্থির হয়।

যোগ দর্শনের এই তৃতীয় পাদে ধর্ম শব্দের উল্লেখ প্রথমবার করা হয়েছে। যেখানে বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়। সমাধি হয় এবং একাগ্রতা-পরিণামে সংযম চলে আসে সেই সংযমকে ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণামও বলে। চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হল যোগ এবং এখানে নিরোধ-পরিণাম প্রত্যক্ষীভূত সেইজন্য ধর্ম শব্দের উচ্চারণ করা হয়েছে। প্রস্তুত পাদের ষোড়শতম সূত্রে উল্লিখিত আছে যে, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যা আয়ত্ত্বের মধ্যে, একরস শান্ত প্রবাহিত, তা ধর্ম। যিনি সেই আয়ত্তাধীন বিষয় সম্বন্ধে অবগত, তিনি ধার্মিক। ৪৫ তম সূত্রে পুনরায় ধর্ম শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, পাবক, গগন এবং সমীর; এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চতন্মাত্রা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ—এগুলি সংযত হলে এদের কৃত্য শান্ত হলে ধর্মে বাধা উৎপন্ন হয় না; কারণ এগুলিই অবরোধ। এ সমস্ত শান্ত হলে ধর্ম নির্বাধ প্রবাহিত হয়। নিরোধ, সমাধি একাগ্রতারই সমার্থক শব্দ।

ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণাম-এগুলি সংযত হলে অতীত এবং বর্তমানের জ্ঞাতা হওয়া যায়; কিন্তু **‘প্রাতিভাদ্বাসর্বম্।’ (৩।৩৪)**—প্রাতিভ অর্থাৎ পরাতে বৃত্তি

যাঁদের একরস প্রবাহিত, এইরূপ যোগী কোন প্রয়াস ছাড়াই, কোনরূপ সংযম ব্যতীত সর্বজ্ঞাতা হন। পূজ্য গুরুদেবের দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ অজস্র উদাহরণ দেখা গেছে। আগন্তুক আশ্রমে পৌঁছাবার পূর্বেই তার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে মহারাজজী জানতে পারতেন। কখনও-কখনও অর্ধরাত্রিতে মহারাজজী হঠাৎ নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে বসতেন, বলতেন, ''দেখ গিয়ে কেউ ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রমে আসছে।'' তিনি বাক্য সম্পূর্ণ করার কিছুক্ষণের ভিতরেই কেউ নিশ্চয়ই আশ্রমে পৌঁছাত।

দেহস্থ বায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান এবং উদান। প্রস্তুত পাদে উদান এবং সমান এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা সাধন উপযোগী। উদান-জয় দ্বারা প্রকৃতির কণ্টকগুলি থেকে মুক্তি এবং গতি উর্ধ্ব হয় এবং সমান-জয় দ্বারা জ্যোতির্ময়ের প্রকাশ লাভ হয়।

'**বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ।**'—জাগতিক দৃশ্য-শ্রব্য বস্তুগুলিতে বৃত্তির কল্পনারহিত অবস্থা হল মহাবিদেহাবস্থা। যা কিছু দৃষ্টিগোচর হোক, যা কিছু কর্ণগোচর হোক, তাতে ভাল-মন্দ প্রভাব যাতে না পড়ে, যাতে লিপ্ত না হয়—এইরূপ বিদেহাবস্থা লাভ হলে প্রকাশের আবরণ নষ্ট হয়ে যায়। দ্রষ্টা হলেন জ্যোতির্ময় প্রকাশস্বরূপ, তাঁর এবং সাধকের মাঝে যে আবরণ ছিল, তা সরে যায়।

ভূতজয় দ্বারা অষ্টসিদ্ধি, কায়সম্পৎ প্রাপ্ত হয়। ভূতজয়ের ফলে ভূতগণের বিবিধ কৃত্য শান্ত হয়, সেইজন্য ধর্মে বাধকের কাজ করে না। বুদ্ধি সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, পরম চেতন পুরুষের পৃথক প্রতীতি মাত্র বাকী থাকে। এইরূপ সবীজ সমাধিতে যোগীর সমস্ত ভাবের উপর প্রভুভাব এবং সর্বজ্ঞ জ্ঞান হয়। এই প্রভুভাব এবং সর্বজ্ঞ হওয়ার সিদ্ধাই থেকেও বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে কৈবল্যপদের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু সেই সময় সমস্ত রকমের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, দেবতা এবং ইন্দ্রাদি অষ্ট দিকপাল নিমন্ত্রণ করে। এটাও যোগ সাধনার একটা স্তরমাত্র, এটা লক্ষ্য নয়। সাধকের সেই ভোগগুলির প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হওয়া উচিৎ নয় এবং নিজের স্থিতির অভিমানও হওয়া উচিৎ নয়। এতে পুনরায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এই বিঘ্নগুলি অতিক্রম করলে চিত্ত নিরন্তর চিন্তনে প্রবাহিত হয় এবং ক্ষণ-প্রতিক্ষণের ক্রমে সংযম সিদ্ধ হয় তখন বিবেক থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্বাসগ্রহণে 'ওম', শ্বাস ত্যাগের সময় 'ওম'; অন্য সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়ে যাতে ব্যবধান না সৃষ্টি করে—এটাই হল ক্ষণ-প্রতিক্ষণের ক্রমে সংযম সিদ্ধ হওয়া। এইরূপ অবস্থাতে একটা ক্ষণও ভগবৎ চিন্তন বিহীন ব্যর্থ যায় না। এইরূপ অবস্থা লাভ হলে বিবেক থেকে উৎপন্ন জ্ঞান লাভ হয়। এই বিবেকজন্য জ্ঞান সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। এই জ্ঞান দ্বারা সর্বজ্ঞাতা হওয়া সম্ভব হয়।

সত্ত্বসংযুক্ত বুদ্ধি অর্থাৎ সাধক এবং পুরুষ ভিন্ন-ভিন্ন—এই বোধ যখন সমত্বে স্থিত হয়, এইপ্রকার সাম্যাবস্থাতে কৈবল্য লাভ হয়। এ সমস্তই যোগজন্য, সাধনা যখন অত্যন্ত নির্মল হয় তখন ঘটে। যোগ সাধনা দ্বারা সহস্র সহস্র সিদ্ধিলাভ হয়। এই সমস্ত সিদ্ধিগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ হল কৈবল্য, এই প্রসঙ্গে মহর্ষি যোগদর্শনের চতুর্থ পাদে সম্যকভাবে বিচার করেছেন।

।। ওঁ ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

চতুর্থ অধ্যায় - কৈবল্যপাদ

মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগ দর্শনের প্রথম পাদ হল 'সমাধিপাদ'। **'সম্যক্ অধীয়তে মনঃ যস্মিন্ স সমাধিঃ'**—যেখানে মন উত্তমরূপে সমাহিত হয়, তা হল সমাধি। সম এবং আদি তত্ত্বের সঙ্গে সমত্ব লাভ হল সমাধি। চিত্তের স্বরূপ শূন্য হওয়া, ধ্যেয় মাত্রের প্রতীতি হল সমাধি যার দ্বারা দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হয়, অভয় পদলাভ হয়। এটা সমাধির সর্বশ্রেষ্ঠ ফল।

যখন কোন বিষয়ের ফল সম্বন্ধে বলা হয় তখন তাতে রুচি উৎপন্ন হয়, তখনই তা লাভ করার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রযত্নশীল হয়। সেইজন্য সমাধিপাদের বর্ণনা সর্বপ্রথম করা হয়েছে। যখন এটাই সত্য এই বোধগম্য হয় তখন তা সিদ্ধ করার জন্য 'সাধনপাদ'; উক্ত অধ্যায়ে অষ্টাঙ্গ যোগ, সম্পূর্ণ যোগ সাধনার প্রস্তুতি বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে সাধনার উল্লেখ করা হয়েছে। নাম, রূপ, অভ্যাস, বৈরাগ্য ইত্যাদি সাধনা সাধকের ক্ষমতার অনুরূপ বর্ণিত আছে; কিন্তু সাধনপাদে সাধনার রূপ স্পষ্ট হয়।

তৃতীয় অধ্যায় হল 'বিভূতিপাদ'। সাধনা দ্বারা যখন সংযম সিদ্ধ হয়, বিভূতিসমূহ প্রকট হয়। বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য! যোগসাধনার ফলস্বরূপ বিভিন্ন ঐশ্বর্য প্রকট হয়। উদাহরণস্বরূপ ভগবান শিবের দেহে বিভূতি, অবঢ়রদানী ইত্যাদি উল্লিখিত আছে। যেমন-যেমন সংযমে দৃঢ়তা আসে তেমন-তেমন অষ্টসিদ্ধি প্রকট হয়। সিদ্ধাই হল যোগপথের সুবিধা বিশেষ। পথে এগুলি লাভ হওয়াই উচিৎ; কিন্তু সাধক যদি এগুলিতেই মত্ত হন, তাহলে তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে পারেন, সেইজন্য পরমসিদ্ধি কৈবল্য পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

আদি শঙ্করাচার্যের অনুসারে **'আব্রহ্মস্তম্ভপর্যন্ত সর্বমায়াময়ং জগৎ। সত্যং সত্যং পুনর্সত্যং হরে র্নামৈব কেবলম্।।'**—বিধাতা এবং তাঁর থেকে উৎপন্ন যাবন্মাত্র সৃষ্টি মরণধর্মা। এখানে সত্য বলে যদি কিছু আছে তবে তা হলেন হরি এবং তাঁর নাম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, আত্মাই পরম সত্য, জ্যোতির্ময়। তিনি দ্রষ্টা। তাঁকে লাভ করার জন্য নির্ধারিত বিধি, কর্মের পালন আবশ্যক। কর্মকে চার ভাগে বিভাজিত করেছেন, যেগুলিকে বর্ণ বলা হয়। স্বভাবজাত ক্ষমতা অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষ পরমসিদ্ধি লাভ করেন। একেই পরম নৈষ্ঠিকীম্ সিদ্ধি বলা হয়েছে। একেই মহর্ষি পতঞ্জলি কৈবল্য বলেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।(১৮।৪৬)

যে পরমেশ্বর থেকে ভূতগণের উৎপত্তি, যিনি তত্ত্বরূপে এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমেশ্বরকে '**স্বকর্মণা তমভ্যর্চ**'—মানুষ স্বভাবজাত কর্ম দ্বারা অর্চনা করে পরমসিদ্ধি লাভ করে; এরপর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না। এটাই পরমসিদ্ধি। একেই কৈবল্য পদ বলে। কৈবল্যের স্বরূপ কি ? কখন লাভ হয় ? সেই পদ কিরূপ ? এই প্রসঙ্গে দেখুন—কৈবল্যপাদ !

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।। ১।।

সিদ্ধিলাভ করার মাধ্যম দুটি—জন্মজাত সিদ্ধি এবং ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা এবং সমাধিজন্য সিদ্ধি।

ঈশ্বরপথে আরম্ভের নাশ নেই। সাধনা বুঝে বর্তমান জন্মে চার পা এগিয়ে থাকলে পরবর্তী জন্মে পঞ্চম পদক্ষেপই পড়বে। গীতাতে উল্লিখিত আছে--- '**অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।।**' **(৬।৪৫)** অনেক জন্ম থেকে প্রযত্নশীল সাধক পরমগতি লাভ করেন। কয়েক জন্ম ধরে ভজনা করতে-করতে প্রাপ্তির জন্মে, যা আমার স্বরূপ, সাধক আমার হৃদয়ে নিবাস করেন। এইরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করার সঙ্গেই শাশ্বত পদ লাভ করেন। কৈবল্যপদ অথবা পরমসিদ্ধি লাভ করার জন্য তাঁর সাধনার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ; মহাভারত, বনপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে অর্জুন বলছেন গত দশ জন্ম ধরে আপনি নিরন্তর মহাপুরুষ ছিলেন। একজন্মে আপনি 'যত্র সায়ং গৃহ মুনি' রূপে বিরামহীন ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন। যেখানে সন্ধ্যা নামত, সেখানেই রাত্রি-বাস করে নিতেন। সারাটা জীবন মৌন অবলম্বন করে আপনি সাধনারত ছিলেন। এক কল্প অর্থাৎ এক জন্মে আপনি প্রভাস ক্ষেত্রে ঘুরে-ঘুরে স্থানীয় জনসাধারণকে উপদেশ দিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়েছিলেন। এক জন্মে পুষ্কর তীর্থে বার বছর পর্যন্ত এক পায়ে দাঁড়িয়ে আপনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। এক জন্ম অর্থাৎ এক কল্পে আপনি বদ্রিকাশ্রমে ধ্যানস্থ্ হয়ে জীবন কাটিয়েছিলেন। সেইসময় আপনার সঙ্গে দু'জন ঋষি ছিলেন—একজন নর এবং আর একজন নারায়ণ। আপনি নারায়ণ ছিলেন। স্তর উন্নত হওয়ার পর আপনিই বামন এবং বিষ্ণু নামে অভিহিত হয়েছিলেন-ব্যাসদেবের কাছে আমি এইরূপই শুনেছি।

অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা সম্পন্ন পূর্বজন্মেই হয়ে গিয়েছিল, শুধু প্রাপ্তি শেষ ছিল। এইরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গে লাভ করেন। তাঁদের পূর্ণত্বলাভে

জন্ম মাধ্যম, সাধনা নয়। ভগবানের সাধনা আর তিনদিন বাকী ছিল। তিনি বদ্রিকাশ্রম গিয়েছিলেন এবং তিনদিন ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্তে রাত্রি দুটো-আড়াইটা থেকেই ধ্যান করার জন্য বসে যেতেন। তিনি ধ্যানে বসার পূর্বে দুচোখে জলের ঝাপটা দিতেন, তারপর ধ্যানে বসতেন। ধ্যানকালে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত।

ধ্রুব ভগবৎ দর্শন করার পর তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ''ভগবন্! মুনিগণ জন্ম জন্মান্তর ধরে প্রযত্ন করেন তবে আপনার দর্শন পান; কিন্তু আমাকে আপনি ছমাস পরই দর্শন দিয়েছেন! এই কৃপা কেন?'' প্রভু বলেছিলেন, ''বৎস! এদিকে দেখ! (ভগবান একটা পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। সেটা একটা অস্থি পঞ্জরের পাহাড় ছিল) এ সমস্ত তোমারই অস্থি-পঞ্জর। তুমি এতবার জন্মগ্রহণ করেছ, এখানেই ভজনা করেছ, এখানেই দেহপাত হয়েছিল। গত জন্মে সাধনা সম্পূর্ণ হতে ছমাস বাকী ছিল, অতএব বর্তমান জন্মে ছমাস সাধনা করার পরই তা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তুমি উপলব্ধি করেছ।''

মহাপুরুষগণের এইরূপ জন্ম জন্মজাত সিদ্ধ-এর অন্তর্গত পড়ে। এঁরা ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির অবস্থাগুলি অতিক্রম করে নেন পূর্ব-পূর্ব জন্মে। এমন নয় যে, তাঁরা পূর্বে কখনও সাধনা করেননি।

সিদ্ধির একটা মাধ্যম হল ঔষধি। প্রকৃতিতে বিধাতা এবং তার সৃষ্টি নশ্বর। গীতাতে উল্লিখিত আছে যে, '**আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।**' **(৮।১৬)** সৃষ্টির রচয়িতা বিধাতা এবং তাঁর দ্বারা সৃষ্ট জগৎ পরিবর্তনশীল, দুঃখের খনি ক্ষণভঙ্গুর এবং নশ্বর! তবে কোন জাগতিক বস্তুর প্রয়োগ দ্বারা কৈবল্যপদ কিরূপে লাভ হবে?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''এই কর্ম না করে পূর্বেও কেউ পরমাত্মাকে লাভ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ লাভ করবে না। পূর্বে যত মহর্ষি, মনীষী ছিলেন তাঁরা সকলেই নির্ধারিত কর্ম করেছিলেন তবেই মহর্ষি হতে পেরেছিলেন। অর্জুন! কর্মের পরিণামে জ্যোতির্ময় আত্মার দর্শন পাওয়া যায় এই অবস্থাতে সাধক আত্মতৃপ্ত, আত্মস্থিত হন, তাঁর কোন কর্তব্য বাকী থাকে না, লাভ করার যোগ্য কিছু অপ্রাপ্ত থাকে না।'' অতএব এই সাধনার অনুষ্ঠান না করে কেউ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে না, তবেই নশ্বর বস্তু ঔষুধে ব্যবহৃত গাছগাছড়া অথবা অন্য কিছু প্রয়োগ করে কিরূপে পরমাত্মাকে লাভ করা যেতে পারে!

বস্তুতঃ জগতে যেরূপ অনেক শারীরিক রোগ দেখা যায়, সেইরূপ কিছু মানসিক রোগ অধ্যাত্ম জগতকে প্রভাবিত করে, যা হল বারংবার অনন্ত যোনি, গর্ভবাসের যাতনা এবং কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত উচ্চ অথবা নিম্ন শ্রেণীর দেহধারণের কারণ। এগুলিকেই ভবরোগ বলা হয়। রামচরিতমানস (উত্তরকাণ্ড)এ সন্ত শিরোমণি

গোস্বামী তুলসীদাস এই রোগগুলির পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, এর মূল হল মোহ অথবা অজ্ঞান। '**মোহ সকল ব্যাধিহ্ন কর মূলা। তিহ্ন তে পুনি উপজহিঁ বহু সূলা।।**' সমস্ত ব্যাধির মূল হল মোহ, এর ফলে অনন্ত সূলের সৃষ্টি হয়। '**কাম বাত কফ লোভ অপারা। ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা।। প্রীতি করহিঁ জৌঁ তীনিউ ভাই। উপজই সন্যপাত দুখদাই।।**' — কাম, হল বায়ু বিকারের সদৃশ, ক্রোধ পিত্ত, কফ লোভ। যদি তিনটিরই প্রকোপ রয়েছে তবে সহ-নিপাত অর্থাৎ মৃত্যুর আসন্নতার দুঃখপূর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। '**অহংকার অতি দুখদ ডমরুআ।**'—অহংকার অত্যন্ত কষ্টপ্রদ গ্রন্থিরোগ। তৃষ্ণা, অনন্ত বাসনা উদর-সম্বন্ধীয় শূল। কুড়ি-পঁচিশটি রোগের চিত্রণ করে তিনি শেষে বলেছেন—'**মানস রোগ কছুক ম্যায় গাএ।**' মনের অনন্ত রোগের মধ্যে আমি কয়েকটা মাত্র রোগের সম্বন্ধে বলেছি। '**হহিঁ সবকে লখি বিরলেহ্ন পাএ।।**' **(৭।১২১খ।১)** এই রোগে প্রায় সকলে গ্রস্ত, কদাচিৎ কেউ এগুলি টের পায়। '**জানে তে ছীজহিঁ কছু পাপী। নাস ন পাবহিঁ জন পরিতাপী।।**' এ সম্বন্ধে জ্ঞান হলে এগুলি কিছু ক্ষীণ হয়, কিন্তু নাশ হয় না। এই রোগগুলির ঔষুধ সম্বন্ধেও বলা হয়েছে—'**নেম ধর্ম আচার তপ, জ্ঞান জগ্য জপ দান। ভেষজ পুনি কোটিহ্ন নহিঁ, রোগ জাহিঁ হরিজান।।**' **(৭।১২১।খ)** নিয়ম, ধর্ম, উত্তম আচরণ, তপ, জ্ঞান, দান এবং অন্যও কোটি কোটি ওষুধ আছে; পরন্তু হে গরুড়জী! সেই ঔষুধের দ্বারাও এই রোগনাশ হয় না। এই ভবরোগ নাশের উপায় একটাই—'**রাম কৃপাঁ নাসহিঁ সব রোগা।**'— ভগবানের দয়াতে রোগ সমাপ্ত হয়। '**জৌঁ এহি ভাঁতি বনৈ সংযোগা।।**' —যদি এইপ্রকার সংযোগ হয়। কিরকম সংযোগ? '**সদ্‌গুরু বৈদ বচন বিস্বাসা। সংজম ইয়হ্ ন বিষয় কৈ আসা।।**' সদ্‌গুরু বৈদ্যস্বরূপ, তাঁর বাক্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় হওয়া আবশ্যক। বিষয় কামনা করবেন না, এটাই সংযম।

'**রঘুপতি ভগতি সজীবন মূরী। অনূপান শ্রদ্ধা মতি পূরী।।**' -ভগবানের ভক্তি মৃত সঞ্জীবনী অর্থাৎ জীবনদায়িনী ঔষুধ বিশেষ। শ্রদ্ধাপূর্ণ বুদ্ধিই অনুপান যা ঔষুধের সঙ্গে সেবন করা হয়। '**এহি বিধি ভলেহিঁ সো রোগ নসাহীঁ। নাহিঁ ত জতন কোটি নহিঁ জাহীঁ।।**' এই বিধি দ্বারা এই রোগ অবশ্য নাশ হয়, অন্যথা কোটি চেষ্টাতেও এগুলি যাবার নয়। একমাত্র ঔষুধপথ্য হল ঈশ্বর ভক্তি। ভক্তির প্রভাব এইরূপ যে, '**রাম ভগতি মনি উর বস জাকেঁ। দুখ লবলেস ন সপনেহুঁ তাকেঁ।।**' **(৭।১১৯খ। ৫)**—তার জীবনে দুঃখ বলে কিছু থাকে না।

বিভক্ত-এর অর্থ 'বিভাজন' এবং ভক্তির তাৎপর্য 'যোগ করা'। নিয়ম, ধর্ম, আচরণ এগুলি সবই ভক্তিতে উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়; কিন্তু যদি শ্রদ্ধা এবং সমর্পণ নেই তাহলে সব ব্যর্থ চলে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন যে, যদি জপ, তপ এবং কর্ম

শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত না হয় তবে সবই ব্যর্থ হয়, যেন কোন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়নি। অতএব সর্বতোভাবে সমর্পণকে ভক্তি বলে। এই ঈশ্বর-প্রণিধান ভবরোগের জন্য মহৌষধি, এতে সাধককে ইষ্টের হাতের যন্ত্রস্বরূপ হতে হয়। মহর্ষি পতঞ্জলির ঔষধি বলার অভিপ্রায় এটাই।

সিদ্ধির একটা মাধ্যম হল 'মন্ত্র'। মনন করলে যা সাধককে রক্ষা করে তা হল মন্ত্র। এই মহাপুরুষ স্বয়ং মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন— **'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।' (১।২৭), 'তজ্জপঃ' (১।২৮)**—সেই ঈশ্বরের বাচক নাম প্রণব, সেইজন্য প্রণব জপ করুন। **'মন অন্তর স মন্ত্র'**, জপ করতে-করতে একটা স্তর এমন আসে যে, নাম মনকে নিজের অন্তরালে স্থান দিয়ে দেয়। সেই সময় নাম মন্ত্রের সংজ্ঞা প্রাপ্ত করে। ক্রমশঃ উন্নত অবস্থাতে, পরাবাণীর প্রবেশকালে এই নাম মনকে নিজের অন্তরালে সমাহিত করে এবং ধ্রুবসিদ্ধি প্রদানকারী হয়।

'তপ' সিদ্ধির একটা আবশ্যক অঙ্গ। সাধক ইষ্টের প্রতি সমর্পিত হন মন্ত্র জপ করেন কিন্তু দেহ এবং ইন্দ্রিয়গুলি সহযোগ করে না। কখনও নিদ্রা চলে আসে, কখনও আলস্য ঘিরে ধরে। অতএব মনকে ইষ্টের অনুরূপ করার চেষ্টা হল তপস্যা। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে নিযুক্ত হওয়াকে তপস্যা বলে। **'কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।' (২।৪৩)** তপস্যা দ্বারা দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিকারগুলির নাশ হয়। কায়া ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত হয়।

অন্ততঃ 'সমাধি' হল সিদ্ধির সঙ্গে সংলগ্ন সোপান। এতে অর্থ অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রের আভাস, চিত্তের নিজ স্বরূপ শূন্য হওয়া এবং কৈবল্য অনাময় পরমপদের প্রাপ্তি, তাতে স্থিতি লাভ হয়। সারাংশতঃ ভবরোগের ঔষধি ভক্তি, এর সহযোগী মন্ত্র এবং তপস্যা ও ক্রমশঃ সমাধি দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ সমস্ত কৈবল্য-প্রাপ্তির উপকরণ। প্রশ্ন উঠছে যে জন্ম কাকে বলে? কিরূপে জন্ম হয়? জন্ম-পরিবর্তনের কি কারণ? এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন—

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ।। ২।।

'জাত্যন্তরপরিণামঃ'—এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে পরিবর্তন হওয়া হল জাত্যন্তর-পরিণাম। প্রকৃতির পূর্ণ অবস্থাতে এরূপ হয়।

প্রকৃতি চিত্তকে প্রলুব্ধ করে রেখেছে। চিত্ত যে বিকারগুলি দ্বারা আবদ্ধ সেগুলি শান্ত হলে, পরবর্তী উন্নত অবস্থা লাভ হলে, চিত্তের এই পরিবর্তনই জন্ম-পরিবর্তন। এই উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভের পর দেহপাত হলে সেই উন্নত স্তরেই জন্ম হবে। পূর্ব প্রকৃতি শান্ত এবং পরবর্তী উন্নত প্রকৃতির জাগৃতি হল জন্ম-পরিবর্তন। চিত্তের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে পরিবর্তন হল জন্ম-পরিবর্তন।

শুরুতে চিত্তবৃত্তির ভূমি মলিন থাকে। সাধনারম্ভে সাধক অল্পজ্ঞ অবস্থাতে থাকেন। যাঁদের এইরূপ অবস্থা তাঁরা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের সেবা করুন। সেবা, সমর্পণ, সান্নিধ্য এবং সাধনা শ্রবণের প্রভাবে ভজনা জাগ্রত হয়; হৃদয়ে চিন্তনের বিধি জাগ্রত হয়। সেই অল্পজ্ঞ শূদ্র শ্রেণীযুক্ত সাধক বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত হন। একটি প্রকৃতি সম্পূর্ণ হয়ে আর একটি সক্রিয় হয়। এটা একটা জন্ম-পরিবর্তন।

এই বিধি অনুসারে নিযুক্ত হলেই সাধক দৈবী সম্পত্তি অর্জন করতে শুরু করেন। ক্রমশঃ যখন স্বভাবে ধৈর্য, শৌর্য, সাহস, সংঘর্ষ থেকে পশ্চাৎপদ না হওয়ার মনোভাব জেগে ওঠে তখন সেই সাধকই ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। সেই ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক বিকারগুলি ক্রমশঃ শান্ত করতে সক্ষম হন। তার মধ্যে ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ক্রিয়াগুলিতে প্রবৃত্ত হওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যায়। ব্রহ্মে বিলয় হওয়ার যোগ্যতা সহজ স্বভাব হয়ে যায়। সেই সময় ক্ষত্রিয় প্রকৃতি পূর্ণ থাকে, এর থেকে একটি উন্নত প্রকৃতি জাগ্রত হয়। এই অবস্থাতে সেই সাধকই ব্রাহ্মণ।

চিত্তের এক প্রকারের প্রাত্যহিক জীবন থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তিত হওয়া, পূর্ব প্রকৃতি শান্ত হওয়া এবং উন্নত প্রকৃতির জাগৃতি এটাই জাত্যন্তর-পরিণাম। সেই সাধকের অন্য জন্ম হয়। অবশেষে আত্মজ্ঞান হয়, আত্মস্থিতি লাভ হয়। সেই সময় সকল শ্রেণীই সমাপ্ত হয়, প্রকৃতি সমাপ্ত হয়—সেখানে নিকৃষ্ট প্রকৃতিও সক্রিয় থাকে আবার প্রকৃষ্ট প্রকৃতিও শান্ত হয়ে যায়। এই উপলব্ধির পূর্বে দেহপাত হলে পুনরায় দেহরূপ বস্ত্র ধারণ করতে হবে, সেই স্তরেরই সাধনা করে যেতে হবে। জন্ম-পরিবর্তনের রহস্য এটাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।। (গীতা, ২।৪৫)

অর্জুন! বেদ ত্রিগুণ পর্যন্ত প্রকাশ করে থাকে। তুমি এই তিনগুণ অতিক্রম করে উপরে ওঠ, কিরূপে উঠবেন? ভগবান বলছেন—নিত্য সত্য পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা স্থির কর এবং যোগক্ষেমের আকাঙ্ক্ষারহিত ও আত্মপরায়ণ হও। এই প্রকার আচরণ করে তুমি ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে স্থিত হবে, বেদ-এর অধিকৃত ভূমি ত্রিগুণ অতিক্রম করে উপরে উঠবে।

এগিয়ে গেলে কি লাভ হবে? বেদের ঊর্ধ্বে স্থিত হয়ে কে কি লাভ করেছেন? এই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।। (গীতা, ২।৪৬)

পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে মানুষের ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন

হয়, যে ব্রাহ্মণ উত্তম প্রকারে ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরও বেদের ততটুকুই প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ রাজস্থানে বর্ষার জল ট্যাঙ্কে জমা করে তা দিয়ে দৈনন্দিন কার্য করা হয়। সেখানে গঙ্গার স্বচ্ছ ধারা প্রবাহিত হলে কেউ সেই ট্যাঙ্কগুলির জল আর কতটুকু ব্যবহার করবে? কিন্তু জলের ট্যাঙ্কগুলি থাকবে অবশ্যই উত্তরপুরুষদের পথ প্রদর্শনের জন্য বেদের প্রয়োজন আছেই। যিনি বেদের ঊর্ধ্বে স্থিত হন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রাহ্মণ। অর্জুন তুমি বেদের পরিধির ঊর্ধ্বে ওঠ, ব্রহ্মকে জান, ব্রাহ্মণ হও। এটাই জাত্যন্তর-পরিণাম। অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এগুলি ক্রমোন্নত শ্রেণী। একপ্রকারের প্রকৃতি যেমন-যেমন শান্ত হয়, তেমন-তেমন অন্য প্রকারের প্রকৃতির উন্মেষ হয়। তামসিক প্রকৃতির চাপ চিত্ত থেকে অপসারিত করা এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ হওয়া-এটা জন্ম-পরিবর্তন।

উপর্যুক্ত পাঁচটি সাধন কি (জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা এবং সমাধি) প্রকৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি করে? এই প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি বলছেন, না!—

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।। ৩।।

নিমিত্তে ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা, সমাধি ইত্যাদি প্রকৃতিগুলির নিয়ামক অথবা সঞ্চালক নয়। এই নিমিত্তগুলি এমনই যেরূপ ক্ষেত্রপাল কৃষক '**বরণভেদঃ**'—আবরণ ভেদ করে।

কৃষক খেত সিঞ্চন করে। নালীতে যেখানে অবরোধ, সে সেই অবরোধ দূর করে, জল তো স্বতই চলে আসে। এই প্রকার সাধক যত বেশী সংযত হন, তিনি সেই পরিমাণে প্রকৃতি অপসারিত করতে সক্ষম হন, প্রকৃতির আবরণ ক্ষীণ হতে শুরু করে, জ্যোতির্ময় পরমাত্মার সহজ প্রকাশ ব্যাপ্ত হয়। সাধক প্রকৃতিতে পরিবর্তন করেন না পরন্তু বিজাতীয় অবরোধকগুলিকে ফসলের জন্য বাধক বিজাতীয় বনস্পতির ন্যায় নির্মূল, উচ্ছেদ করেন—'**কৃষী নিরাবহিঁ চতুর কিসানা। জিমি বুধ তজহিঁ মোহ মদ মানা।।' (রামচরিতমানস, ৪।১৪।৪)**

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ।। ৪।।

চিত্ত একপ্রকার থেকে অন্য প্রকারে নিযুক্ত হওয়াই হল নির্মিত চিত্ত। নির্মিত চিত্ত '**অস্মিতামাত্রাৎ**'—অস্মিতা পর্যন্তই সীমিত।

আত্মা এবং বৃত্তিরগুলির মিশ্রণ হল অস্মিতা। যতক্ষণ পর্যন্ত অস্মিতা বিদ্যমান, চিত্ত এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে পরিবর্তিত অথবা নির্মিত হতে থাকবে। যখন এই মিশ্রণ সমাপ্ত হয়, তখন চিত্ত-নির্মাণ হয় না, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়।

চিত্তে অনেক প্রবৃত্তি প্রবাহিত, সে সমস্ত কিরূপে স্থির হবে?

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্।। ৫।।

চিত্তবৃত্তির সংখ্যা অনন্ত। ক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি লক্ষ্য থেকে বিমুখ করে, অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি ইষ্টের সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দেয়। চিত্তের অসংখ্য প্রবৃত্তিগুলি ছেদন করে সেগুলিকে স্থির করে একটি চিত্তবৃত্তি—সেই চিত্ত-বৃত্তি লক্ষ্যের প্রতি সমর্পিত হয়। নির্মিত চিত্তের কার্য অনেক প্রকারের হয়। তা সত্ত্বেও একটা মূল চিত্তই সেসমস্তের নিয়ন্ত্রক, প্রেরক এবং সঞ্চালক।

সাধনাতে শনৈঃ-শনৈঃ উৎকর্ষপ্রাপ্ত চিত্তের নাশ হতে পারে; কিন্তু ধ্যানে সমাহিত চিত্ত নষ্ট হয় না, এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন—

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্।। ৬।।

একটি চিত্ত যা সকল প্রবৃত্তিকে ছেদন করে ইষ্টে নিযুক্ত করে, এসবের মধ্যে ধ্যানজনিত চিত্ত '**অনাশয়ম্**'—বাসনা এবং সংস্কাররহিত হয়, যা কখনও নাশ হয় না।

পূজ্য গুরুদেব মহারাজজী বলতেন, ''আমি পতিত হতে চাইলেও ভগবান আমাকে পতিত হতে দেবেন না।'' সম্পূর্ণ সাধনা একত্র হয়ে ধ্যানে পরিবর্তিত হলে তা কামনারহিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে সে ক্ষমতা নেই যা সেটাকে নাশ করতে পারে। মায়ার এমন কোন বিঘ্ন নেই যদ্দ্বারা তা নাশ করতে পারে। এইরূপ বিঘ্ন মহারাজজীর সম্মুখে বার-বার উপস্থিত হয়েছিল; কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ এই অবস্থাযুক্ত যোগী কর্ম-সংস্কারগুলি থেকে নির্বিঘ্ন হয়ে যায়।

এখন ধ্যানের পরবর্তী যোগ-স্থিতির উপর আলোকপাত করেছেন—

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।। ৭।।

ধ্যানের পর প্রাপ্তিযুক্ত যোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি বলছেন যে, যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়, অন্যান্যদের কর্ম তিন প্রকারের হয়।

যোগী কর্ম করলে কোন শুভ পরিণামও দেখা যায় না আবার তার কোন অশুভ সংস্কারও তৈরী হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতে বলেছেন—যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মস্থিত যাঁর যোগ সম্পূর্ণ হয়েছে সেই পুরুষ কর্ম করলে কোন লাভ হয় না এবং কর্মত্যাগ করলেও কোন ক্ষতি হয় না; কারণ এই অবস্থাতে প্রাপ্ত যোগ্য কোন বস্তু অপ্রাপ্ত থাকে না, তবে ডাকবে কাকে? কোন বিকার দ্বারাও গ্রস্ত হন না, তবে কি ছেদন করবেন? গীতা (৪।১৩) তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, '**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**' -- চারটি বর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। '**তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্তারমব্যয়ম্**।'— এর কর্তা অব্যয় আত্মা আমাকে অকর্তাই জানবে। কর্ম আমাকে লিপ্ত করে না; কারণ কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই। এই নির্ধারিত কর্মের ফল পরমাত্মা এবং তিনি আমার থেকে পৃথক্ নন। এর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই তবে কি লাভ করার ইচ্ছা হবে? এটাই মহর্ষি পতঞ্জলিও বলছেন যে, যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়ে থাকে। তাঁরা কর্ম করলে শুভ-অশুভ কোন পরিণাম দেখা যায় না।

যোগ পথের বৈশিষ্ট্য হল বৃত্তিগুলির সংযম। যে কোন সাধক, যিনি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে প্রবৃত্ত, তিনি এই পথে চলে লক্ষ্যে পৌঁছান। কবীর লেখা-পড়া করেননি; কিন্তু যখন স্থিতি লাভ করেছিলেন তখন বলেছিলেন, **'আঁখ ন মুদূঁ কান ন রুঁধূ, কায়া কষ্ট ন ধারোঁ। উঘরে নয়না সাহব দেখূঁ, সুন্দর রূপ নিহারোঁ। সন্তো! সহজ সমাধি ভলী।'**

অন্যান্যদের কর্ম তিনপ্রকারের। গীতাশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।। (১৮।১২)

সকামী ব্যক্তিগণ কর্মের ভাল, মন্দ ও মিশ্রিত—এই তিন প্রকার ফল, মৃত্যুর পরেও লাভ করে, জন্মান্তর পর্যন্ত ভোগ করে; কিন্তু **'সন্ন্যাসিনাম্'**—সর্বস্বের ন্যাস (ত্যাগ) করেছেন যে পূর্ণত্যাগী পুরুষগণ, তাঁরা কোন কর্মফল ভোগ করেন না অর্থাৎ যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়।

পুনরায় সামান্যজনদের কর্মের উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন—

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।। ৮।।

উক্ত তিনপ্রকার কর্ম দ্বারা ফলভোগ কালে অনুকূল বাসনাগুলিরই অভিব্যক্তি হয়। অর্থাৎ উপযুক্ত বাতাবরণ ক্ষেত্র পেয়েই বাসনাগুলি প্রকট হয়। যে সময় যে বাসনার প্রকট হওয়ার সুযোগ আসে সেসময় শুধু সেগুলিই প্রকট হবে, বাকী সব সঞ্চিত থাকবে।

যিনি যোগীপুরুষ নন, প্রারম্ভিক স্তরের, তার কর্মগুলির ফল তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। এটাই হল শুক্ল, কৃষ্ণ এবং মিশ্রিত ফল। সেই ফলভোগ অবশ্য করতে হয়, তাতে কোন বাধা নেই; কারণ—

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং
স্মৃতি সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ।। ৯ ।।

জাতি অর্থাৎ জন্ম, দেশ অর্থাৎ কোন স্থান এবং কাল অর্থাৎ সময়—এই তিনটির ব্যবধান থাকলেও কর্ম সংস্কারগুলিতে **'আনন্তর্যম্'** – ব্যবধান উৎপন্ন হয় না; কারণ স্মৃতি এবং সংস্কার দুটির স্বরূপ এক। স্মৃতিতে তাই অঙ্কিত হয়, যা সংস্কারে আছে।

সেই সময় স্মৃতি উত্তমরূপে শুদ্ধ হয়, যখন এই সংস্কারগুলির সৃজন বন্ধ হয়। **'স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসানির্বিতর্কা ।' (১।৪৩)** সেই সময় স্মৃতি পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় এই অবস্থাতে চিত্তের স্বরূপ শূন্য হয়ে যায়। ধ্যেয় লক্ষ্যমাত্রের আভাস পাওয়া যায়। এটা নির্বিতর্ক সমাধির অবস্থা, এই অবস্থাতেও বীজ বিদ্যমান থাকে। যখন অন্তরে কোন সংস্কারই বাকী নেই তখন স্মৃতিপটে কি অঙ্কিত হবে?

সংস্কারগুলির গতি অবাধ থাকে। এগুলি জন্মান্তরেও যত্র-তত্র সর্বত্র কর্তাকে অনুগমন করে। কাকভুশুন্ডিজী অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অনেক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, কাল-চক্র অতিক্রম করেছিলেন; কিন্তু কোন ব্যবধান উৎপন্ন হয়নি। **'কবনেউঁ জন্ম মিটিহি নহিঁ গ্যানা। সুনহি সূদ্র মম বচন প্রবানা।' (মানস, ৭।১০৮ ঘ।৮)** কোন জন্মে জ্ঞান লুপ্ত হয়নি। এটা অবশ্যম্ভাবী—

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ।। ১০।।

'তাসাম্'—সেই স্মৃতি এবং সংস্কারগুলির ঐক্য অর্থাৎ কর্ম-সংস্কারগুলিতে ব্যবধান উৎপন্ন না হওয়া **'অনাদিত্বম্'**—অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান; কারণ স্মৃতি এবং সংস্কার উভয়ের একরূপ। বাসনাগুলি স্মৃতিতে অঙ্কিত অনাদিকাল, শুরু থেকেই হয়। এই কারণেই প্রাণীদের মধ্যে **'নিত্যত্বাৎ'**—শাশ্বত স্বরূপ লাভ করার ইচ্ছা নিত্য বলবতী হতে থাকে। গীতাতে উল্লিখিত আছে—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।(১৩।১৯)

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে, এইরূপ বিকারসমূহকেও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

জিজীবিষা, সুখ সামগ্রী লাভ করার লোভ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ?—

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ।। ১১।।

হেতু, ফল, আশ্রয় এবং আলম্বন—এই চারটি দ্বারা সংস্কারগুলির সংগ্রহ হয়, যার ফলে বাসনা ক্রিয়াশীল হয়। এই চারটির অভাব হলে সংস্কারেরও অভাব হয়।

বাসনা এবং তজ্জনিত সংস্কারগুলির কারণ অবিদ্যাদি ক্লেশ, এগুলির প্রভাবে সম্পাদিত কর্ম এবং সাধনাজনিত কর্মও রয়েছে। এগুলি একত্র হয়ে ভাল-মন্দ সংস্কারই তো সৃজন করে। এর ফল হল পুনর্জন্ম, আয়ু এবং ভোগ। এ সমস্ত চিত্তের মাধ্যমে কাজ করে সেইজন্য এগুলির আশ্রয় হল চিত্ত এবং যার দ্বারা কাজ করে, যা ধারণ করে সেই শব্দাদি বিষয় হল আলম্বন। আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব, বিভাব এবং সঞ্চারী ভাব দ্বারা রসের সঞ্চার হয়, যার ফলে চিত্ত বিগলিত হয়ে সংস্কারগুলির দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়। উপর্যুক্ত চারটি মাধ্যমের অভাবে এই বাসনা এবং সংস্কারগুলির সর্বথা অভাব হয়। এগুলির অভাব হলেই ধর্মের উদয় হয়। এখানে মহর্ষি 'ধর্ম' শব্দের পুনরায় প্রয়োগ করেছেন—

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্ ।। ১২।।

'ধর্মাণাম্'—ধর্মগুলিতে **'অধ্বভেদাৎ'**—কালের ভেদ দেখা যায়। এই কারণে যা অতীত হয়ে গেছে— বাসনা ইত্যাদি; এবং যা **'অনাগতম্'**—আসেনি এখনও প্রকট হয়নি—স্বরূপের উপলব্ধি—সেখানেও স্বরূপের মাধ্যমে ধর্ম বিদ্যমান থাকে।

ধর্মে কালের ভেদ থাকে। এই কারণেই অবিদ্যা, বাসনা, চিত্তবৃত্তিগুলি যেগুলি অতীত হয়ে গিয়েছে; ভজনা দ্বারা যে সংস্কার ছিন্ন করা হয়েছে এবং '**অনাগতম্**'—যা প্রকট হয়নি, পরে প্রকট হবে; স্থিতি যা লাভ হবে, সেখানেও ধর্ম স্বরূপের মাধ্যমে বিদ্যমান থাকে, পরমচেতন পরমাত্মা ধর্ম। '**ধরমু ন দূসর সত্য সমানা।' (মানস ২।৯৪।৫); 'সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য' (গীতা, ১৮।৬৬)** অর্জুন ! সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক কেবল একমাত্র আমার শরণাগত হও। একমাত্র ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্ম—

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ।। ১৩ ।।

সেই ধর্ম ব্যক্ত স্থিতিতে এবং সূক্ষ্ম স্থিতিতে গুণস্বরূপই। গুণগুলির যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—উন্নত, মধ্যম, মলিন প্রভাব থাকে সেইপ্রকার এদের রূপও হয়ে থাকে। যেমন প্রথম পাদের চতুর্থ সূত্রে উল্লিখিত আছে—'**বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র।**' যে প্রকার বৃত্তির রূপ, আপনি বাস্তবে তাই।

কিন্তু যখন তিনটি গুণেরই প্রভাব সম হয় তখন, এই প্রসঙ্গে বলছেন—

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্।। ১৪।।

কিন্তু '**পরিণাম একত্বাৎ**'—পরিণাম একসমান থাকার জন্য তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক কিছু নন। তাঁর কার্য শান্ত হয়েছে, এই অবস্থাতে 'বস্তুতত্ত্বম্'—বিষয়-বস্তু যা—যোগ, যোগাভ্যাস তত্ত্বরূপে প্রকট হয় অর্থাৎ সত্য বস্তু দ্রষ্টা আত্মা পরমাত্মাকে জানতে সাহায্য করে, তত্ত্বজ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর উপরই জোর দিয়েছেন—অর্জুন ! এই কর্ম (নির্ধারিত কর্ম) না করে কেউ সৃষ্টিতে লাভ করেনি, এবং ভবিষ্যতেও কেউ লাভ করবে না। জনকাদি ঋষি এই কর্ম করেই নৈষ্কর্ম্য—স্থিতি লাভ করেছিলেন; কিন্তু অভ্যাস যখন এত উন্নত হয় যে, কর্মের পরিণামে আত্মা বিদিত, আত্মতৃপ্ত, আত্মস্থিত, সেই পুরুষের জন্য কিঞ্চিৎ কর্তব্যও বাকী থাকে না, প্রাপ্ত যোগ্য অপ্রাপ্য থাকে না। এটাই হল 'পরমতত্ত্ব'। গুণগুলির কার্য সমাপ্ত হলে সেই বস্তুতত্ত্ব প্রকট হয়।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ।। ১৫।।

বস্তু এখানে পরমাত্মা। '**বস্তুসাম্যে**'—বস্তুর সম স্থিতিতে '**চিত্তভেদাৎ**'—চিত্তের ভেদ প্রত্যক্ষই হয়। সেইজন্য '**তয়োর্পন্থাঃ বিভক্তঃ**' চিত্ত এবং এর দ্বারা দৃশ্য বস্তু দুটির পথ পৃথক্-পৃথক্।

বস্তু পূর্ণ। চিত্ত তাতে বিলীন হয়। প্রকৃতি সেই বস্তুতে পরিবর্তিত হয় '**তয়োর্পন্থাঃ বিভক্তঃ**'—উভয়ের পথ পৃথক্ - পৃথক্। চিত্ত ত্রিগুণ পর্যন্ত, প্রকৃতি পর্যন্তই কর্ম করে। সেই দ্রষ্টা ব্যাপক। পুনরায় সেই চিত্তের উপর আলোকপাত করছেন—

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ।। ১৬।।

এছাড়া বস্তু (সেই পরমাত্মা) কোন একটা চিত্তের অধীনে নেই; কারণ যখন সেই চিত্তের বিষয় থাকবে না, সেই সময় '**কিং স্যাৎ**'—চিত্তের কি প্রয়োজন? চিত্ত শান্ত প্রবাহিত থাকে। অতএব বস্তু যখন প্রমাণিত হয় তখন পৃথকরূপে চিত্তের কাজ কি? চিত্ত চেতনেরই প্রসারণ কেন্দ্র হয়ে যায়।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্।। ১৭।।

চিত্ত উপরাগাপেক্ষী-এর উপর বস্তুর প্রতিবিম্ব যাতে পড়ে এর এই অভিলাষা। সেইজন্য এর দ্বারা বস্তু কখনও জ্ঞাত আবার কখনও অজ্ঞাত হয়ে যায় অর্থাৎ কখনও ধ্যান প্রগাঢ় হয়, কখনও হয় না। যতটা ভগবানের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়, ততটা দর্শন করে; স্পষ্ট না হলে দর্শন হয় না। কিন্তু ভগবান সর্বজ্ঞ। ভগবান যতটুকু বলেন, চিত্ত ততটুকুই জানতে পারে।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ ।। ১৮।।

সেই চিত্তের স্বামী পুরুষ পরিণামী নয় অর্থাৎ এর কোন পরিণাম দেখা যায় না, সেইজন্য চিত্তের বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে সর্বদা জ্ঞাত থাকে।

'**তৎপ্রভোঃ**'—চিত্তের স্বামী একরস থাকেন, সেইজন্য চিত্তবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে সে, সদৈব অবগত। কে কখন কোথায় আছে বিদিত হওয়ার জন্য সেগুলি সঞ্চালিত করতে থাকে। চিত্ত যা জানে, সেসবই দৃশ্যের মাধ্যমে—

ন তৎস্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ।। ১৯।।

সেই চিত্ত স্বপ্রকাশ—প্রকাশস্বরূপ নয়; কারণ তা '**দৃশ্যত্বাৎ**'—দৃশ্যের জন্য ক্রিয়াশীল।

চিত্তে যে প্রকাশ দেখা যায়, তা পুরুষ দ্বারা প্রসারিত দৃশ্য দ্বারাই চিত্ত প্রকাশিত হয়। চিত্তের নিজের কোন প্রকাশ নেই, নিজের ক্ষীণ প্রকাশও নেই। চিত্ত যা কিছু দর্শন করে, চিত্তে যে প্রকাশ দেখা যায়, তা দৃশ্যের কারণেই। এই দৃশ্য দ্রষ্টা—দৃশ্য সংযোগ, যা তুচ্ছ হেতু। দৃশ্য সেইরূপ যা প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি প্রদান করে; যা এই আত্মার জন্য ভোগ, অপবর্গ, পরম মুক্তির সম্পাদন করে। এসব পুরুষ দ্বারা সঞ্চালিত যিনি চিত্ত সম্বন্ধে অবগত। চিত্তের প্রকাশ দৃশ্যের কারণেই অন্যথা মানুষ অন্ধ। বৃত্তি তো বৃত্তিই—'**গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ। সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।।' (মানস ৩।১৪।২)** সেইজন্য কেউ কল্পনা করলে তা মায়া, অন্ধকার স্বরূপ, সেখানে কোন প্রকাশ নেই—যা কিছু দেখা যায় তা 'দৃশ্যত্বাৎ'। দৃশ্যের কাজ হল—পুরুষের জন্য ভোগ প্রদান করা। এইরূপ ভোগ কি মোক্ষলাভে সহায়ক? শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—'**ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।।**' (৫।২৯) সেই পুরুষের

ভোগ হল যজ্ঞ, তপস্যা এবং সংযম। সেই দৃশ্য মুক্তির পূর্ণ সম্পাদন করে। অতএব, চিত্তে যে প্রকাশ দেখা যায়, তা দৃশ্যের কারণেই।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।। ২০।।

'উভয় অনবধারণম্'—একটা সময়েই চিত্ত এবং দৃশ্য—উভয়ের স্বরূপের জ্ঞান হওয়াও সম্ভব নয়; কারণ চিত্ত তো চিত্তই। দৃশ্য যখনই উপস্থিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হয়। কখন কি প্রসারিত হবে তা একেবারেই জানা সম্ভব নয়। তা তো অনুভবে অঙ্কিত হলেই বোধগম্য হয়।

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ।। ২১।।

'চিত্তান্তরদৃশ্যে'—দৃশ্যের মাধ্যমে চিত্ত একপ্রকার থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তিত হয় এবং **'বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ'**—বুদ্ধিতে বৌদ্ধিক বিকাশের যে অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ উক্ত হয়েছে তাও দৃশ্য দ্বারাই প্রকট হয় এবং **'স্মৃতিসঙ্করশ্চ'**-স্মৃতিতে এর মিশ্রণ হয়ে থাকে। স্মৃতি তখনই পূর্ণ হবে, যখন ভজনা সম্পূর্ণ হবে। সেইজন্য পূর্ব বিচারগুলিতে সাধনাত্মক দৃশ্যের মিশ্রণ হয়ে থাকে।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্।। ২২।।

যদ্যপি চেতন-শক্তি পুরুষ ক্রিয়ারহিত এবং অসঙ্গ থাকে তা সত্ত্বেও **'তদাকারাপত্তৌ'**—তদাকার স্থিতি, একাগ্রতা লাভ হলে সাধকের নিজ চিত্তের জ্ঞান হয়। **'স্ববুদ্ধিসংবেদনম্'**—একাকার হওয়ার পর বুদ্ধি স্বরূপের স্থিতিযুক্ত হয়, বুদ্ধিতে—স্বরূপের অনুভব প্রবাহিত হয়।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্।। ২৩।।

দ্রষ্টা এবং দৃশ্য—এই দুটি দ্বারা রঞ্জিত চিত্ত **'সর্বার্থম্'**—সম্পূর্ণ অর্থ—দৈবী সম্পদ্ লাভে সহায়ক হয়; কারণ দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগ আত্মা, পুরুষের জন্য মুক্তির সম্পাদন করে। সেইজন্য দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগ 'সর্বার্থ'—সমস্ত অর্থযুক্ত, কৈবল্য পদের উপলব্ধি করায়। এতে **'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ। অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।' (গীতা, ২।১৮)** অবিনাশী, অপ্রমেয় ও নিত্যস্বরূপ আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলে উক্ত হয়েছে। অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। আত্মাই অমৃত, আত্মাই অবিনাশী, যার তিনকালে বিনাশ নেই। আত্মাই সৎ। **'দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্'** দ্রষ্টা যিনি চৈতন্য, নির্মল এবং দৃশ্য-পুরুষের জন্য ভোগ, অপবর্গ (মুক্তি)-এর সাধন একত্র করা যার প্রয়োজন; ক্রিয়া, স্থিতি প্রদান করাই যার প্রয়োজন—এই দুটি দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে যে চিত্ত ক্রিয়াশীল তা সমস্ত অর্থযুক্ত হয়, সম্পূর্ণ অর্থ নৈষ্ঠিকীম্ সিদ্ধি প্রদান করে, আরো বলছেন—

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ।। ২৪।।

সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনা দ্বারা চিত্রিত হলেও পরার্থ অর্থাৎ পরম অর্থকে সিদ্ধ করবে। কারণ এই চিত্তই সমস্ত বাসনা ছিন্ন করে। যাঁর চিত্ত দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগে রঞ্জিত এইরূপ যোগী অসংখ্য বাসনার সংসর্গে থাকলেও নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকে। বাসনা দ্বারা লিপ্ত হয় না। '**পদ্মপত্রমিবাম্ভসা**'—কর্দম এবং জল দ্বারা নিরন্তর ধৌত হলেও পদ্মপত্র সিক্ত হয় না, স্বচ্ছ থাকে; সেইপ্রকার মহাপুরুষগণও নির্মল এবং অনাবিল হন। তাঁদের সংসর্গে যাঁরা থাকেন, তাঁদেরও কল্যাণ হয়। পূজ্য গুরুদেবের নিবাসস্থান বর্বর দস্যু এবং বন্য কোল-ভীল জাতির মানুষের মাঝে ছিল; কিন্তু মহারাজজীর সান্নিধ্যে থেকে তাদের সকলের হৃদয়-পরিবর্তন হয়েছিল, নিষ্ঠুরতা শেষ হয়েছিল এবং তারা ভজন-চিন্তনে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ।। ২৫।।

'**বিশেষদর্শিনঃ**'—সেই বিশেষপুরুষকে দর্শন করার পর যোগীর চিত্তে আত্মভাব থাকে না যে আমি যোগী, আমি সমর্থ, আমি আত্মবান; কারণ তিনি জানেন যে, হর্তা-কর্তা-বিধাতা তো সেই বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর। দেহাধ্যাস সমাপ্ত হয়। এই অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর চিত্তের স্থিতি কিরূপ হয়?

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্।। ২৬।।

সেই সময় যোগীর চিত্ত বিবেকের দিকে আকৃষ্ট কৈবল্য পদের দিকে উন্মুখ হয়। বিশেষ-দর্শনের সঙ্গে আত্মশ্লাঘার নিবৃত্তি তো হয় কিন্তু শুধু দর্শন হয়েছে স্বরূপে স্থিতি লাভ তো হয়নি, সেইসময় চিত্ত গম্ভীররূপে বিবেকী হয়, কৈবল্য লাভের পথে অগ্রসর হয়। এইরূপ চিত্ত দ্বারা শুভাশুভ কিছু সৃজন হয় না।

কিন্তু সেই চিত্তে যে উদ্বেগ দেখা দেয়, সেগুলি কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ।। ২৭।।

সেই সমাধিস্থ চিত্তের অন্তরালে বিপরীত বস্তুগুলির স্ফুরণ পূর্ব-সংস্কার এর ফলে হয়। এই অবস্থাতে চিত্তের বিবেকের প্রতি আকর্ষণ থাকে অর্থাৎ এই অবস্থা সবীজ সমাধির। '**তচ্ছিদ্রেষু**'-এর অন্তরালে যে বিজাতীয় ছিদ্র, অন্য পদার্থের জ্ঞান থাকে, তা পূর্ব সংস্কারের ফলেই থাকে। এই অবস্থাতে সংস্কার থাকে, অল্পই থাকে, নিরোধের সংস্কার এটা কিন্তু তবু ক্রিয়াশীল। সংস্কারের জন্য চিত্তে বিরোধীভাব অঙ্কিত হয়। নতুন কর্ম-সংগ্রহ তো হয় না, পূর্ব সংস্কারের জন্যই হয়। নতুন সংগ্রহ হয় না।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।। ২৮।।

ক্লেশের ন্যায় এই সংস্কারগুলি ছিন্ন করতে বলা হয়েছে। ক্লেশ ইত্যাদি যত ক্ষতিকারক, ততটাই ক্ষতিকারক এই সংস্কার। ক্লেশের ন্যায়ই এগুলি ছিন্ন করা

আবশ্যক। চেষ্টাতে অলসতা থাকা উচিৎ নয়। এই সংস্কারগুলি ছিন্ন হলেই ধর্মমেঘ সমাধির অবস্থা চলে আসে—

প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেক খ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।। ২৯।।

যে যোগীর বিবেক-জ্ঞান-এর মহিমাতেও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাঁর বিবেক-জ্ঞান সর্বথা প্রকাশমান থাকার জন্য তিনি ধর্মমেঘ সমাধি লাভ করেন—যেখানে ধর্ম ছাড়া কিছু নেই, চিদাকাশ সম্পূর্ণরূপে ধর্মে আবৃত। ধর্ম শাশ্বত, সনাতন, পরমসত্য; তিনি ক্লেশ কর্মের অতীত ঈশ্বর! যোগী সর্বত্র দ্রষ্টার সঞ্চারই দেখে থাকেন— **'ঈশাবাস্যমিদংসর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' (ঈশাবাস্যোপনিষদ্, ১)।**

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ।। ৩০।।

এই ধর্মমেঘ সমাধি লাভ হলে ক্লেশ, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এবং এগুলি থেকে উৎপন্ন কর্ম—সংস্কারগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায়।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌জ্ঞেয়মল্পম্।। ৩১।।

যাঁর সমস্ত আবরণ এবং আবিলতা দূরীভূত হয় তাঁর জ্ঞান অনন্ত, সীমারহিত হয়ে যায়, এইজন্য **'জ্ঞেয়ং অল্পম্'**—জ্ঞেয় পদার্থ পরমাত্মা এবং সাধকের মাঝে অত্যন্ত অল্প ব্যবধান থাকে।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্।। ৩২।।

দ্রষ্টার অনুভূতি, তদনন্তর জ্ঞেয়র অনুভূতি, অল্প ব্যবধান যা বাকী ছিল, তাও দূর হয়—এইপ্রকার সাধক যখন কৃতার্থ হন, নিজের কাজ সম্পূর্ণ করেন—এইরূপ পুরুষের সমক্ষে গুণের প্রভাব, পরিণাম-ক্রম সমাপ্ত হয়। গুণ তিনটি - সত্ত্ব, রজ এবং তম। এই গুণত্রয় তিন প্রকারের প্রভাব উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট উৎপন্ন করে। এদের প্রভাব নিরন্তর কাজ করে। এই অবস্থা লাভ হলে এই ক্রম সর্বদার জন্য সমাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই যোগী গুণত্রয় থেকে অতীত হন।

সেইসময় সাধনার ক্রম কিরূপ থাকে?—

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ।। ৩৩।।

যিনি ক্ষণগুলির প্রতিযোগী এবং **'পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ'**— যাঁর স্বরূপ পরিণামের শেষে বোধগম্য হয়, তা হল ক্রম।

শুরুতে সাধক অনেকক্ষণ ধরে ভজনাতে বসে থাকলেও কয়েক মিনিটই ভজনাতে মন একাগ্র করতে পারে। উন্নত অবস্থা লাভ হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েক মিনিটই ব্যর্থ যায় এবং সংযম দৃঢ় হলে প্রশ্বাস গ্রহণে ওঁ নিশ্বাস ত্যাগে ওঁ—মাঝে একটা শ্বাসও অজ্ঞাতসারে ব্যর্থ যায় না। এই অবস্থাতে সাধক প্রতিযোগী, সাধকের প্রত্যেকটা ক্ষণের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। সাধনা এই অবস্থাতে পৌঁছে যায় যে,

একটা শ্বাসও ব্যর্থ যায় না, সেই সময় পরিণাম-ক্রম অন্তিম পরিণাম পর্যন্ত নির্গ্রাহ্য হয়ে যায়, এর কোন প্রয়োজনই থাকে না। এই অবস্থাতে ক্ষণ-ক্রম কিছু গ্রহণ করে না। এই পরিণামের সঙ্গে পুরুষার্থ সম্পূর্ণ হয়।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।।৩৪।।

পুরুষের কোন কর্ম বাকী থাকে না, এখন এই অবস্থাতে সাধনা সম্পূর্ণ হয়, গুণত্রয়ের স্বকারণে বিলীন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দ্রষ্টার স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হল কৈবল্য।

গুণত্রয়ের স্বকারণে বিলীন হওয়া '**চিতিশক্তেঃ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা**' দ্রষ্টার স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া '**কৈবল্যম্**'—একেই কৈবল্যপদ বলে। গুণ আর নতুন কিছুর জন্ম দেয় না, স্বীয় কারণে লীন হয়। এখানে দ্রষ্টা স্বীয় স্বরূপে স্থিত হন। এটাই হল কৈবল্যপদ। এখানে সাধনা সম্পূর্ণ হয়।

এই শাস্ত্রের শুরুতে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' এর যে প্রস্তাবনা ছিল, 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্'-এর যে প্রস্থাপনা ছিল, তাই এইখানে সমাপ্ত হয় দ্রষ্টা স্বীয় স্বরূপে স্থিত হন। এটাই কৈবল্য-স্থিতি। এর সঙ্গেই যোগী শাশ্বত জীবন, শাশ্বত শান্তি এবং শাশ্বত স্থিতি লাভ করেন। এইপ্রকার এই কৈবল্যপাদ এখানেই সম্পূর্ণ হল।

নিষ্কর্ষ—

সিদ্ধাইয়ের সংখ্যা অনেক। সংসার থেকে আলাদা কিছু বিলক্ষণতা প্রাপ্ত করাকে সিদ্ধাই বলে। এই সিদ্ধাইগুলির মধ্যে অষ্টসিদ্ধি এবং অন্যান্য সিদ্ধাইয়ের উল্লেখ এই যোগ দর্শনের তৃতীয় পাদে করা হয়েছে; কিন্তু পরম-সিদ্ধি হল—পরমতত্ত্ব পরমাত্মার জ্ঞান, তাঁকে জানা। এই সিদ্ধি অনেক জন্মের সাধক সাধনার পরিপক্ক অবস্থা লাভ হলে জন্মের পরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লাভ করেন। সাধনাতে অবস্থা ভেদ অনুসারে শেষ সাধকগণ ঔষুধ অর্থাৎ ভক্তি। **['রঘুপতি ভগতি সজীবন মুরী।' (মানস ৭।১২১খ।৪)]**, মন্ত্র, তপস্যা এবং সমাধির দ্বারা সফলতা লাভ করেন।

পূর্ব প্রকৃতি সম্পূর্ণ হলে এবং পরবর্তী উন্নত প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হলে জন্ম পরিবর্তন হয়। যে প্রকৃতি চিত্তকে মুগ্ধ করে রেখেছে সেই প্রকৃতি শান্ত হলে এবং উন্নত প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব হলে—জন্ম-পরিবর্তন হয়। জন্ম, ঔষুধি অর্থাৎ ভক্তি, মন্ত্র, তপস্যা এবং সমাধি—এগুলি নিমিত্তের কাজ করে। এগুলির দ্বারা প্রকৃতির সঞ্চালন হয় না প্রত্যুত্ অবরোধ দূর করে দেওয়া হয়, যার ফলে উন্নত প্রকৃতি স্বতঃ প্রসারিত হয়। এই প্রকার চিত্তের এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তন হল জাত্যন্তর—পরিণাম, জাতি-

পরিবর্তন, জন্ম পরিবর্তন, একটা রচনা। এই নির্মাণ চিত্তে যতক্ষণ অস্মিতা থাকে ততক্ষণই হয়। আত্মা এবং বৃত্তিগুলির মিশ্রণ হল অস্মিতা। চিত্তের অনেক প্রবৃত্তি স্থির করা, একমাত্র ঈশ্বরে সমর্পিত করা, একমাত্র ঈশ্বরে নিযুক্ত করা হল চিত্তের কাজ। এগুলির মধ্যে ক্রমশ ধ্যানের স্থিতি লাভ হলে ধ্যানজনিত চিত্তের **'অনাশয়ম্'**—কখনও বিনাশ হয় না; কারণ এইরূপ যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়। অন্যান্যদের কর্ম তিনপ্রকারের হয়। সেই সমস্ত কর্ম বাসনারই জন্ম দেয়। অনন্ত জন্ম পরিবর্তন এবং কালের অন্তরাল হলেও সেই কর্মগুলি নির্ধারিত সময়ে প্রকট হয়ে যায়; কারণ স্মৃতি এবং সংস্কারের একই স্বরূপ। স্মৃতিতে তাই অঙ্কিত হয় যা সংস্কারের পরতে-পরতে থাকে। এদের মধ্যে ঐক্য অনাদিকাল থেকেই সেইজন্য সদা **'নিত্যত্বাৎ'**—'নিত্য স্বরূপ লাভ করে নিই'—এই মনোভাব এর মধ্যে থাকে। হেতু, ফল, আশ্রয় এবং আলম্বন—এদের দ্বারাই এই সংস্কারগুলির, বাসনাগুলির সৃজন হয়। এই চারটির অভাব হলেই বাসনা এবং সংস্কার সর্বদার জন্য শেষ হয়।

সংস্কারের হেতু অবিদ্যা ইত্যাদি হল ক্লেশ। ফল পুনর্জন্ম, আয়ু এবং ভোগ। চিত্ত এর আধার এবং বিষয় আলম্বন। এর অভাবের সঙ্গেই এই সংস্কার সদার জন্য মিটে যায়। সংস্কার মিটলেই ধর্মের প্রসঙ্গ চলে আসে যা কালের ভেদ হলেও হেতু, ফল, আশ্রয় এবং আলম্বন; তা অতীত হয়, **'অনাগত'**—যা এখনও প্রকট হয়নি; যেমন—স্বরূপের প্রাপ্তি, স্থিতি ইত্যাদিতে ধর্ম **'স্বরূপতোহস্তি'**—সদা স্বরূপে বিদ্যমান এবং প্রসারিত থাকে। গুণের অনুসারে এই ধর্ম উত্তম, মধ্যম এবং মলিন অবস্থাতে দেখা যায়; কিন্তু আছে স্থির এবং প্রত্যক্ষ। পরিনামের ঐক্যে **'বস্তুতত্ত্বম্'**—যা যোগ-সাধনা করছিলেন, সেই সাধনালব্ধ বস্তু চেতন দ্রষ্টার তত্ত্বরূপে বিদিত হওয়া সম্ভব। **'বস্তুসাম্যে চিত্তম্'**—বস্তুর সাম্য অবস্থাতে চিত্তের ভেদ স্পষ্ট হয় যে, চিত্তের রাস্তা পৃথক্ এবং বস্তু এর থেকে ভিন্ন, পৃথক্ সত্তা। বস্তু হলেন পরমাত্মা। এই চিত্ত এই বস্তুর প্রতিবিম্বের আকাঙ্ক্ষী। বস্তুর যতটা প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়, চিত্ত সেটুকুই জানতে পারে; অন্যথা জানতে পারে না। কিন্তু সেই বস্তু দ্রষ্টা অর্থাৎ পরমাত্মা। তিনি চিত্তের বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে অবগত। চিত্তে যে প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়, তা দ্রষ্টা-দৃশ্যের দ্বারা। চিত্তে যতটা দৃশ্য প্রসারিত হয়, ততটুকু সম্বন্ধেই চিত্ত জানতে পারে, এর বেশী দেখতে অসমর্থ।

যদ্যপি সেই চেতন-শক্তি ক্রিয়ারহিত এবং অসঙ্গ তবুও একাকার হলে **'স্ববুদ্ধিসংবেদনম্'**— বুদ্ধিতে স্বরূপের সংবেদনা প্রাপ্ত করে। কিরূপে সংবেদনা প্রাপ্ত করে? কার দ্বারা প্রাপ্ত করে? এই প্রসঙ্গে মহর্ষি বলছেন—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য দ্বারা রঞ্জিত চিত্ত **'সর্বার্থম্'**—সম্পূর্ণরূপে অর্থ সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেয়। এটাই হল অনুভব। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যে রঞ্জিত হওয়ার ফলেই চিত্ত **'পরার্থম্'**— পরমার্থিক অর্থ আয়ত্তাধীন

করে; কারণ চিত্ত সমস্ত বাসনা ছেদন করে, '**বিশেষদর্শিনঃ**'— ক্লেশ-কর্মের অতীত বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর দর্শন করেন। এইরূপ চিত্ত প্রত্যক্ষ করে। সেই সময় তার আত্মভাব, অহং, যে, আমি যোগী এই ভাব সর্বদার জন্য বিলুপ্ত হয়। সেই অবস্থাতে চিত্ত বিবেকের দিকে আকৃষ্ট এবং কৈবল্য স্বরূপ লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

এইরূপ চিত্তে কখনও-কখনও যৎকিঞ্চিৎ স্ফুরণ হয়, সূক্ষ্ম সংস্কার প্রস্ফুটিত হয়। এই সংস্কারগুলিও ক্লেশের ন্যায় ভয়ঙ্কর। সাধককে অসাবধান অথবা আলস্য করা উচিৎ নয়। এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিরও বিনাশ ক্লেশের ন্যায় অনিবার্য। সাধককে এগুলিরও উন্মুলন পর্যন্ত সাধনাতে নিযুক্ত থাকা উচিৎ।

এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি ছিন্ন হলে যোগী বিবেক-জ্ঞান-এর মহিমাতেও বৈরাগ্য-পরম বৈরাগ্যের স্থিতি লাভ করেন। তাঁর বিবেক-জ্ঞান সর্বপ্রকারে প্রকাশমান থাকার জন্য '**ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ**'— আকাশবৎ স্থিতি লাভ হয়। এইরূপ অবস্থা লাভ হলেই সমস্ত ক্লেশ এবং সমস্ত শুভাশুভ কর্মের অবসান হয়। যাঁর সমস্ত আবরণ এবং আবিলতা দূরীভূত হয়—এই অবস্থাতে জ্ঞান অনন্ত, সীমারহিত হয়ে যায়। '**জ্ঞেয় অল্পম্**'—জ্ঞেয় জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা সম্বন্ধে যৎসামান্যই জানা বাকী থাকে। সবকিছু প্রায় জানা সামান্য তফাৎটুকু সম্বন্ধেও যখন জানা হয়ে যায়, তখন যোগী কৃতার্থ হন, তাঁর কর্তব্য শেষ হয়— '**ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রম সমাপ্তির্গুণানাম্।**' (৪।৩২) এর পর নিজের কাজ সম্পূর্ণ করার পর গুণত্রয়ের পরিণাম—ক্রম সমাপ্ত হয়। এই অবস্থাতে গুণ কোন পরিণাম উৎপন্ন করতে পারবে না। সেই সময় প্রত্যেক শ্বাস, প্রত্যেক ক্ষণের উপর যোগীর নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। আগে সাধক কয়েক ঘণ্টার প্রতিযোগী থাকেন, সাধনা ক্রম বোঝার পর ক্ষণের প্রতিযোগী হয়ে যান, একটা শ্বাসও ব্যর্থ যায় না। এই পরিণামের পর '**নির্গ্রাহ্য ক্রমঃ**' —ক্রম কিছু নির্মাণ অথবা গ্রহণ করে না—তা ভাল-মন্দ যাই হোক। এটাই তার পরিণাম। এই অবস্থাতে পুরুষার্থ, সাধনা সম্পূর্ণ হয়।

'**পুরুষার্থশূন্যানং গুণানং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।**' (৪।৩৪) যার স্বরূপের জন্য পুরুষার্থ, যোগ-সাধনা ক্রম, পরিশ্রম পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়, সেইসময় গুণত্রয়ের স্বীয় কারণে বিলীন হওয়া অথবা দ্রষ্টার স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই কৈবল্যপদ লাভ বলে। যেখানে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ বলে কিছু নেই—অভয়পদ, অমৃতময় পদ, শাশ্বত শান্তি বিদ্যমান। '**তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।' (গীতা, ১৮।৬২)** ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অর্জুন! হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁর কৃপাতে তুমি পরমশান্তি লাভ করবে। সেই স্থান লাভ করবে যা শাশ্বত, সনাতন।

।। ওঁ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

উপসংহার

● **পুরুষের দুটি প্রকার,**

গীতার অনুসারে **'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে।।' (১৫।১৬)** সংসারে দু'প্রকারের পুরুষ দেখা যায়—ক্ষর এবং অক্ষর। তৃতীয় পুরুষ উত্তম, যিনি অনির্বচনীয়। পরমাত্মা এবং পুরুষোত্তম বলা হয়; কিন্তু তিনি অনির্বচনীয়।

ঠিক এই প্রকার মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ দর্শনে পুরুষের স্বরূপ দুটোই—প্রথম দ্রষ্টার কালের অতীত আত্মস্বরূপে স্থিতি এবং দ্বিতীয় যেরূপ বৃত্তিগুলির প্রবাহ, সেইরূপই আপনার জন্য পুরুষ। সেটাই আপনার রূপ, তাই দ্রষ্টার রূপ।

মহর্ষি শুরুতেই বৃত্তিগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন। সেসব দু'প্রকারের— ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। যোগের লক্ষ্য হল এই বৃত্তিগুলির নিরোধ। যোগশাস্ত্রের উপক্রম করে মহর্ষি বলছেন— **'অথ যোগানুশাসনম্।'** এখন লক্ষ্য করুন যে, যোগ কাকে বলে? যোগ একপ্রকার অনুশাসন। কাকে অনুশাসন করবেন? **'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' (১।২)**—চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করাকে যোগ বলে। কেউ পরিশ্রম করলেন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য সম্পন্ন করলেন, বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ যদি হয়েই গেল, তবে তাতে কি লাভ? **'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্।' (১।৩)**—নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হন। যা চৈতন্য, অবিনাশী, নির্লেপ সেই স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। নিরোধ হওয়ার পূর্বে দ্রষ্টার স্বরূপ কিরূপ? **'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র'। (১।৪)**—অন্য সময় যা বৃত্তির স্বরূপ, দ্রষ্টা আপনার জন্য সেইরূপ।

যতক্ষণ বৃত্তিগুলি বিদ্যমান, দেহের পরিবর্তন হতে থাকে। **'জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।।' (৪।২)** জাতি অর্থাৎ জন্ম। বর্তমান জন্মের অন্য জন্মে পরিবর্তন হল জাত্যন্তর-পরিণাম। এটা ঘটে **'প্রকৃত্যাপূরাৎ'** — প্রকৃতি পূর্ণ হলে। যে প্রকৃতি চিত্তকে বশীভূত করে রেখেছে সেই প্রকৃতি শান্ত হওয়া এবং উন্নত প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব—এটাই জাতি-পরিবর্তন অর্থাৎ জন্ম-পরিবর্তন, জাত্যন্তর পরিণাম। ক্রমশঃ উন্নতি করতে-করতে চিত্তের এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তন জন্ম-পরিবর্তন। এইরূপ পরিণামের স্থিতিতে দেহত্যাগ হলে পুনরায় দেহধারণে সেইরূপ পরিণামের স্থিতি থেকেই সাধনা গতিশীল হয়। পুরুষের রূপ দুটি। বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হলেই দ্রষ্টা স্বীয় অবিনাশী পরমাত্ম স্বরূপে স্থিত হন, কৈবল্যপদ লাভ করেন; অন্যথা বৃত্তিগুলির

যেরূপ প্রবাহ, আপনার জন্য দ্রষ্টার স্বরূপ তাই এবং আপনি তা'ই, সেটাই আপনার স্বরূপ। বৃত্তিগুলির জন্যই জন্ম-পরিবর্তন হয়।

● কোথা থেকে ভজনা প্রারম্ভ করবেন?

'তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।' (২।১) তপস্যা—মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে ইষ্টের অনুরূপ গড়ে তোলাই তপস্যা। স্বাধ্যায়-কতটা মন নিযুক্ত হওয়া উচিৎ, কতটা আমি প্রবৃত্ত হতে পেরেছি? —উত্তমরূপে হিসাব করে ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাধ্যায়। ঈশ্বর প্রণিধান—একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণই হল ঈশ্বর-প্রণিধান। এখান থেকেই যোগ-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যোগের অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করলে অশুদ্ধি দূর হয় এবং জ্যোতির্ময় পরমাত্মার জ্ঞানের প্রকাশ বিবেক খ্যাতি পর্যন্ত প্রসারিত হয় (২।২৮)।

● অভ্যাস

'স্থিরসুখমাসনম্।' (২।৪৬)—স্থির, চাঞ্চল্যরহিত যে অবস্থাতে সুখ প্রবাহিত—এইরূপ অচল স্থির বসাকে আসন বলে। সোজা স্থির হয়ে বসলে কি সুখ হয়? সহজ সুখ একমাত্র পরমাত্মাতেই পাওয়া যাবে।

যখন তিনি চিন্তনে প্রবাহিত হবেন, তখনই আসন সিদ্ধ হবে।

'প্রযত্নশৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাম্।' (২।৪৭)—উক্ত আসন প্রযত্নের শিথিলতা এবং অনন্ত পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত করলে স্থির হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানের জন্য যে প্রযত্ন করা হয়, সেই অভ্যাসে শিথিলতা চলে আসলে, অর্থাৎ প্রযত্নের প্রয়োজন না হওয়া, সহজেই সমর্পণ হওয়া এবং একমাত্র পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত হলে তখন আসন সিদ্ধ হয়।

চিত্তবৃত্তি দু'প্রকারের—ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা এগুলি নিরুদ্ধ হয়। চিত্তকে এ দুটিতে স্থির করার প্রয়াস হল অভ্যাস। অভ্যাস শুরু ঈশ্বরের শরণাগত, ওঁ জপ, যোগাঙ্গের স্বাধ্যায়ের সঙ্গে হয়। এই অভ্যাস দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিরন্তর আদরপূর্বক, সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রদ্ধাপূর্বক করলে **'দৃঢ়ভূমিঃ'**—দৃঢ় অবস্থাযুক্ত হয়, তখন আসন সিদ্ধ হয়।

অভ্যাসের শেষ সীমা কৈবল্য প্রাপ্তি পর্যন্ত—**'পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।' (৪।৩৪)** **'পুরুষার্থশূন্যানাম্'**—যে পুরুষের কোন কর্তব্য বাকী থাকে না, চিত্ত নিরুদ্ধ করার জন্য তিনি যা প্রযত্ন করতেন, যা পুরুষকার করতেন, সেই পুরুষকার সম্পূর্ণ—এটাকে অভ্যাসের পূর্তিকাল বলে। এই সময় গুণত্রয়ের স্বীয় কারণে বিলীন হওয়াকে কৈবল্য পদ লাভ বলে অথবা দ্রষ্টার স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে কৈবল্য পদ লাভ

বলে—সেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই। এই অবস্থাতে অভ্যাস সম্পূর্ণ হয়।

● **বৈরাগ্য**

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা অনন্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় **'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।' (১।১২)** বৈরাগ্য কাকে বলে? সমাধিপাদের পঞ্চদশ সূত্রে মহর্ষি বলেছেন **'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।' (১।১৫)** দৃশ্যমান জগতের থেকে বেশী ভোগের ব্যবস্থা স্বর্গ-বৈকুণ্ঠের মহিমাতে আমরা শ্রবণ করে থাকি—এগুলির প্রতি তৃষ্ণারহিত চিত্তের প্রবাহ, চিত্তের সংযত অবস্থাকেই বৈরাগ্য বলে।

অভ্যাস নিরন্তর করতে-করতে যখন পরমতত্ত্ব পরমাত্মা বিদিত হন, তখন প্রকৃতির গুণগুলির প্রতিও তৃষ্ণার সর্বথা অভাব হয়। **'তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্।।' (১।১৬)** পুরুষ অর্থাৎ পরম পুরুষ চেতন, নির্মল পরমাত্ম স্বরূপের জ্ঞানলাভ হলে প্রকৃতির গুণগুলির প্রতি তৃষ্ণার সর্বথা অভাব হয় যে, যেন, তৃষ্ণা ছিলই না—তৃষ্ণা নিয়ে কি অনুসন্ধান করা হবে? যখন কিছু নেই এই অবস্থাতে তৃষ্ণার অভাব হয়—একে পর-বৈরাগ্য বলে, এটাই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।

বিভূতিপাদে পুনরায় এর উপর আলোকপাত করেছেন—**'সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি মাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্ত্বং চ।' (৩।৪৯)** বুদ্ধি এবং পুরুষ অর্থাৎ সাধক এবং সাধ্য—উভয়ের ভিন্নতামাত্রেরই যার মধ্যে বোধ রয়েছে এইরূপ সবীজ সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর সকলভাবের উপর প্রভুত্ব চলে আসে, তিনি সর্বজ্ঞ হওয়ার ক্ষমতা লাভ করেন এবং যখন প্রভুত্ব এবং সর্বজ্ঞ এই স্থিতির প্রতিও উদাসীনভাব চলে আসে, তখন দোষ বীজের সর্বথা নাশ হয় এবং কৈবল্যের প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ এই বৈরাগ্য কৈবল্য পদ শাশ্বত ধাম পর্যন্ত অনুসরণ করে, প্রায় সঙ্গেই চলে। অতএব এর অনুপালন অনিবার্য।

● **ঈশ্বর**

যোগদর্শনে পরমচেতন পরমাত্মাকে আত্মা, দ্রষ্টা, পুরুষ এবং চিতিশক্তি বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাধনপাদের ৪১তম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। সমাধিপাদের তৃতীয় সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে দ্রষ্টা স্বীয় স্বরূপে স্থিত হন। কৈবল্য পাদের সপ্তদশ সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিত্তের প্রভু পুরুষ অপরিণামী, সেইজন্য চিত্তের বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে সদৈব তিনি অবগত। এই পাদের অন্তিম সূত্রে উল্লেখ আছে যে, দ্রষ্টা চিতিশক্তির স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই কৈবল্য লাভ। এই

প্রকার পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে দ্রষ্টা, চিতিশক্তি, পুরুষ, প্রভু এবং আত্মা বলে সম্বোধিত করা হয়েছে যিনি জ্যোতির্ময় তত্ত্ব। কিন্তু এই শাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নামের একটা শব্দের উল্লেখ আছে। তিনি এর থেকে পৃথক্ একটি উপলব্ধি। এটাও সেই স্বরূপ। পরম চেতন পরমাত্মা সহজ; কিন্তু এই ঈশ্বর এক উপলব্ধির নাম।

প্রশ্ন উঠছে যে, বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের জন্য আমরা কার সাহায্য নেব? কার আশ্রয় গ্রহণ করব? মহর্ষি সমাধিপাদে একটা সঙ্কেত দিয়েছেন—**'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।' (১।২৩)** ঈশ্বরের-শরণাগত হলে এই নির্বীজ সমাধি সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর কাকে বলে? **'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।' (১।২৪)** অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটি হল ক্লেশ। এগুলি দ্বারা উৎপন্ন কর্ম, কর্মগুলির সংগ্রহ এবং এর পরিণাম ও এ সমস্তের বাসনা—এই চারটির সঙ্গে যাঁর কোন সম্বন্ধ নেই, সকল পুরুষগণের মধ্যে যিনি উত্তম, সেই বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর। পূর্বে কখনও তাঁর এই চারটির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, বর্তমানে চারটির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এই বিশেষ পুরুষই ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি প্রভু।

গীতাশাস্ত্রে ক্ষাত্র-ধর্মের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—**শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।। (১৮।৪৩)** শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, **'দাক্ষ্যং যুদ্ধে'** অর্থাৎ সাধনাতে দক্ষতা, দান অর্থাৎ সর্বস্বের সমর্পণ এবং ঈশ্বরভাব অর্থাৎ সমস্তভাবের উপর প্রভুভাব—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। এখানে ঈশ্বরের অর্থ হল 'প্রভু'।

'তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।' (১।২৫)—সেই ঈশ্বরের অত্যন্ত সর্বজ্ঞতার ভাব থাকে। সর্বজ্ঞতা তাঁর মধ্যে সহজভাবে থাকে। কোন কিছু তাঁর চক্ষুর আড়ালে ঘটে না, 'আমি সর্বজ্ঞ'—এইরূপ জ্ঞানও তাঁর নেই। এই অবস্থা তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকে। অনাদিকাল ধরে সদ্‌গুরুর এটাই স্বরূপ।

'পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' (১।২৬)—আদিকাল থেকে ঈশ্বরই পূর্বপুরুষদেরও গুরু; কারণ কাল ও তাঁর মধ্যে বিচ্ছেদ কখনও ঘটেনি। সেই পুরুষ কালের প্রতি উদাসীন। এটাই সদ্‌গুরুর স্থিতি। এই স্থিতি হল অকাল পুরুষের।

'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।' (১।২৭)—ঈশ্বরের বাচক নাম প্রণব অথবা ওম্। প্রাপ্তির পর প্রত্যেক মহাপুরুষের নাম ওম, যাতে তিনি স্থিত। এই ওম্‌ই জপ করতে হবে। **'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' (১।২৮)** ওঁ জপ এবং অর্থস্বরূপ পরমেশ্বর সদ্‌গুরুর চিন্তন, তাঁর ধ্যান অনিবার্য। এইরূপ করলে **'অন্তরায়াভাবঃ'**—বিঘ্নগুলি দূরীভূত হয়, অন্তরাত্মাতে স্থিতি লাভ হয়, সেই পরমাত্মার জ্ঞান হয়।

ভক্তরা জিজ্ঞাসা করে যোগ কোথা থেকে আরম্ভ হয়? —এই প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন, **'তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।' (২।১)**—তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-শরণাগতি—এই তিনটি দ্বারা যোগক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ সদ্‌গুরুর প্রতি সমর্পণ না থাকলে ভজনা জাগ্রত হয় না।

● অন্তরায় (বিঘ্ন)

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিপাদের অষ্টাবিংশতিতম সূত্রে নির্দেশ দিয়েছেন **'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'**—সেই ঈশ্বরের বাচক প্রণব অর্থাৎ ওম্ জপ করুন এবং তারই অর্থস্বরূপ সেই ঈশ্বরের ধ্যান করুন, সদ্‌গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা স্থির করুন। ধ্যান করার চেষ্টা সকলেই করেন; কিন্তু মন বসে না। মনের অন্তরালে যে বিঘ্নগুলি রয়েছে—সেগুলি উদ্বিগ্ন করতে থাকে। ওম্ জপ এবং সদ্‌গুরুর ধ্যান দ্বারা **'অন্তরায়াভাবঃ'**—অন্তরে যে বিকারগুলি উৎপন্ন হয় সেগুলির (যা দৃষ্টিগোচর হয় না, অন্তরে উৎপন্ন এবং নাশ হয়) অভাব এবং অন্তরাত্মার স্বরূপের জ্ঞান হয়।

যে অন্তরায়গুলির (বিঘ্নগুলির) অভাব হয় সে সমস্ত কি অন্তরায়? এই প্রসঙ্গে মহর্ষি সমাধিপাদের ত্রিংশত্তম সূত্রে বলছেন যে, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ত্ব এবং অনবস্থিতত্ত্ব—এই নয়টি হল চিত্তের বিক্ষেপ। এগুলিকেই অন্তরায় (বিঘ্ন) বলা হয়।

ব্যাধি—শরীর, ইন্দ্রিয়গুলিতে কোন রোগ হওয়া, যার ফলে চিত্ত চিন্তন থেকে সরে যায় এবং রোগের চিন্তাতে নিযুক্ত হয়।

স্ত্যান—অকর্মণ্যতা অর্থাৎ সাধনাতে প্রবৃত্ত না হওয়ার স্বভাবকে স্ত্যান বলা হয়।

সংশয়—নিজের শক্তি কিম্বা যোগের ফল-এ সন্দেহ হওয়াকে সংশয় বলে।

প্রমাদ—যোগ-সাধনার অনুষ্ঠানগুলিকে অবহেলা, ব্যর্থ চেষ্টাতে সময় নষ্ট করা হল প্রমাদ।

আলস্য—'ভজনা পরে কখনও করা যাবে' এইপ্রকারে এড়িয়ে যাওয়া হল আলস্য। কখনও-কখনও বেশী ভোজন করে নিলেও দেহে আলস্য দেখা দেয়।

অবিরতি—তীব্র বৈরাগ্যের অভাবই হল অবিরতি। কখনও-কখনও বিষয়গুলির সংসর্গে ইন্দ্রিয়সমূহ বৈরাগ্যের স্থানে সেই বিষয়গুলিরই চিন্তা করতে শুরু করে।

ভ্রান্তিদর্শন—'এই সাধনা সঠিক কি ভুল'—যোগ-সাধনাতে কিছু না কিছু স্বীকার করে নেওয়া হল ভ্রান্তিদৃষ্টি।

অলব্ধভূমিকত্ত্ব—সাধনার উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থা, ভূমিকাগুলির স্পষ্ট জ্ঞান না হওয়া হল অলব্ধভূমিকত্ত্ব।

অনবস্থিতত্ত্ব—যোগে উত্তমরূপে স্থির চিত্তেও অকস্মাৎ উচ্চাটন হওয়া, কোন কারণ ছাড়াই পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই উদ্বেগের স্ফূরণ হওয়াকে অনবস্থিতত্ত্ব বলে।

এগুলি অন্তরায় (বিঘ্ন) কোন সঙ্গদোষও নেই, কোন বিষয়ের বেগও নেই। তবুও এই বিঘ্নগুলি অন্তরকে উদ্বেলিত করতে থাকে। এগুলিকে সহযোগ করার জন্য এদের সঙ্গে পাঁচটি বিঘ্ন আরও আছে। সেই পাঁচটির মধ্যে সর্বপ্রথম হল—

দুঃখ—দৈহিক, দৈবিক এবং ভৌতিক তিনটি তাপই হল তিনটি দুঃখ। দেহ অর্থাৎ শরীরে কষ্ট; দৈবিক অর্থাৎ ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির ফলে উৎপন্ন দুঃখ এবং ভৌতিক অর্থাৎ ভূতপ্রাণীদের সঙ্গে সংসর্গের ফলে উৎপন্ন দুঃখ।

দৌর্মনস্য—অভীষ্ট পদের পূর্তি না হলে মন দ্বিধাগ্রস্ত হলে, মনে ক্ষোভ উৎপন্ন হলে, একেই দৌর্মনস্য বলে।

অঙ্গমেজয়ত্ত্ব—চিন্তনে উত্তমরূপে নিযুক্ত হলেও অঙ্গগুলিতে কম্পন হওয়াকে অঙ্গমেজয়ত্ত্ব বলে। কখনও-কখনও সমস্ত দেহ ছটফট করে ওঠে। যোগের অষ্টাঙ্গের পালন সঠিকভাবে না হওয়াকেও অঙ্গমেজয়ত্ত্ব বলে।

অনিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ নাসিকাভ্যন্তরে গৃহীত বায়ু এবং নিঃশ্বাস অর্থাৎ নাসিকা বা ফুসফুস থেকে বাইরে নির্গত বায়ু। সাধক গ্রহণ করেন সজাতীয় প্রবৃত্তি, ত্যাগ করেন বিজাতীয় প্রবৃত্তি। সাধক না চাইলেও কখনও-কখনও বহির্জগতের অবিদ্যাজনিত স্বর তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হয়, তিনি না চাইলেও তাঁর ভিতরের অবিদ্যাজনিত স্বর বাইরে প্রস্ফুটিত হয়, তিনি উপদেশ দিতে শুরু করেন।

উপর্যুক্ত বিজাতীয় তর্ক-বিতর্ক যখন যম এবং নিয়মগুলির অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উপস্থিত করে তখন **'বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।' (২।৩৩)** —এগুলির প্রতিপক্ষী বিচারগুলির বারংবার চিন্তন করা উচিৎ। অহিংসার পরিবর্তে হিংসা সত্যের পরিবর্তে অসত্য ইত্যাদি বিচারকে বিতর্ক বলে। এই বিপরীত অথবা বিজাতীয় তর্ক কখনও সাধক স্বয়ংই করেন, কখনও অন্য কেউ করে। কখনও-কখনও শুধু অনুমোদন করলে সেটাই বিতর্কের রূপ গ্রহণ করে। এর কারণ হল লোভ, মোহ অথবা ক্রোধ। এই বিকারগুলির মধ্যে কোনটা অল্প, কোনটা মধ্যম আবার কোনটা অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। সমস্ত বিকার দুঃখ এবং অজ্ঞানরূপ অনন্ত ফল প্রদান করে। এই প্রকার বিচার দ্বারা এই বিকারগুলি থেকে আত্মরক্ষা হল প্রতিপক্ষ ভাব; যেরূপ—এই বিকারগুলি দুঃখ এবং অনন্ত যোনির কারণ, এই হল বিকারগুলির নিকৃষ্ট ফল। এইভাবেও অন্তরায় (বিঘ্ন) দূর হয়, ধীরে ধীরে সরে যায়, প্রভাব কমে যায়; কিন্তু সে সমস্ত নির্মূল তো চিন্তন দ্বারাই হবে, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগের ফলেই হবে। ইষ্ট কি চান, তাঁর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করলে, ঈশ্বরের আদেশ পালন করলেই সেই অন্তরায়গুলি লুপ্ত হয়।

● চিত্ত-শুদ্ধির উপায়

ওঁ জপ এবং ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকলে অন্তরায় (বিঘ্ন) উত্তমরূপে শান্ত হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে সাধকের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিৎ? এই অন্তরায়গুলি শীঘ্র দূর করার জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি কয়েকটা উপায় সম্বন্ধে বলেছেন। সর্বপ্রথম তাঁর নির্দেশ হচ্ছে যে, এই অন্তরায়গুলিকে দূর করার জন্য নাম, রূপ ইত্যাদির মধ্যে কোন একটা তত্ত্বের সতত অভ্যাস করা উচিৎ (১।৩২) এর অতিরিক্ত সুখ, দুঃখ, পুণ্য এবং পাপ—এই ভাবগুলির প্রতি ক্রমশঃ মিত্রতা, দয়া, আনন্দ এবং উপেক্ষার ভাব রাখা উচিৎ। সুখী লোকেদের সঙ্গে (একমাত্র পরমাত্মার দর্শনে বাস্তবিক সুখ লাভ হয়, এইরূপ ভক্তদের সঙ্গে) মিত্রতা; এই প্রকার সংসারে আসক্ত, দীন-দুঃখীদের প্রতি দয়াভাব; পুণ্যাত্মাদের দেখে হর্ষ এবং পাপাত্মাদের প্রতি তটস্থভাব প্রদর্শিত করুন। সাধককে সমাজে থেকেই ভজনা করতে হয়, সেইজন্য কিরূপ তার ব্যবহার হওয়া উচিৎ-এরই উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় নির্দেশ মহর্ষি দিয়েছেন যে, প্রাণবায়ু বার-বার ত্যাগ এবং তৎক্ষণাৎ শ্বাস গ্রহণ না করে যথাসাধ্য শ্বাস রোধ করে রাখার অভ্যাস করলেও চিত্ত ভারহীন (হালকা) হয়ে যায়। তাঁর বলার আশয় হল যে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস গ্রহণ না করা; পুনরায় শ্বাসগ্রহণ করে শ্বাস ত্যাগ এবং যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস গ্রহণ না করা তিন-চারবার এইভাবে অভ্যাস করলে দেহের রুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে বিজাতীয় সঙ্কল্পও বাইরে বেরিয়ে যায়। দেহ হাল্কা বোধ হয়। এর সঙ্গে চিন্তনে প্রবৃত্ত হোন—নাম, রূপ যেখানে হোক মনকে তক্ষুণি নিযুক্ত করুন, মন প্রবৃত্ত হবে এবং এই বিকারগুলি বাধা দিতে পারবে না।

যোগ-সাধনা হল সাধকের বিষয়, যেমন—চিত্তবৃত্তি নিরোধ, দ্রষ্টার উপলব্ধি, স্বরূপে স্থিতি, কৈবল্য পদ—যা সাধকের অভিলাষা এর জন্য সহায়ক প্রবৃত্তিগুলির চিন্তন ও চিত্তকে স্বচ্ছ, মন স্থির করার জন্য সহায়ক।

'সমিটি সমিটি জল ভরহিঁ তলাওয়া। জিমি সদগুন সজ্জন পহিঁ আওয়া।।' (রামচরিতমানস ৪।১৩।৪) সম্পূর্ণ সৃষ্টি গুণ—দোষময়। কোটি দুর্গুণের মধ্যে এক দুটো গুণ অবশ্য থাকবে। সাধক শুধু সেই গুণটিকেই দেখেন। সাধনোপযোগী গুণ গ্রহণ করলে চিত্ত স্বচ্ছ হতে থাকে।

সাধনা উন্নত হলে শোকরহিত জ্যোতির্ময় পরমাত্মার কাছ থেকে নির্দেশ লাভ হলে চিত্ত উৎসাহ, আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁর উপর নির্ভর করে চলে থাকলে চিত্ত ভারহীন এবং স্থির হতে শুরু করে।

এছাড়া যদি কোন রাগ থেকে মুক্ত বীতরাগ মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ হয় তবে তাঁর সংসর্গ, দর্শন, বাণীশ্রবণ, স্পর্শ, সেবা দ্বারা অন্তরায়গুলি (বিঘ্নগুলি) দূর হয় এবং নাম-রূপ চিন্তনে উত্তমরূপে সাহায্য পাওয়া যায়।

সকলেই স্বপ্ন দেখে কিন্তু যোগী কখনও স্বপ্ন দেখেন না। তিনি স্বপ্নে যা দেখেন তা ভবিষ্যত, অবশ্যম্ভাবী। ভগবান দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগে জানিয়ে দেন। জাগ্রত অবস্থা থাকলেও তিনি দৃশ্য প্রস্তুত করেন। সাধক ঘুমিয়েপড়েন; কিন্তু তাঁর মন জেগে থাকে। তাঁর স্বপ্ন জগতকে ভগবান ধারণ করে নেন। সেখানেও তিনি প্রসারণ করতে থাকেন। অতএব সাধককে বুঝতে হবে যে, স্বপ্ন কি ইঙ্গিত করছে? এর আশয় কি? নিদ্রাকালে স্বপ্নরূপে যে দৃশ্যগুলি আসে সেগুলির আশয় বুঝে চললে অন্তরায় (বিঘ্ন) দূর এবং চিত্ত নাম-রূপে নিযুক্ত একসঙ্গে হয়।

মনকে স্থির করার পরিপ্রেক্ষিতে মহর্ষি একটি মহত্ত্বপূর্ণ সূত্র সম্বন্ধে বলছেন—'**যথাভিমতধ্যানাদ্বা।**'(১।৩৯)—যেরূপ আপনার অভিমত সেই ধ্যান দ্বারা মন স্থির হয়। সাধকের অভিমত হল অভ্যাস এবং বৈরাগ্য পালন, যোগ-এর অনুষ্ঠান, চিত্তবৃত্তিগুলি রোধ, দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি। এগুলির অনুরূপ কোন বিচার, কোন ভাব, দৃষ্টান্ত যদি পাওয়া যায় তবে সাধককে সে সব থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ—ভগবান দত্তাত্রেয় কুকুর, পাখি, অজগরের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি এদের সকলের কাছ থেকে যোগ-সাধনাতে সহায়ক, সদ্‌গুরুর বিদ্যারই অনুরূপ অর্থগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদিন মহাযোগেশ্বর, অবতাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইপ্রকার সাধক প্রকৃতির ঘটনা থেকে যোগের অনুকূল প্রেরণা গ্রহণ করে একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, সেই ঈশ্বরের নাম প্রণব (ওঁ) জপ অভ্যাস-বৈরাগ্যে দৃঢ় থেকে নিরন্তর এই পথে এগিয়ে যায়। এইরূপ যোগীর পরমাণু থেকে শুরু করে পরমমহত্ত্ব পর্যন্ত অধীনে হয়। সেই যোগী বড় থেকে বড় অথবা ছোট থেকে ছোট বস্তুতে যখন চাইবেন নিজের চিত্তকে সেখানে স্থির করতে সমর্থ হবেন। এটা সাধনার সহায়ক অঙ্গ, কোন পৃথক সাধনা নয়।

সৃষ্টিতে অনন্ত দৃশ্য সাধকের সমক্ষে আসতেই থাকে; কিন্তু সাধককে এর আশয় যোগের সহায়করূপে পরিবর্তন করেই ধারণ করা উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ-শস্ত্রের অনুসন্ধান হেতু অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে অবস্থান করছিলেন। ইন্দ্রের সভাতে অর্জুন উর্বশীকে দেখেছিলেন, দেখে তিনি অপলক নয়নে তাকেই দেখছিলেন। সভা শেষ হওয়ার পর দেবগণ ইন্দ্রদেবকে বলেছিলেন, ''দেবেন্দ্র! আপনি তো বলছিলেন যে আমার পুত্র ত্যাগী, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু যখন থেকে সেই অপ্সরা এখানে এসেছে শুধু তাকেই দেখে যাচ্ছিল। এর এই জ্ঞানও নেই যে, এটা কত পবিত্র সভা, এখানে কোন্ কোন্ গুরুজন বসে রয়েছেন?'' ইন্দ্র তাঁদের নালিশ শুনে বলেছিলেন, ''আমিও তো সেটাই দেখলাম, এখন ওকেই জিজ্ঞাসা করুন যে, সে কি দেখছিল? নৃত্য কেমন দেখল?''দেবগণের প্রশ্ন শুনে অর্জুন প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। দেবগণকে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম করে বলেছিলেন, ''ক্ষমা করবেন! আমার ধ্যান নৃত্যের দিকে ছিল

না।” দেবগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তুমি কি দেখছিলে?” অর্জুন বলেছিলেন, “মাতৃ দেবীর সঙ্গে বিযুক্ত বহু আগেই হয়েছি, যখন এই দেবীর উপর দৃষ্টি পড়ল তখন এমন মনে হল যেন, মাতৃদেবীকেই দেখছি। তখন থেকেই আমি মাতৃস্নেহতেই আচ্ছন্ন ছিলাম।” ছিল তো সে অপ্সরা, কিন্তু অর্জুন তাকে মাতৃবৎ দেখেছিলেন। সে শাপও দিয়েছিল, কিন্তু সেটাও অর্জুনের জন্য সহায়কের কাজ করেছিল। সাধক লক্ষ্যে অবিচল থাকলে, শাপও আশীর্বাদের কাজ করে। বিপত্তিও সম্পত্তি হয়ে যায়। এইপ্রকার যোগের সহায়করূপে বিষয়কে পরিবর্তিত করে নিলে সাধকের চিত্ত শান্ত, সম এবং স্থির হয়ে যায়।

● ক্লেশ

তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সমাধির ভাব স্থির হয় এবং ‘**ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ**’ **(২/২)** ক্লেশগুলি ক্ষীণ করার জন্যও ক্রিয়া যোগ-এর প্রয়োজন হয়। ক্লেশগুলি কি কি? **অবিদ্যা স্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।। (২/৩)** অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটি হল ক্লেশ। এই সকল ক্লেশের মূল হল অবিদ্যা। অবিদ্যার জন্যই এই ক্লেশগুলি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

অবিদ্যা— অনিত্যতে নিত্য, অপবিত্রে পবিত্র, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাতে আত্মভাবের প্রতীতি হল অবিদ্যা।

অস্মিতা— দৃক্-শক্তি এবং দর্শন–শক্তি এই দুটি একরূপ হওয়া হল অস্মিতা অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষ আত্মার মিশ্রণ হল অস্মিতা।

রাগ—অনুকূল সুখকর বস্তুর দিকে ধাবমান মনের প্রবাহকে রাগ বলে।

দ্বেষ— যে বিষয় দুঃখ দেয়, তা ত্যাগ করার চেষ্টা হল দ্বেষ, যা দুঃখকে অনুগমন করে।

অভিনিবেশ— ‘স্বরসবাহী’—যা পরম্পরাগত এবং মূঢ়গণের ন্যায় বিবেকসম্পন্ন পুরুষগণের মধ্যেও সর্বদা দেখা যায়, সেই অভিনিবেশ অর্থাৎ পূর্ব সাংসারিক জীবন, যার প্রতি টান থেকেই যায়। প্রকৃতিস্থ জীবন আমাদের নিবাস নয়, কিন্তু আমরা সেটাকে নিজের নিবাসস্থান বলে মনে করি। আমাদের বাস্তবিক ঘর তো সন্ত কবীরের বাণীতে ‘**তবন ঘর চেতো হো ভাই। তোহরা আবাগমন মিটি জাই।**’ এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ‘**স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।**’ **(গীতা, ১৮/৬২)** শাশ্বত স্বরূপই আমার—আপনার ধাম। কিন্তু এই সংসারে যেখানে আমরা পূর্বে নিবাস করতাম, তার প্রতি টান হল অভিনিবেশ যা ক্লেশের একটা প্রকার। আগামীকাল প্রাপ্তি হবে এই প্রকার স্থিতি থাকলেও আজকের গোটা দিন আকর্ষণ করতেই থাকবে। পরের মুহূর্তে প্রাপ্তি থাকলেও তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ধাবিত হয় সেইজন্য মূঢ়গণের ন্যায় বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও এই ক্লেশ দেখা যায়।

তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা এই ক্লেশ ক্ষীণ হয়, নাশ হয় না। সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত এই ক্লেশ নাশ করার যোগ্য। এই পূর্ব বৃত্তিগুলির অভাব ধ্যান দ্বারা হয়।

যার মূল ক্লেশ, সেই ক্লেশ থেকে উৎপন্ন সংগ্রহীত কর্ম-সংস্কারের সমুদায় পুনর্জন্ম, আয়ু এবং ভোগ উপভোগ করার জন্য প্রদান করেই। তা জন্ম-মৃত্যু এবং ভোগ, কখনও হর্ষ আবার কখনও শোক দেয়; কারণ পুণ্যকর্ম অথবা পাপকর্ম তার কারণ। পুণ্যকর্ম যা আহ্লাদ প্রদান করে, সেটাও দুঃখ রূপই; কারণ যখন এর সংস্কার শান্ত হয়, পাপকর্মের সংস্কারগুলির ক্রম আরম্ভ হয়। পরিণামে পুনরায় দুঃখ পাওয়াটা স্বাভাবিক। অতএব বিবেকসম্পন্ন পুরুষদের জন্য সকল কর্ম দুঃখস্বরূপ।

'হেয়ং দুঃখমনাগতম্' (২/১৬) ভবিষ্যতে যে দুঃখ ভোগ করতে হবে, সেই দুঃখ নাশ করার যোগ্য। এই ক্লেশগুলি নাশ করার উপায় হল দ্রষ্টা- দৃশ্য-এর সংযোগ। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানের ক্রিয়া নিরন্তর থাকলে ক্লেশের প্রভাব ক্ষীণ হয়; কিন্তু মহর্ষি একটা নতুন সূত্র দিলেন যে, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই এই ক্লেশ গুলি দূর করার একমাত্র উপায়। এই দৃশ্যগুলি কিরূপ ? প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি যাঁর স্বভাব অর্থাৎ ঈশ্বরীয় প্রকাশ, যে ক্রিয়া প্রকাশের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে সেই ক্রিয়া এবং প্রকাশে স্থিতি প্রদান করা যার স্বভাব; ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যার প্রকট স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বিভিন্ন স্বরূপে উদাহরণের ন্যায় প্রকট হয়, কখনও লিঙ্গ মাত্র এবং কখনও অলিঙ্গ অরূপ আকাশবাণী ইত্যাদির মাধ্যমে চলেন; পুরুষের জন্য ভোগ এবং মুক্তির সম্পাদন করা যার প্রয়োজন **('ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং') (গীতা, ৫/২৯)**—শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এ সমস্তই পুরুষের ভোগ) এ সমস্তের ব্যবস্থা করে অপবর্গ পরমশ্রেয়-এর প্রাপ্তি করানো দৃশ্যের প্রয়োজন।

দ্রষ্টা চেতনমাত্র জ্ঞানস্বরূপ। দ্রষ্টা স্বভাবে সর্বথা শুদ্ধ এবং নির্বিকার; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপই দর্শন করে অর্থাৎ বুদ্ধিতে যেরূপ প্রভাব থাকে, সেই অনুসারেই দৃশ্য প্রসারিত করে।

দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগের অভিপ্রায় হল অনুভব। যে ঈশ্বরকে আমরা লাভ করতে ইচ্ছুক, যে স্তরে আমরা দাঁড়িয়ে, আমাদের সাধনা, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান, একাগ্রতা অনুরাগ পূরিত হৃদয়ে এইরূপ হওয়া উচিত যাতে তা জেগে ওঠে। নির্বিকার দ্রষ্টা দৃশ্য প্রসারিত করতে শুরু করেন, পরমাত্মা দৃশ্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন। তিনি যাতে অর্জুনের মত দৃষ্টি প্রদান করেন, সঞ্চারিত করেন, নিজের বিভূতিগুলি সম্বন্ধে জানিয়ে দেন—এটাই হল দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগ। ভজনা জাগ্রত হওয়া, পরমাত্মার জাগ্রত হওয়া, রথী হওয়াই হল দ্রষ্টা দৃশ্যের সংযোগ। **'জাকে রথ পর কেশো, তাকো কৌন অন্দেশো।'** ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে, তাঁর সংরক্ষণে চললে ক্লেশগুলি দূর হয়, যা কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ (সদ্গুরু) দ্বারা সম্ভব।

যে আত্মতৃপ্ত আপ্তকাম মহাপুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের কাজ সম্পূর্ণ হয়, তাঁর জন্য সেই দৃশ্যের কোন প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু অন্য সাধারণ পুরুষের জন্য সেই মহাপুরুষের অন্তর্জগৎ থেকেই দৃশ্য প্রসারিত হয়। কৈবল্যপাদে এরই উপর পুনরায় জোর দেওয়া হয়েছে যে, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগে রঞ্জিত চিত্ত '**সর্বার্থ**'-সম্পূর্ণরূপে অর্থগ্রহণ করতে সাহায্য করে। সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনা দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও পরমার্থিক অর্থই গ্রহণ করে এবং '**বিশেষদর্শিনঃ**' বিশেষ পুরুষ ঈশ্বরের দর্শন করে। চিত্ত আত্মভাব, অহংভাব, সেইভাবের উর্ধ্বে উঠে কৈবল্যের অভিমুখে যায়।

বিবেকপ্রবণ এবং কৈবল্য অভিমুখী চিত্ত দ্বারা কোন শুভাশুভ কর্ম হয় না; কিন্তু এইরূপ অবস্থাতেও অন্তরালে স্ফূরণ হয়, অন্য সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, তা '**সংস্কারেভ্যঃ**'-সংস্কারের জন্য এইরূপ হয়। সংস্কারের পরতে অতিসূক্ষ্ম কিছু রয়েছে, তাই স্ফূরিত হয়। '**হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।**' কারণ এই সংস্কারগুলির মূল হল ক্লেশ, এর পরিণাম হল জাতি (পুনর্জন্ম) আয়ু এবং ভোগ।

এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলির কখন নাশ হয় ? যে যোগীর বিবেকজ্ঞানের মহিমাতেও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় সেইসময় তার বিবেকজ্ঞান সর্বথা প্রকাশমান হয়। তাঁর ধর্মমেঘ সমাধি লাভ হয়। চিদাকাশে সর্বত্র ধর্মই প্রকাশিত থাকে, অন্য কিছুই থাকে না। এর প্রভাবে সময়, ক্লেশ এবং কর্মগুলির সর্বথা নাশ হয়।

সারাংশতঃ মহর্ষি পতঞ্জলির অনুসারে অভ্যাস, বৈরাগ্য, যম, নিয়ম, আসন, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান ইত্যাদির বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান দ্বারা ক্লেশ ক্ষীণ অবশ্য হয়; কিন্তু নাশ হয় না। সাধকের শ্রদ্ধা এতটা গভীর হওয়া উচিত যাতে পরমাত্মা হৃদয়ে জেগে উঠে দৃশ্য প্রসারিত করতে শুরু করেন, যা পুরুষের জন্য মুক্তি সম্পাদন করে। তাঁর দ্বারা সঞ্চালিত হলে তবেই ক্লেশগুলি সর্বথা নাশ হয় অর্থাৎ ইষ্টের জাগৃতি অনিবার্য। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-শরণাগতি দ্বারা এরূপ ঘটা সম্ভব। মহর্ষি পতঞ্জলির অনুসারে 'ঈশ্বর' পূর্ণত্বপ্রাপ্ত যোগী, মহাযোগেশ্বরের স্বরূপ এবং দ্রষ্টা, চেতন, প্রভু, আত্মা, অবিনাশী, চিৎশক্তি ইত্যাদি একমাত্র পরমাত্মা, শাশ্বত ব্রহ্মের সম্বোধন।

● **যোগ—এর আটটি অঙ্গ**—

যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অনুষ্ঠান করতে-করতে যখন অশুদ্ধির নাশ হয়, সেই সময় জ্ঞানের প্রকাশ বিবেক খ্যাতি পর্যন্ত হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি- এই হল আটটি অঙ্গ। এই যোগাঙ্গের মধ্যে প্রথম হল যম। যমের পাঁচটি অঙ্গ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ।

অহিংসা—দেহ একটা বস্ত্র। জীবন-মৃত্যু সংস্কারের উপর আধারিত। সংস্কার জীর্ণ হলেই পুরোনো বস্ত্র পরিবর্তন হয়। একদিন এই দেহগুলির অতীত শুদ্ধ স্বরূপের প্রাপ্তির সঙ্গেই দেহ—ধারণের ক্রমে ছেদ পড়ে। অহিংসার তাৎপর্য হল স্বীয় আত্মার উদ্ধার। অহিংসার স্থিতি দৃঢ় হলে '**তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ**' সেই যোগীর নিকট সকল প্রাণী বৈরভাব ত্যাগ করে। বৈরী হল —কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মৎসর। মহাপুরুষের শরণাগত হলেই এই বিকারগুলি দূর হতে শুরু করে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''প্রভো! কার প্ররোচনাতে মানুষ পাপের আচরণ করে?'' ভগবান বলেছিলেন ''**কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।'' (গীতা, ৩/৩৭)**—অর্জুন! কাম এবং ক্রোধ অগ্নি সদৃশ ভোগে অতৃপ্ত, নিরন্তর শত্রুতা করে, দুর্জয় শত্রু। দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা এগুলি ছেদন কর। রাগ এবং দ্বেষ, এগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয়। এরা প্রতিপক্ষ, বিরোধী। অহিংসাতে দৃঢ় স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষের শরণে—সান্নিধ্যে পৌঁছালেই পুরুষ এগুলি ত্যাগ করতে সমর্থ হন।

সত্য—সংসার নশ্বর। পরমাত্মা কেবল সত্য, নিত্য, পরমতত্ত্ব, সনাতন, দ্রষ্টা, ধ্যেয়। সত্যে দৃঢ় স্থিতি লাভ হলে, সমর্পণের সূত্র গুরুর চরণে বেঁধে দিলে, সমর্পণ সিদ্ধ হলে '**ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্**'—যোগ ক্রিয়ার ফল পরমাত্মার আশ্রয়, তাঁর শরণ লাভ হয়। ভগবান যোগক্ষেমের ব্যবস্থা করেন।

অস্তেয়- চুরি অর্থাৎ আড়াল করার প্রবৃত্তির অভাব। গীতাতে উল্লিখিত আছে যে, '**তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।।' (৩/১২)** —এই দৈবী গুণসমূহকে সংবর্ধন না করে যিনি বলেন— 'আমি লাভ করেছি', তিনি নিশ্চয়ই চোর। যখন লাভ হয়নি, তখন তিনি কি উপভোগ করবেন? এই পথ থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়ায়, তারা চোর। সাধকের মধ্যে চৌর্যবৃত্তির অভাব হওয়া উচিত।

পূজ্য গুরু মহারাজ বলতেন যে, সদ্গুরুর সম্মুখে মনে যে চিন্তা আসছে তাই বলা উচিত। মনে অন্য কোন কামনা আছে কিন্তু মুখে অন্য কিছু বলছি এই ধরণের সাধক কখনও সফল হন না।

অস্তেয়তে প্রতিষ্ঠিত হলে '**সর্বরত্নোপস্থানম্**'—সকল রত্ন প্রকট হয়। এই রত্নগুলি হল—বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, জ্ঞান, তপস্যা, চরিত্র ইত্যাদি। এই দৈবী গুণসমূহ করতলগত হয়।

মহাবীর বলেছেন, ''রাজন্! ত্রিরত্ন ধারণ করুন।'' '**সম্যক্দর্শনজ্ঞান-চরিত্রাণি**।' তীর্থস্বরূপ মহাপুরুষের দর্শন, তাঁর প্রতি অটল শ্রদ্ধা, তাঁর কাছ থেকে সাধনা সম্বন্ধে জেনে তা আচরণে পরিণত করুন। এই হল ঈশ্বর পথের সর্বোপরি রত্ন।

সমুদ্র—মন্থনের ফলে কয়েকটা রত্ন পাওয়া গিয়েছিল— **'শ্রী মণি রম্ভা বারুণী, অমিয় সংখ গজরাজ। কল্পদ্রুম শশি ধেনু ধনু, ধন্বন্তরি বিষ বাজ।।'** কদাচিৎ এই রত্নগুলির মধ্যে থেকে বারুণী অথবা রম্ভাকে পেলেও সাধকের তাতে কি লাভ হবে? যোগপথের রত্ন সেগুলি, যেগুলি দ্বারা সাধন সহজসাধ্য হয়।

ভগবান কাকভুশুণ্ডিজীকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন— **'গ্যান বিবেক বিরতি বিজ্ঞানা। মুনি দুর্লভ গুন জে জগ নানা। আজু দেউঁ সব সংসয় নাহীঁ। মাগু জো তোহি ভাব মন মাহীঁ।।' (মানস, ৭/৮৩খ/১)** বাস্তবে এই সমস্ত গুণই রত্ন। অস্তেয় দ্বারা সমস্ত সাধন-বিভূতি লাভ হয়।

ব্রহ্মচর্য— **'ব্রহ্ম আচরতি স ব্রহ্মচারী'**—যিনি ব্রহ্মের ন্যায় আচরণ করেন, শাশ্বত, সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করার জন্য যিনি প্রযত্নশীল, তিনি ব্রহ্মচারী। **'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'**—সেই শাশ্বত পরব্রহ্মকে জানার জন্য যত উপায় আছে সেই উপায় অনুসারে আচরণ করার চেষ্টা ব্যক্তি যেদিন থেকে করতে শুরু করে, সেইদিন থেকে সে ব্রহ্মচারী। শুধু জননেন্দ্রিয় সংযমকে ব্রহ্মচর্য বলা যেতে পারে না। সাধকের মুখ্য লক্ষ্য সেই পরমাত্মা যাঁকে লাভ করতে হলে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী প্রবাহ রুদ্ধ করতে হবে। একমাত্র পরমাত্মার নিরন্তর স্মরণ দ্বারা শুধু জননেন্দ্রিয় সংযম নয়, সকলেন্দ্রিয় সংযম হয়ে যায়। চক্ষু অন্য কিছু দর্শন করে না, কর্ণ অন্য কিছু শ্রবণ করে না, ত্বক অন্য কিছুর স্পর্শ অনুভব করে না এবং মনেও কোন অন্য সঙ্কল্প জাগে না, শুধু ইষ্টোন্মুখ প্রবৃত্তি জাগ্রত থাকে— এই প্রকার ব্রহ্মচর্যের দৃঢ় স্থিতি লাভ হলে **'বীর্যলাভঃ'** সমস্ত প্রকার সামর্থ্য লাভ হয়।

উপস্থেন্দ্রিয় (জননেন্দ্রিয়) সংযম অনিবার্য। এটা ব্রহ্মচর্য ব্রতের অন্তর্গত পড়ে। কিছু ব্যক্তি হঠকারিতা করে জননেন্দ্রিয় সংযম তো করে নেন কিন্তু বাকী ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয় চিন্তা করতে থাকেন। সকল প্রকার বিষয়ের চিন্তা দূর হওয়া হল বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যিনি হঠপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া রুদ্ধ করে মন থেকে বিষয় চিন্তা করেন, তিনি দম্ভাচারী, ভণ্ড। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্ তত্ত্ব পরমাত্মার অনুরূপ প্রবাহিত করা ব্রহ্মচর্য। যখন ব্রহ্মচর্য ব্রত দৃঢ় হয় তখন সামর্থ্য, বীর্য, শৌর্য এবং পরাক্রম লাভ হয়। তিনি ধৈর্য্যবান্ হন। বিপত্তির সম্মুখীন হলেও মীরার মত, প্রহ্লাদের মত স্থির থাকেন, উদ্বিগ্ন হন না, পশ্চাৎপদ হন না। এমন বিপদ আসেই না, যা তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে। তিনি অজাতশত্রু হয়ে যান।

অপরিগ্রহ—সামাজিক সন্দর্ভে প্রয়োজনের অধিক বস্তুর সংগ্রহ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। অন্যের বস্তু গ্রহণকে বলে অনুগ্রহ স্বীকার, দান গ্রহণ করলে দাতার পাপের ফল ভোগ করতে হতে পারে। সেইজন্য পরিগ্রহ ত্যাগ করলে মন পবিত্র এবং স্বাধীন থাকে। পরন্তু যোগীর জন্য অপরিগ্রহের অর্থ বিশেষভাবে রয়েছে। ধ্যানের স্থিতি জাগ্রত হলে ধ্যানজনিত চিত্তের '**অনাশয়ম্**' (৪/৬) নাশ হয় না; কারণ যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়। কর্মের শুভ অথবা অশুভ কোন পরিণাম দেখা যায় না। সেই সময় যোগী অপরিগ্রহের স্থিতিযুক্ত হন। তার কর্মগুলি দ্বারা শুভ কিছু লাভ হয় না এবং অশুভের সৃষ্টিও হয় না। সেই সময় নতুন রচনা হয় না; কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কারের পরতে কি নিহিত, তা কতদিন থাকবে এবং আর কত সাধনা করলে তা শান্ত হবে? এই সমস্ত কথা জানা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলছেন —'**অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ।' (২/৩৯)**—অপরিগ্রহে দৃঢ় স্থিতি লাভ হলে 'পূর্বজন্ম কিরূপ ছিল?' এ সম্বন্ধে উত্তমরূপে জানা যায়। এইরূপ চিত্ত দ্বারা কোন কিছু নতুন সৃষ্টি হয় না, তা সত্ত্বেও কোন বিষয়ের উদ্রেক হয়; '**তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ।' (৪/২৭)** অন্য পদার্থের দৃশ্য প্রকট হয় তা সংস্কারের জন্য হয়ে থাকে, সেই সংস্কারগুলি সম্বন্ধে জানা যায়। অপরিগ্রহের স্থিতি আসলে সেই সমস্ত সংস্কার সম্বন্ধে জানা যায়; কারণ ততটাই স্ফুরিত হয়।

● নিয়ম

পাঁচটি যমের মত নিয়মও পাঁচটি— শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান। সর্বপ্রথম হল—

শৌচ—শৌচ সম্বন্ধে দুটি সূত্র দিয়েছেন মহর্ষি। সাধনপাদের চত্বারিংশত্তম সূত্রে তিনি বলেছেন যে, শৌচের পালন করলে স্বীয় অঙ্গের প্রতি বৈরাগ্য এবং অন্য সংসর্গ থেকে পৃথক অবস্থান করার ভাব জাগ্রত হয়। একচত্বারিংশত্তম সূত্রেও শৌচের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন যে, এর ফলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি, মনে প্রসন্নতা, চিত্তের একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত এবং আত্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা চলে আসে।

বস্তুতঃ তপস্যা স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানের অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণ পূর্ণতঃ পবিত্র এবং শান্ত প্রবাহিত হয়। একেই শৌচ বলে। শৌচ হল অন্তঃকরণের শুদ্ধি। মন, বুদ্ধি,চিত্ত এবং অহংকার-এই চতুষ্টয় অন্তঃকরণ ইষ্টের অনুকূল প্রবাহিত হলে, স্বীয়দেহের প্রতিও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ মহাপুরুষ যদি বহু দিন ধরে স্নান না করে থাকেন, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি কোথাও শুয়ে আছেন তো শুয়েই আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন তো দাঁড়িয়েই আছেন। তিনি জানেন যে, এই দেহ '**সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা।' (মানস, ৭/৪২/৪)** ধাম, বস্ত্র সেইজন্য জীবজগতে যত

দেহধারী রয়েছেন, তাদের থেকে পৃথক্ অবস্থান করার ক্ষমতা চলে আসে। এই অবস্থাতে মনে আনন্দ, চিত্তে একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত এবং আত্মদর্শনের ক্ষমতা লাভ হয়। দেহাধ্যাস চলে যায়। যেমনই সঙ্গ-দোষ জুটুক অসঙ্গ থাকার ক্ষমতা চলে আসে। স্থূল দেহকে ধৌত করা, সুসজ্জিত করা, অলঙ্কৃত করা—এটা তো ভয়ঙ্কর দেহাসক্তি এবং দেহ-তৃষ্ণার প্রতীক। পবিত্র অন্তঃকরণ যুক্ত মহাপুরুষগণের স্নান-ধ্যান কিছুই বোধগম্য হয় না। তাঁরা দিগম্বর বেশেও ঘুরে বেড়ান। হয়ত কোন গাছের ছায়াতে বসে রয়েছেন। ভগবান মহাবীরের উপর লোকে কাদা ছুঁড়েছিল, গুরুদেব ভগবানকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল; কিন্তু তিনি অবিচল ছিলেন।

সাংসারিক লোকেরা দেহের সঙ্গে সম্বন্ধিত বিষয়বস্তু নিয়ে কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য করলে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত মহাপুরুষগণ সাধনাতে বাধা উৎপন্ন হলে চিন্তিত হতেন। সন্ত কবীরের অনুভূতি দেখুন— '**এক অচম্ভা এসন দেখা, মুরদা রোটি খায়। সনকারে তে বোলত নাহীঁ, মারে তে চিল্লায়।।**" চিন্তন পরায়ণ সাধক মৃতপ্রায় হন। যা কিছু বলুন, কিছু যায় আসে না। এঁরা এসবে হুঁশিয়ার থাকেন না। কদাচিৎ—কোন পূর্বসংস্কার দ্বারা উদ্বিগ্ন হলে তখনই রাগ প্রদর্শন করেন। প্রার্থনা করেন ভগবানের কাছে।

সন্তোষ— সন্তোষে দৃঢ় স্থিতি এর বর্ণনা করে মহর্ষি বলছেন, '**সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।" (২/৪২)**—যার থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সুখ নেই এইরূপ সর্বোত্তম সুখলাভ হয় সন্তোষ মনে চলে আসলে। একমাত্র পরমাত্মার দর্শন এবং তাঁতে স্থিতি লাভ হলেই সর্বোত্তম সুখের প্রাপ্তি ঘটে। '**রাম বিমুখ সিধি সপনেহুঁ নাহীঁ। (মানস, ২/২৫৫/১)** আর অন্য কোথাও সুখ নেই তবে পাবে কোথা থেকে? সন্তোষের অর্থ হল— যিনি সম, যাঁর মধ্যে বিষমতা নেই এইরূপ একজনই আছেন, তিনি হলেন পরমাত্মা। তাঁর কাছ থেকে তোষ অথবা তৃপ্তি লাভ করা হল সন্তোষ। তিনি হলেন সর্বোত্তম সুখের স্রোত। সন্তোষ দ্বারা প্রভুর প্রভাব জানা যায়— '**উমা রাম সুভাউ জেহিঁ জানা। তাহি ভজন তজি ভাব ন আনা।।' (মানস, ৫/৩৩/২); 'কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোই। জব তব সুমিরন ভজন ন হোই।। (মানস, ৫/৩১/২)** সাধক চিন্তন দ্বারা সহজ সুখ লাভ করেন সেইজন্য তিনি বহির্জগতের সুখের অপেক্ষা রাখেন না।

তপস্যা— তপস্যা দ্বারা যখন অশুদ্ধি নাশ হয়, তখন '**কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধিঃ' (২/৪৩)** দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সিদ্ধি হয়। দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ইষ্টের অনুরূপ চলার ক্ষমতা লাভ করে। এগুলি সিদ্ধ হয়-দেহ সংযত হয় এবং সাধনার সহায়ক হয়ে যায়।

ইষ্টের অনুরূপ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে করার চেষ্টা তপস্যা। সাধক যখন এই পরীক্ষা দেন তখন দেহও সংযত হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়সমূহও সংযত হয়। আজ মন নিযুক্ত

করার চেষ্টা করলে নিযুক্ত হতে চায় না, সেই সময় সহজেই প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ সহযোগ করে অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে আসে।

স্বাধ্যায় -স্বয়ং- এর অধ্যয়ন স্বাধ্যায়। সাধক নিজের অধ্যয়ন করেন যে, চিত্তকে কতটা নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং কতটা নিযুক্ত হয়েছে? এইরূপ বিচার করে যেখানে- যেখানে ত্রুটি রয়েছে, সেখান থেকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে পুনরায় সাধনাতে প্রবৃত্ত করে এগিয়ে যাওয়া হল স্বাধ্যায়। এইরূপ স্বাধ্যায়ের পরাকাষ্ঠাতে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার হয়, **'ইষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ'**—ইষ্ট দেবতার সঙ্গে উত্তমরূপে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যোগ-সাধনাতে স্বাধ্যায় অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ঈশ্বর-প্রণিধান-ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বর শরণাগতি দ্বারা সমাধির সিদ্ধি হয়। যিনি সম এবং আদি তাঁর সমান-সমান হওয়া যায়। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়ের যিনি উর্ধ্বে স্থিত, এইরূপ বিশেষ পুরুষ হলেন ঈশ্বর। যাঁর কাল থেকে অবচ্ছেদ নেই, তিনি কালাতীত, গুরুরও গুরু পরমগুরু। এটাই হল আদি গুরুপদ এঁর প্রতি সমর্পণের সঙ্গে সাধনা করলে সমাধির সিদ্ধি শীঘ্র হয়। কারণ সাধনাতে সিদ্ধির ভার ঈশ্বরের উপর চলে আসে। তিনি যোগক্ষেম, দেখাশুনা করেন। ইনিই হলেন সদ্‌গুরু।

আসন-যম-নিয়মের পরের ক্রম আসন। স্থির, অচঞ্চল সুখপূর্বক বসার নাম আসন। **'প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।' (২/৪৬)**—প্রযত্নের শিথিলতা থেকে অর্থাৎ যম, নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়াদিতে যা চেষ্টা করা হয়, সেই প্রযত্নে শিথিলতা থেকে এবং অনন্ত পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত হলে এই আসন সিদ্ধ হয়। অনন্তে মন নিযুক্ত হওয়া থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, এই স্থিরতা শুধু দেহের নয় পরন্তু মনেরও। যম-নিয়মের অভ্যাস যখন স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে, কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তখন পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত হলে আসন সিদ্ধ হয়।

প্রাণায়াম — আসন সিদ্ধ হওয়ার পর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হয় একেই প্রাণায়াম বলে। সিদ্ধ হয় আসন, অবস্থা লাভ হয় প্রাণায়ামের। নিঃশ্বাস যা আপনি ত্যাগ করেন এবং প্রশ্বাস যা আপনি গ্রহণ করেন—এই দুটির গতি রুদ্ধ হওয়াই প্রাণায়াম। সাধক অক্লিষ্ট বৃত্তি দৈবী সম্পদ্ গ্রহণ করেন এবং ক্লিষ্ট বৃত্তি আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ করেন। শ্বাসগ্রহণ, ত্যাগ শান্ত হলে, স্থির হলেই প্রাণায়ামের অবস্থা চলে আসে। এটা সাধনার একটা স্তর। এটা অতিক্রম করতে হয়।

এই প্রাণায়াম বাহ্য বৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি —তিনপ্রকারে দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা উত্তমরূপে গণনা করে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হতে থাকে। বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধের কোন্ দেশে বৃত্তি গমন করেছে, কত কাল (সময়) অতিবাহিত করেছে? সংখ্যা দ্বারা গণনা করে চিত্তকে নিযুক্ত করুন। আভ্যন্তর বৃত্তির

তাৎপর্য বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, ধারণা, ধ্যানের মধ্যে কার বিশ্লেষণে বৃত্তি প্রবৃত্ত, বৃত্তি সে কাজে কতকাল নিযুক্ত থাকল? সংখ্যা দ্বারা দেখুন এবং সেখান থেকে প্রত্যাহার করে স্তম্ভবৃত্তিতে নিযুক্ত করুন। উত্তমরূপে নিরীক্ষণ দ্বারা এই প্রাণায়াম দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়ে যায়। এর থেকে উন্নত অবস্থাতে '**বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।' (২/৫১)**—যখন বাহ্য বিষয় যা প্রকৃতিজন্য, ক্লেশ দ্বারা প্রভাবিত অবিদ্যা জন্য ক্লিষ্ট; এবং আভ্যন্তর বৃত্তি, দৈবী সম্পদ-অক্লিষ্ট-দুটিই শান্ত হয়, সম হয়, এগুলি রুদ্ধ হয়, বিরাম দেখা দেয়, চিত্ত একটা আয়ামে প্রবাহিত হয় এই অবস্থাকে প্রাণায়াম বলে।

'**ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।' (২/৫৩)** —প্রাণায়াম সিদ্ধ হলেই মনে ধারণ করার যোগ্যতা চলে আসে। প্রারম্ভিক সাধক নাম অথবা রূপ মনে ধারণ করার চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নাম অথবা রূপ হারিয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়ে যায়, না জানি কি-কি আসতে থাকে; কিন্তু প্রাণায়াম সিদ্ধ হলেই চিত্তে ধারণ করার ক্ষমতা চলে আসে।

প্রত্যাহার— '**স্ববিষয় অসম্প্রযোগে**'-স্বীয় বিষয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়সমূহের '**চিত্তস্বরূপ অনুকারঃ ইব**'- চিত্তের স্বরূপে অনুকরণ- এইরূপ প্রবাহিত হওয়া প্রত্যাহার। চিত্ত যেখানে নিযুক্ত হবে ইন্দ্রিয়সমূহ সেই বর্ণেই রঞ্জিত হবে, স্বীয় বিষয় ইন্দ্রিয়সমূহ ত্যাগ করবে- একেই প্রত্যাহার বলে। সেই সময় ইন্দ্রিয় উত্তমরূপে সংযত হয় অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়।

ধারণা- বিষয় বিমুখ ইন্দ্রিয়সমূহ যখন চিত্তের অনুকরণ করতে শুরু করে তখন চিত্ত ধারণ করার ক্ষমতা লাভ করে। '**দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।' (৩/১)** - যে দেশে, নামে, রূপে, ব্রহ্মবিদ্যাতে, যোগের অঙ্গের মধ্যে কোন একটা অঙ্গে চিত্তকে নিরুদ্ধ করা ধারণা।

ধ্যান- '**তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।'** (৩/২) - যেখানে চিত্তকে নিযুক্ত করা হবে সেই ধ্যেয় এর অভিমুখে বৃত্তির নিরন্তর প্রবাহিত হওয়া, ক্রমভঙ্গ না হওয়াকে ধ্যান বলে। তৈলধারাবৎ বৃত্তি নিরন্তর প্রবাহিত হবে, অন্য সঙ্কল্প উঠবে না। ধ্যান হল পরিণাম। '**তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্।' (৪/৬)** ধ্যানজনিত চিত্ত আশয়রহিত হলে নষ্ট হয় না।

গুরুদেব ভগবান বলতেন, " হো! আমি পতিত হতে চাইলেও, ভগবান পতিত হতে দেবেন না।" অভ্যাসকালে প্রকৃতির আবরণ আসতেই থাকে। সে সব আমাদেরই পূর্বজন্মের সংস্কার। কিন্তু সাধনা উন্নত হতে- হতে যখন ধ্যানের অবস্থা চলে আসে, তখন এর ফলে নতুন সংস্কারের সৃজন হয় না। সেইজন্য ধ্যানের ফলে চিত্তে যে পরিবর্তন ঘটে, তা কখনও নাশ হয় না; কারণ '**কর্মাশুক্লাকৃষ্ণম্' (৪/৭)**- এইরূপ যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়।

সমাধি- পাতঞ্জল যোগ-দর্শন- এ সমাধির বর্ণনা প্রায় আট বার করা হয়েছে। **'বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।' (১/১৭)**- বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা দ্বারা সংযুক্ত সমাধি হল সম্প্রজ্ঞাত। **'তত্রশব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।' (১/৪২)**- শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান- এই তিনটি বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত চিত্তের সমাধান হল সবিতর্ক সমাধি। **'স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।' (১/৪৩)**- চিত্তের স্বরূপ যখন শূন্য হয়, শুধু অর্থমাত্রের (লক্ষ্য মাত্রের) আভাস থাকে, সেইকালে স্মৃতি পূর্ণতঃ শুদ্ধ হয়ে যায়। সেটাই নির্বিতর্ক সমাধি। **'এতযৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।'(১/৪৪)**, **'এতযা এব'**- এর দ্বারাই, সবিতর্ক এবং নির্বিতর্ক এই দুটি ব্যাখ্যা দ্বারাই সূক্ষ্মতর বিষয়যুক্ত সবিচার এবং নির্বিচার সমাধির ব্যাখ্যা করা হয়েছে; কিন্তু **'তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।' (১/৪৬)**- সে সবই সবীজ সমাধি। এই সমাধিতে পূর্ব কর্মগুলি, প্রকৃতির বীজ নাশ হয় না, বীজ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু এই নির্বিচার সমাধিই অত্যন্ত নির্মল হলে যোগী 'অধ্যাত্মপ্রসাদঃ'-আত্মার আধিপত্যে চলার মহাপ্রসাদ লাভ করেন এবং **'তস্যাপি নিরোধে'(১/৫১)**-এরও নিরোধ হলে **'সর্বনিরোধাৎ'**-পুরোনো- নতুন সব সংস্কার নিরুদ্ধ হলে নির্বীজ সমাধি হয়। এই অবস্থাতে প্রকৃতির শেষ বীজ, যা হল জন্ম-মৃত্যুর কারণ, তা শান্ত হয়ে যায়। এই প্রকার সমাধিপাদে সমাধিপূর্বের পীঠিকা, সমাধির শুরু, শনৈঃ-শনৈঃ উৎকর্ষ এবং নির্বীজ সমাধির চিত্রণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'বিভূতিপাদ'-এর দ্বিতীয় সূত্রে মহর্ষি বলছেন যে, চিত্তবৃত্তি নিরন্তর প্রবাহিত হলে, ধ্যান হয়। সেই ধ্যানই যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় **'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।'(৩/৩)**- যখন শুধু ধ্যেয় মাত্রের প্রতীতি থাকে এবং চিত্তের স্বীয় স্বরূপ শূন্য হয়ে যায়, তখন সেই ধ্যানই সমাধিতে পরিবর্তিত হয়। **'সম আদি স সমাধি'**-যিনি সম, যাঁর মধ্যে বিষমতা নেই, যিনি হলেন আদিতত্ত্ব, অনাদিতত্ত্ব তিনি পরমাত্মা, সেই সময় ধ্যান পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদানকারী হয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায় 'কৈবল্যপাদ' এর ২৯ তম সূত্রে মহর্ষি বলেছেন যে, যে যোগীর বিবেক-জ্ঞান- এর মহিমাতেও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তার বিবেক জ্ঞান সর্বথা প্রকাশিত থাকার জন্য সেই যোগী **'ধর্মমেঘসমাধি'**-এর স্থিতি লাভ করেন। সেই অবস্থাতে চিদাকাশ শুধু ধর্ম আর ধর্ম দ্বারাই আবৃত থাকে, জগতের অন্য বিকল্প দেখা দেয় না। পরমধর্ম পরমাত্মা, তার ব্যাপকতার বোধ হয়। সেই সময় সব ক্লেশ এবং কর্ম থেকে নিবৃত্তি লাভ হয়। জ্ঞেয় -এর স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। এতেও সফলতা লাভ হলে গুণের পরিণাম-ক্রম সমাপ্ত হয়। যোগী ক্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যান। এই অবস্থা লাভের পর কর্ম 'নির্গ্রাহ্য' হয়ে যায়, কর্ম দ্বারা কোনরূপ সৃজন হয় না। **'পুরুষার্থশূন্যানাম্'** -

পুরুষকার করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অভ্যাসের পূর্তিকালে গুণ কিছু উৎপন্ন করে না, স্বীয় কারণে বিলীন হয়ে যায়- এরই নাম কৈবল্য। এই প্রকার সমাধির পরিণাম হল কৈবল্য। দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হন।

সারাংশতঃ যোগ-পথে গুণের বিলয় পর্যন্ত, সমাধি পর্যন্ত অভ্যাস নিতান্ত আবশ্যক।

● **সংযম** -

অভ্যাস- ক্রম দৃঢ় হতে -হতে ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি- এই তিনটি এক হওয়া সংযম, উদাহরণস্বরূপ; সুরত - এ নাম অথবা রূপ ধারণ করা হয়, বৃত্তিকে সুরত (মনের দৃষ্টি) দ্বারা সংযত করা হয়। নাম অথবা রূপে বৃত্তির নিরন্তর প্রবাহিত হওয়া হল ধ্যান এবং ধ্যেয়, লক্ষ্যমাত্রের আভাস থাকা হল সমাধি। ক্রমশঃ দৃঢ় হতে-হতে তিনটি এক হওয়া হল সংযম।

সংযম দৃঢ় হলে বিভূতিগুলির প্রাদুর্ভাব হয়। **'তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।' (৩/৫)**- বুদ্ধি অলৌকিক জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা দ্বারা সংযুক্ত, প্রকাশিত হয়; কিন্তু **'তস্য ভূমিষু বিনিযোগঃ।'(৩/৬)** সেই সংযমকে ক্রমে ক্রমে নীচু উঁচু ভূমিকাগুলিতে অভ্যাস করে করে দৃঢ় করতে হয়।

যেমন-যেমন সংযম দৃঢ় হয়, ক্রমোন্নত অনুভূতি হতে থাকে; কিন্তু একটা এমন স্তর আসে যে, **'প্রতিভাদ্বা সর্বম্।'(৩/৩৩)**- প্রাতিভ জ্ঞান উৎপন্ন হলে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত এর সম্বন্ধে কোন সংযম, প্রয়াস ছাড়া সহজেই সব জানা যায়।

পরাবাণী যখন উন্নত অবস্থাতে প্রবেশ করে তখন এই সংযম সিদ্ধ হয়। এইরূপ যোগী যখনই কোন বস্তুর স্মরণ করেন, চিত্তে দৃশ্য অঙ্কিত হয়। বৃত্তি নিরন্তর প্রবাহিত হয়, ধ্যান হয়, সমাধির স্থিতি লাভ হয়, ধ্যেয়মাত্র বাকী থাকে এবং যোগী এইপ্রকার সেই বস্তুর রহস্য সম্বন্ধে অবগত হন।

যোগীগণ এইরূপ প্রয়োগ করেন- এ উদাহরণ পাওয়া যায়। আদিযোগী ভগবান শিবের সন্দর্ভে দেখুন-' **তব সঙ্কর দেখেউ ধরি ধ্যানা। সতীঁ জো কীন্‌হ চরিত সবু জানা।।' (মানস, ১/৫৫/২)**

বিভূতি সকল হল পরিণাম, উপহার। সময় হলে বৃক্ষে ফুল-ফল সবই দেখা দেয়। সাধককে এ সমস্ত কামনা অথবা এগুলি চিন্তন করা উচিৎ নয়। যোগ-সাধনা এবং ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণের চিন্তা সাধককে করা উচিৎ। সাধনের পরিপুষ্টতাতে এই বিভূতিগুলি বসন্ত ঋতুর ন্যায় সময়ে সহজেই প্রকট হয়।

● **বুদ্ধি**-

নির্বিচার সমাধি অত্যন্ত নির্মল হলে যোগী **'অধ্যাত্ম প্রসাদঃ'**- অধ্যাত্ম প্রসাদ লাভ

করেন অর্থাৎ সেই সময় আত্মার আলো শুধু থাকে। এর ফলে অন্য সংস্কারগুলি লুপ্ত হয় এবং '**ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।**' (১/৪৮)- সেই সময় যোগীর বুদ্ধি ঋত অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সত্য একমাত্র পরমাত্মা, সেই বুদ্ধি পরমাত্মাকে ধারণ করার ক্ষমতাযুক্ত হয়। যে বুদ্ধি দ্বারা শ্রবণ এবং অনুমান করা হয় তার থেকে পৃথক এই বুদ্ধির বিষয়; কারণ এটা বিশেষ অর্থযুক্ত।

বুদ্ধির দুটি রূপ। এই প্রসঙ্গকেই কৈবল্যপাদের ২১ তম সূত্রে পুনরায় স্পষ্ট করে মহর্ষি বলছেন- '**চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতি প্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ।**' (৪/২১) চিত্তের অন্তরালে যে দৃশ্য অঙ্কিত হয়, সেসব অনেক প্রশ্ন নিয়ে বুদ্ধিকে ব্যস্ত করে দেয়। '**অতিপ্রসঙ্গঃ**'- অত্যন্ত অনন্ত প্রসঙ্গ সৃষ্টি হয়। এর ফলে '**স্মৃতিসংকরঃ**'-স্মৃতি মিশ্রিত হয়ে যায়। স্মৃতি এবং সঙ্কল্প একই। অনন্ত সঙ্কল্পের ক্রম আরম্ভ হয়। যদ্যপি সেই চেতন-শক্তি পুরুষ অসঙ্গ, ক্রিয়াহীন; কিন্তু '**তদাকারপত্তৌ**' (৪/২২)- চিত্ত যখন তার আকার ধারণ করে, তখন '**স্ববুদ্ধিসংবেদনম্**'- স্থিরবুদ্ধিতে স্বরূপ এর জ্ঞান লাভ করে।

সারাংশতঃ মহর্ষি পতঞ্জলির অনুসারে বুদ্ধির রূপ দুটি- প্রথম বাহ্য বুদ্ধি, যা শ্রবণ এবং অনুমান করে। এই বুদ্ধি অপেক্ষা ঋতম্ভরা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। চিত্তে উদিত অনন্ত সঙ্কল্প, অনন্ত নির্ণয়ের ফলে স্মৃতি মিশ্রিত হয়ে যায়; কিন্তু চেতন ক্রিয়াহীন অসঙ্গ পুরুষ একাকার হলে '**স্ববুদ্ধিসংবেদনম্**'-বুদ্ধিতে স্ব-স্বরূপের, স্বয়ং-এর সংবেদন লাভ করে।

অন্য শব্দে, বুদ্ধির রূপ দুটি প্রথমত সামান্য বুদ্ধি যার দ্বারা শ্রবন এবং অনুমান করা হয়, এটাই বিশুদ্ধ হলে যোগ-সাধনা দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিতে স্ব-স্বরূপের প্রতিবিম্ব দর্শন করে, এরপর বুদ্ধি বিলয় হয়।

● **ধর্ম**-

যখন চিত্ত নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতা-পরিণাম দেখা দেয়, পাতঞ্জল যোগ সূত্রে সেখানেই 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। যেমন- যে সংস্কারগুলির অভ্যুদয় হয়, সেগুলি বিলুপ্ত হয়, নিরুদ্ধ অবস্থাতে যে সংস্কারগুলি প্রকট হয়, সেগুলির উদয়- এ সমস্ত চিত্তের নিরোধ-পরিণাম। এর ফলে চিত্তের বৃত্তি শান্ত প্রবাহিত থাকে। এই প্রকার সর্ব বিষয়ের চিন্তন করে যে বৃত্তি তার বিনাশ এবং একটা মাত্র ধ্যেয় নাম অথবা রূপের চিন্তনকারী একাগ্রতা অবস্থার উদয় হওয়া হল চিত্তের সমাধি-পরিণাম এবং যখন শান্ত এবং উদিত দুটি বৃত্তিই একরূপ, সম হবে - সেটাই হবে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম। এই তিনটি দ্বারাই ইন্দ্রিয়-সমূহের সংযম এবং রূপ,রস গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ এই পাঁচটি মহাভূতের মধ্যে যে ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণাম দেখা দেয় তারও বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সর্বপ্রথম ধর্ম শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

কৈবল্যপাদের সপ্তম সূত্রে সূত্রকার বলছেন যে, যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়; কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্ম তিন প্রকারের হয়। সেসব কর্ম থেকে ফলের অনুকূল বাসনারই অভিব্যক্তি হয়। সেই বাসনাগুলি যত জন্মই ব্যতীত হোক, যতই দেশ-কাল পরিবর্তিত হোক, তবুও কর্মজন্য সংস্কারগুলির সমষ্টিতে ব্যবধান উৎপন্ন হয় না। এগুলি নির্ধারিত সময়ে প্রকট হয়। তাতে ব্যবধানের সৃষ্টি হয় না; কারণ স্মৃতি এবং সংস্কার দুটিরই স্বরূপ এক। স্মৃতিপটে তাই অঙ্কিত হয় যেরূপ সংস্কার থাকে- সেইজন্য দুটিই এক। স্মৃতি এবং সংস্কারের এক-রূপতা অনাদি। সেইজন্য **'নিত্যত্বাৎ'(৪/১০)**- নিত্য, শাশ্বত স্বরূপ লাভ করার ইচ্ছা সর্বদা থাকে। মানুষের মধ্যে শাশ্বত, সুখ, শাশ্বত নিবাস এবং অমৃতময় স্বরূপ লাভ করার বাসনা চিরকালই রয়েছে।

এই বাসনা এবং সংস্কারগুলির বিনাশ কিরূপে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে বলছেন-হেতু, ফল, আশ্রয় এবং আলম্বন- এই চারটি বিষয় থেকে সংস্কার এবং বাসনাগুলির সংগ্রহ হয়। অতএব এই চারটির অভাব হলে সেই বাসনাগুলির এবং বাসনাজন্য সংস্কারগুলির সদাসর্বদার জন্য অভাব হয়। এই সংস্কারগুলির হেতু অবিদ্যাদি ক্লেশ এবং এগুলি থাকতে যে কর্ম সম্পাদিত হয় তার ফল হল পুনর্জন্ম, আয়ু এবং ভোগ, যা কখনও আহ্লাদ আবার কখনও দুঃখপ্রদ। এদের আশ্রয় চিত্ত এবং রূপ, রস,গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি এদের আলম্বন। এগুলির মাধ্যমেই বাসনাগুলি সংগৃহীত হয়। এগুলির অভাবের সঙ্গে মূল সংস্কারগুলির, বাসনাগুলির সদা সর্বদার জন্য অভাব হয়। এই বাসনা গুলির অভাবের সঙ্গেই এখানে ধর্ম শব্দের পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। **'অতীতানাগতং স্বরূপতোহ স্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মানাম্।' (৪/১২)** ধর্মের গতিতে কালের পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও যে হেতু, ফল, আশ্রয় এবং আলম্বন অতীত হয় এবং যা অনাগত, এখনও প্রকট হয়নি; যেমন-স্বরূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি, তাঁদের মধ্যে স্বরূপ রূপে ধর্মের গতি সদা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ সংস্কার বাসনার ক্ষয় এবং স্বরূপের প্রাপ্তি কালে ধর্মের বিদ্যমানতা হল।

সমস্ত ধর্মের গতির প্রবাহ ব্যক্ত স্থিতিতে এবং সূক্ষ্ম স্থিতিতে সদৈব গুণস্বরূপই থাকে। যেরূপ গুণের সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক অথবা উন্নত, মধ্যমা এবং মলিন প্রভাব থাকে সেইরূপই ধর্মের রূপ দেখা যায়; কিন্তু **'পরিনামৈকত্বাৎ'**-পরিণামের ঐক্যে, **'বস্তুতত্ত্বম্'**- বিষয়- বস্তু হল যোগ, তা তত্ত্বরূপে প্রকট হয়ে যায়। অর্থাৎ চেতন দ্রষ্টার তত্ত্ব রূপে বিদিত হওয়া সম্ভব। এখানে দ্বিতীয়বার ধর্ম শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয়বার ধর্ম শব্দ কৈবল্যপাদের উত্তরার্ধে দ্রষ্টব্য যে বিশেষদর্শী পুরুষের চিত্ত থেকে কোন শুভাশুভ নির্মাণ হয় না; কিন্তু যে উদ্বেগ উৎপন্ন হয়, সেগুলি কি?- এই

প্রসঙ্গে বলছেন-'**তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ।' (৪/২৭)**- সেই সমাধির অন্তরালে বিপরীত বস্তু অথবা বিচারগুলির স্ফুরণ '**সংস্কারেভ্যঃ**-' সংস্কারের ফলে হয়। সংস্কারগুলির পরতে অতিসূক্ষ্ম কিছু রয়েছে তাই স্ফুরিত হয়। এই সমস্ত সংস্কার ক্লেশের সমানই ঘাতক। '**হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।(৪/২৮)** এই সংস্কারগুলির বিনাশ ক্লেশের ন্যায়ই করা উচিৎ; কারণ এই সংস্কার গুলির মূল হল ক্লেশ। এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি নষ্ট হলে '**প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।'(৪/২৯)**- যে যোগীর বিবেক- জ্ঞানের মহিমার প্রতিও বৈরাগ্য চলে আসে, তাঁর এই বিবেক- জ্ঞান সর্বথা প্রকাশিত থাকার জন্য তিনি ধর্মমেঘ সমাধি লাভ করেন। চিদাকাশে সর্বত্র ধর্মই ব্যাপ্ত থাকে, অন্য কোন স্ফুরণ হয় না; কারণ যে অন্তিম সংস্কার থাকে তারও বিলয় হয়। এই সমাধির প্রভাবে ক্লেশ এবং কর্মগুলি থেকে সদা সর্বদার জন্য মুক্ত হওয়া যায়। পরমাত্মাকে ধারণ করার অবস্থাতে এখানে ধর্ম শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের পরিভাষা দিয়েছেন - '**সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' (গীতা, ১৮/৬৬)**- সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও। গোস্বামী তুলসীদাসজী বলেছেন '**সো সুখু করমু ধরমু জরি জাউ। জহঁ ন রাম পদ পঙ্কজ ভাউ।। জোগু কুজোগু গ্যানু অজ্ঞানু। জহঁ নহি রাম পেম পরধানূ।।' (মানস, ২/২৯০/১)**- সেই ধর্মাচরণ, সেই কর্ম চুলোয় যাক যেটাতে রামের চরণের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। এইরূপ যদি নয় তবে তা কর্ম নয়, কুকর্ম। ধর্ম নয় তা অধর্ম, যোগ নয় কুযোগ, জ্ঞান নয় তা অজ্ঞান। এই আশয়ে এই মহাপুরুষ তিনবার ধর্ম শব্দের উল্লেখ করেছেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে- সমাধির পরিণামের সঙ্গে এবং শেষ সংস্কারের বিলয়ের সঙ্গে ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে।

।। ওঁ ।।

এক ভক্তের প্রশ্ন -

প্রশ্ন- *মহারাজ জী ! আজকাল আমরা পাঠশালাতে যোগ কি তা অধ্যয়ন করি যাতে সকল প্রকার আসনের অভ্যাস করানো হয়, মাঝে- মাঝে গীতা এবং পতঞ্জলির শ্লোক আওড়ান হয়; কিন্তু গীতা এবং পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই আসনগুলির বিবরণ পাওয়া যায় না। দয়া করে এর সমাধান করুন।*

উত্তর - বর্তমানে শিক্ষা সংস্থানে, সন্ত-মহাত্মাদের যোগাসনের সূচী পর্যাপ্ত বিস্তৃত; কিন্তু আদি যোগশাস্ত্র গীতা এবং মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত 'যোগদর্শন'-এ এই সম্বন্ধে মাত্র একটা শ্লোক এবং একটা সূত্র পাওয়া যায়-

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চৈলাজিন কুশোত্তরম্।।(গীতা,৬/১১)
স্থির সুখমাসনম্।। (যোগদর্শন, ২/৪৬)

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন যে, আত্মাই সত্য। যে যোগ বিধির অনুসারে আচরণ করলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় তাকেই যজ্ঞ বলে। গীতাশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু যজ্ঞকর্তার জন্য স্থান কিরূপ হওয়া উচিৎ, আসন কিরূপ হওয়া উচিৎ, তার উপর কিভাবে উপবেশন করা হবে, কর্তার পালনীয় নিয়ম, আহার, বিহার, শয়ন-জাগরণ, পরিশ্রম, কর্মের প্রতি তৎপরতা ইত্যাদি দিক্‌গুলি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা ১০ থেকে ১৯ পর্যন্ত স্পষ্ট করেছেন।

সর্বপ্রথম তিনি স্থান এবং আসন সম্বন্ধে বলেছেন। গীতা, ৬ ১০ উল্লিখিত আছে যে, চিত্ত জয় করবার জন্য প্রযত্নশীল যোগী, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং দেহ সংযত করে, বাসনা ও সংগ্রহরহিত হয়ে নির্জন স্থানে একাকী চিত্তকে যোগ ক্রিয়াতে নিযুক্ত করবেন।

তার জন্য কেমন স্থান হওয়া দরকার? আসন কিরূপ হবে? অধ্যায় ৬.১১ তে যোগেশ্বর বলেছেন যে, শুদ্ধ ভূমিতে কুশ, মৃগচর্ম, বস্ত্র, তক্তাপোষ যা কিছু হোক স্থির আসন স্থাপন করবেন। আসন যেন অতি উঁচু বা অতি নীচু না হয়। শুদ্ধভূমির অর্থ হল, স্থান যেন পরিষ্কার হয়। আসন যেন একটুও না দোলে, স্থিরভাবে স্থাপন হয়।

পূজ্য মহারাজজী প্রায় পাঁচ ইঞ্চি উঁচু আসনের উপর বসতেন। একবার ভক্তরা এক ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের এক চৌকী এনে দিয়েছিল। মহারাজজী মাত্র একদিন ব্যবহার করেছিলেন, পরদিনই বলেছিলেন-''না হো! এটা অনেক উঁচু, এত উঁচু আসনে বসা উচিৎ নয়, এতে অভিমান চলে আসে। আবার নিচুতেও বসা উচিৎ নয়, হীনভাব ও

ঘৃণা উৎপন্ন হয়।” তিনি সেটা সরিয়ে বাগানে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি কখনও সেখানে যেতেন না এখনও কেউ যায় না। এইরূপ ছিল সেই মহাপুরুষের ক্রিয়াত্মক শিক্ষা পদ্ধতি।

অধ্যায় ৬/১২ তে উল্লিখিত আছে যে, আসন ব্যবস্থিত হলে সেই আসনে উপবেশন করে মনকে একাগ্র করে চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য সংযমপূর্বক, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করবেন। এখানে আসনের তাৎপর্য হল উপবেশন করার জন্য চারিপায়াযুক্ত ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন।

অধ্যায় ৬/১৩ তে উপবেশন করার নিয়ম সম্বন্ধে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, দেহ, গ্রীবা ও মস্তক সরল ও অচলভাবে স্থির করে সোজা, দৃঢ় হয়ে বসুন। স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন(এখানে নাক দেখবার নির্দেশ দিচ্ছেন না, পরন্তু সোজা বসলে নাকের সোজাসুজি যেখানে দৃষ্টি পড়ে, সেখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন- এদিক ওদিক দেখার চঞ্চলতা যেন না হয়। অন্যদিকে না দেখে।)

অধ্যায় ৬/১৪-ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত, ভয়রহিত এবং উত্তমরূপে শান্ত অন্তঃকরণযুক্ত, মনকে সংযত করে, আমাতেই চিত্ত নিযুক্ত করে মৎ পরায়ণ হয়ে স্থিত হবেন।

অধ্যায় ৬/১৫-এইরূপ নিজেকে নিরন্তর সেই চিন্তনে নিযুক্ত করে যোগী সংযত ভাবে মন সমাহিত করে আমার স্থিতিরূপ পরাকাষ্ঠাযুক্ত শান্তি প্রাপ্ত হন।

এখানে আসন হল উপবেশন করার বস্তু, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অচল, স্থির বসার পদ্ধতি। গীতাশাস্ত্রে অন্য কোন আসনের উল্লেখ নেই। এই প্রসঙ্গেই যোগেশ্বর বলেছেন যে পরমানন্দ যুক্ত শান্তির জন্য শারীরিক সংযম, যুক্তাহার-বিহার এবং কর্মে উপযুক্ত চেষ্টা আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের যোড়শ এবং সপ্তদশ শ্লোকেতিনি বলেছেন- এই যোগ অতিভোজীর সিদ্ধ হয় না এবং একান্ত অনাহারীরও সিদ্ধ হয় না, অত্যন্ত নিদ্রালুর এবং অতি অনিদ্রা-অভ্যাসীরও সিদ্ধ হয় না। দুঃখের নাশক, এই যোগ তাঁর পূর্ণ হয়, যিনি পরিমিত আহার-বিহার করেন, কর্মে পরিমিত চেষ্টা করেন এবং যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ সন্তুলিত। অধিক ভোজনে আলস্য, নিদ্রা এবং প্রমাদ ঘিরে ধরে, তখন সাধনা ব্যাহত হয়। আহার ত্যাগ করলেও ইন্দ্রিয়গুলি দুর্বল হয়ে যায়, অচল স্থির হয়ে বসবার ক্ষমতা থাকে না। বিহার অর্থাৎ সাধনের অনুকূল বিচরণ, অল্প পরিশ্রমও করা উচিৎ অন্যথা রক্ত সঞ্চার শিথিল হয়ে যাবে, যার ফলে রোগ ব্যাধির শিকার হবে। আয়ু, নিদ্রা ও জাগরণ, আহার ও অভ্যাসে কম-বেশী হয়। কর্মে চেষ্টা হওয়া দরকার অর্থাৎ আরাধনাতে প্রযত্নশীল হওয়া দরকার। ঊনবিংশ এবং বিংশ শ্লোকে যোগেশ্বর বলেছেন যে, বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, শিখা ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাতে কম্পন হয় না, সেই উপমা দেওয়া হয়েছে পরমাত্মার ধ্যানে প্রবৃত্ত চিত্তজয়ী

যোগীর সঙ্গে। এখন যদিও চিত্ত জয় করা হয়েছে তবু চিত্তের বিলয় তো হয়নি। যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্তেরও নিবৃত্তি হয়, বিলীন হয়ে যায়, সেই অবস্থাতে '**আত্মনা**'- স্বীয় আত্মার দ্বারা, '**আত্মানম্**'-পরমাত্মার দর্শন করে। **আত্মনি এব** - স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন।

যোগী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, কিন্তু তিনি নিজের আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন। কারণ প্রাপ্তিকালে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্বীয় আত্মাকে সেই শ্বাশত ঈশ্বরীয় বিভূতিগুলি দ্বারা ওতপ্রোত দেখেন। ব্রহ্ম যেমন অজর, অমর, শাশ্বত, অব্যক্ত এবং অমৃত স্বরূপ তেমনই আত্মাও অজর, অমর, শাশ্বত, অব্যক্ত এবং অমৃতস্বরূপ। আছে কিন্তু তবুও আত্মা অচিন্ত্যও। যতক্ষণ চিত্ত এবং চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, ততক্ষণ আপনার উপভোগের জন্য নয়। নিরুদ্ধ চিত্ত এবং নিরুদ্ধ চিত্তেরও বিলুপ্তিকালে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয় এবং দর্শনের পরেই সেই ঈশ্বরীয় গুণধর্মে যোগী নিজেকে যুক্ত দেখেন। সেইজন্য তিনি নিজের আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন। এটাই যোগের পরাকাষ্ঠা।

এখানে শারীরিক ব্যায়ামরূপে প্রচলিত বাহ্য আসনগুলির যোগ সাধনাতে কোন আবশ্যকতা নেই। বাহ্য আসন যোগী এবং ভোগী রোগগ্রস্ত এবং সুস্থ সকলের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ। যদি ইউরোপীয় প্রণালীতে ব্যায়াম অর্থাৎ জিম্‌নাস্টিক করার অভ্যাস আছে তবে এই বাহ্য আসন গুলি করার কোন প্রয়োজনও নেই; কারণ দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের ব্যায়াম সমানভাবে হয়ে যায়। চিত্তের নিরোধ তো নিয়ত কর্মের অভ্যাস দ্বারাই হয়।

পাতঞ্জল যোগদর্শন

মহর্ষি পতঞ্জলির অনুসারে চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ হল যোগ। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়। ঈশ্বর -শরণাগতি এবং প্রণব (ওম্) হল অভ্যাসের আধার। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা যোগ-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যোগের অঙ্গ আটটি—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এগুলি হল ক্রমোন্নত স্থিতি, এর মধ্যে তৃতীয় স্থান হল আসনের

স্থির সুখমাসনম্।। (যোগদর্শন, ২/৪৬)

স্থির অর্থাৎ চাঞ্চল্যরহিত সুখপূর্বক বসাকে আসন নাম দেওয়া হয়েছে। এই নয় যে, শীর্ষাসন করতে শুরু করে দিলেন অথবা কোমর উঁচু করে ধনুকের মত ধনুরাসন অভ্যাস করা আরম্ভ করলেন।

মহর্ষির বলার আশয় এই যে, স্থির হয়ে বসতে হবে। দেহ স্থির হয়ে বসলেও মনে চাঞ্চল্য দেখা যায়ই। মনে অসংখ্য সঙ্কল্পের ঢেউ আসার সঙ্গে-সঙ্গে দেহ ক্রিয়াশীল হয়ে সেই দিকেই ধাবিত হয়।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।। (যোগদর্শন, ২।৪৭)

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরের প্রণিধান করার যে অভ্যাস করা হয় তাতে শিথিলতা চলে আসবে, প্রযত্ন করা হবে না এ সমস্ত যদি স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত করলে আসন সিদ্ধ হয় তবে তিনি সুখপূর্বক শান্ত সম উপবেশন করার ক্ষমতা লাভ করেন।

আসন সিদ্ধ হলেই প্রান-অপানের গতি বিচ্ছেদ হয় এবং প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম দ্বারা প্রত্যাহার অর্থাৎ মনকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তমরূপে সংযত হয়, এরই সঙ্গে **'ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।' (যোগদর্শন, ২।৫৩)**—'মনে ধারণ করার ক্ষমতা লাভ হয়। চিন্তনে যা ধারণ করা হয়—তাতে বৃত্তির নিরন্তর প্রবাহ হল ধ্যান এবং **'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।' (৩।৩)**—শুধু লক্ষ্যের আভাস পাওয়া যাবে, চিত্তবৃত্তির নিজ স্বরূপ শূন্য হয়ে যাবে সেই অবস্থাতেই সেই ধ্যানই সমাধিতে পরিণত হবে।

এইপ্রকার যোগের আটটি অঙ্গই হল ক্রমে-ক্রমে প্রস্ফুটিত অবস্থা। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে আসনের এটুকুই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাও শান্ত, নির্জনে বসে অভ্যাস করলেই প্রাপ্ত হয়।

গীতা এবং পাতঞ্জল যোগদর্শনে এটুকুই পার্থক্য রয়েছে যে, গীতাশাস্ত্রে প্রথমে আসনের বর্ণনা করা হয়েছে, এরপরেই ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি যম এবং ঈশ্বর-প্রণিধানাদি নিয়মগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে; পরন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি পূর্বে যম এবং নিয়ম সম্বন্ধে বলেছেন এবং পরে আসনের স্থির হওয়া সম্বন্ধে বলেছেন। মহর্ষির আসন দেহ অপেক্ষা মন স্থির হওয়ার সঙ্গে অধিক সম্বন্ধিত। তাঁর 'আসন' অনন্ত পরমাত্মাতে মন নিযুক্ত করলে সিদ্ধ হয়।

ভগবান মহাবীর গো-দোহন আসনে বসে ধ্যান করতেন যাতে নিদ্রা, আলস্য সাধনাতে ব্যবধান উৎপন্ন করতে না পারে। ভগবান বুদ্ধ সাধনার অন্তিম চরণে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে বিরাজমান ছিলেন। স্বাস্তি নামক এগারো বছরের এক রাখাল বালক তাঁকে শান্ত মুদ্রাতে বসে থাকতে দেখেছিল। সে নিরীক্ষণ করেছিল যে, তাঁর পদযুগল এমন ভাবে জঙ্ঘার উপর স্থিত ছিল যে, চরণতল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাম করতলের উপর ডান করতল। চক্ষু অর্ধনিমীলিত। সম্মুখে দৃষ্টি। এটা তাঁর প্রিয় আসন ছিল, যা পদ্মাসন।

গোস্বামী তুলসীদাসজীর 'রামচরিতমানস'—এও প্রচুর আসনের উল্লেখ রয়েছে; যেমন—সীতা-স্বয়ম্বর-এর সময় মহারাজ জনক বলেছিলেন—

তুরত সকল লোগন্হ পহিঁ জাহু। আসন উচিৎ দেহু সব কাহু (১।২৩৯।৪)

যখন বরযাত্রীরা পৌঁছেছিল—

সাদর সব কে পায় পখারে। জথা জোগু পীঢ়নহ্ বৈঠারে। (১।৩২৭।২)

আসন উচিৎ সবহি নৃপ দীন্হে। বোলি সূপকারী সব লীন্হে।।(১।৩২৭।৪)

চারি সিংঘাসন সহজ সুহাএ। জনু মনোজ নিজ হাথ বনাএ।।(১।৩৪৯।১)

পুনি বশিষ্ঠ মুনি কৌশিকু আয়ে। সুভগ আসনন্হি মুনি বৈঠায়ে।

এই প্রকার রাজাদের জন্য সিংহাসন, মুনিদের সুন্দর আসন কোথাও পিঁড়ি, কোথাও সুখাসন, কোথাও কুশাসন, কোথাও মৃগচর্ম! এখানে আসন বসার বস্তুকে বলা হয়েছে। কিছু-কিছু স্থানে বসবার মুদ্রার নাম আসন—'**কছুক দুরি সজি বান সরাসন। জাগন লগে বৈঠি বীরাসন।।**' (২।৮৯।১)

শর সন্ধানের জন্য প্রস্তুত, সর্বদা সাবধান! লক্ষণ বীরাসনে বসেছিলেন। ভগবান শিবের আসন সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—'**তহঁ পুনি সম্ভু সমুঝি পন আপন। বৈঠে বট তর করি কমলাসন।।**' **(১।৫৭খ।৪)** সতী-ত্যাগ-এর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে ভগবান শিব বট-বৃক্ষ মূলে কমলাসনে ভজনাতে রত হয়েছিলেন। এখানে উপবেশনের বস্তুর কোন উল্লেখ নেই, পরন্তু উপবেশনের মুদ্রা সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

'**সুর লখে রাম সুজান পূজে মানসিক আসন দএ।**' **(১।৩২০ছন্দ)**—বিবাহের সময় দেবতাগণ ভগবান রামকে দর্শন করে তাঁকে মানসিক আসন উপবেশনের জন্য প্রদান করে তাঁর পূজা করেছিলেন, যা মানসিক পূজা ছিল। নির্জনে যে সিদ্ধ মহাত্মাগণ বাস করেন, তাঁরা সিদ্ধাসনে উপবেশন করেন। উপবেশনের সময় একটা পা জঙ্ঘার উপর এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে গোড়ালি কোমর স্পর্শ করে একেই সিদ্ধাসন বলে। পূজ্য গুরুদেব প্রায়ই এই আসনে উপবেশন করতেন। মহারাজজীর শরণাগত হওয়ার পর তাঁকে এই মুদ্রাতে বসতে দেখে আমিও তাঁর সম্মুখে জঙ্ঘার উপর পদ স্থাপন করে বসেছিলাম। সতীর্থ অগ্রজেরা সঙ্কেতে এরূপ করতে বারণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, সিদ্ধপুরুষগণই সিদ্ধাসনে বসার অধিকারী। তাঁর সমক্ষে পা তুলে বসার অর্থ হল তাঁকে অসম্মান করা এবং এটা অশিষ্ট প্রদর্শন।

সারাংশতঃ সমস্ত আর্ষগ্রন্থগুলিতে উপবেশনের মুদ্রা, উপযুক্ত স্থান এবং উপবেশনের জন্য যে বস্তুর প্রয়োগ করা হয় তাকে আসন বলে।

আধুনিক ব্যায়াম শিক্ষকগণ রোগ নিবারণের জন্য বিভিন্ন শারীরিক মুদ্রাগুলির অনুসন্ধান করে সেগুলিকে যোগাসন নাম দিয়ে এর প্রচার-প্রসার করছেন এবং এই মুদ্রাগুলির সম্পাদনে গীতার শ্লোক এবং মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রগুলির উদ্ধরণ দিয়ে থাকেন; কদাচিৎ সেইজন্য দেশে-বিদেশে একটি ভ্রান্তির তরঙ্গ ব্যাপ্ত যে, এই

শারীরিক মুদ্রাগুলিই বাস্তবিক যোগ যা শাশ্বত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। ব্যায়াম প্রশিক্ষকগণ এই মুদ্রাগুলির সমর্থনে গীতা অথবা যোগদর্শনের উল্লেখ যাতে না করেন। সৃষ্টিতে কোন মঙ্গলকার্য করার পূর্বে ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করা উচিৎ; কিন্তু এসবকে যোগাসন নাম দেওয়া উচিৎ নয়।

।। ওঁ।।

প্রস্তুত টীকা

যোগদর্শনের এই টীকা থেকে যোগ কাকে বলে? এ বোঝা তো সম্ভব কিন্তু যোগের স্থিতিগুলি সাধনাতে প্রবৃত্ত হওয়ার পরই বোধগম্য হয়। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান এবং ওঁ জপ থেকে প্রারম্ভ হয়। এর ফলে অবিদ্যাদি ক্লেশগুলি ক্ষীণ হয়, দ্রষ্টা আত্মা সক্রিয় হয়ে কল্যাণকর দৃশ্য প্রসারিত করতে শুরু করেন। এরই প্রকাশে চলে বোঝা সম্ভব হয় যে, মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রগুলির অভিপ্রায় কি? যোগ হল প্রত্যক্ষ দর্শন, এ বিষয়ে বক্তৃতা দিলে অথবা লিপিবদ্ধ করলে এই বিষয় বোধগম্য হয় না। সাধক এই পথে চলেই বুঝতে পারেন যে, মহর্ষি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন তার বাস্তবিক আশয় কি।

- স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী

ধর্মশাস্ত্র

বিশ্বের আদি ধর্মশাস্ত্র গীতা

আজ থেকে ৫২০০ বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপদেশে বলেছিলেন যে, এই অবিনাশী যোগ আমি কল্পের আরম্ভে বিবস্বানকে বলেছিলাম। সূর্য নিজ পুত্র মনুকে বলেছিলেন। মনু এই স্মৃতিজ্ঞান সুরক্ষিত রাখার জন্য স্মৃতি পরম্পরা শুরু করেছিলেন এবং নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে রাজর্ষিগণ লাভ করেছিলেন। এই মহত্ত্বপূর্ণকালে এই যোগ পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই পুরাতন যোগ সম্বন্ধে আমি তোমাকে উপদেশ দান করব। এই প্রকার সৃষ্টির আদি ধর্মশাস্ত্র আদি মনু স্মৃতি হল গীতাশাস্ত্র।

কালান্তরে সেই আদি মনুর সমক্ষে অবতরিত বেদ এই গীতারই বিস্তার। বিশ্বের বিবিধ ভাষাতে অন্যান্যশাস্ত্র সময়ানুসারে ঈশ্বরীয় গায়ন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারই প্রতিধ্বনি। গীতা আপনার ধর্মশাস্ত্র। ধর্ম কাকে বলে ? সত্য কোন্‌টা ? তা কিরূপে লাভ করবেন ? যজ্ঞ, কর্ম, বর্ণ, যজ্ঞ করার অধিকার মানুষ মাত্রেরই কেন ? গীতার ফল লোকে সমৃদ্ধি পরম শ্রেয়র প্রাপ্তি ইত্যাদি জানার জন্য দেখুন পূজ্য স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী কৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা যথার্থ গীতা'।

"যথার্থ গীতা"

দ্রষ্টা-দৃশ্য সংযোগ দ্বারা যোগ সাধনার জাগৃতি

দ্রষ্টা-দৃশ্য সংযোগ—যে পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক, যে স্তরে আমরা দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেই পথপ্রদর্শন করতে শুরু করবেন ঈশ্বর। আমাদের সাধনা এরূপ হওয়া উচিত যাতে তিনি জেগে ওঠেন। সেই নির্বিকার দ্রষ্টা যাতে দৃশ্য প্রসারিত করতে শুরু করেন। পুরুষের জন্য ভোগ এবং অপবর্গের সম্পাদন করেন অর্থাৎ ইহলোকে সমৃদ্ধি এবং পরমশ্রেয়-এর ব্যবস্থা করেন, নিজের বিভূতিগুলি সম্বন্ধে জানিয়ে দেন—এটাই হল দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগ-যার-ফলে ক্লেশ নষ্ট হয় এবং কৈবল্য, অনাময় পদ লাভ হয়।

যোগ দর্শন

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

৫, অ্যাপোলো ইস্টেট; মোগরা লেন; নগরদাস মার্গের সম্মুখে আঁধেরী পূর্ব

মুম্বাই ৪০০০৬৯, ভারত, ফোন (০৯১ -২২) ২৮২৫৫৩০০

ইমেল : contact@yatharthgeeta.com

ওয়েবসাইট : www.yatharthgeeta.com